সাংখ্যতত্ত্বসমীক্ষায় আধুনিক বাঙালি মনীষা

পিএইচ.ডি. গবেষণা নিবন্ধ

(আর্টস)

গবেষক

স্বাধীন কুমার মণ্ডল

নির্দেশিকা

ড. কাকলী ঘোষ

সহযোগী অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২১

Certificate

Certified that the Thesis entitled, সাংখ্যতত্ত্বসমীক্ষায় আধুনিক বাঙালি মনীষা, submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Dr. Kakali Ghosh, Associate Professor, Department of Sanskrit, Jadavpur University, and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the-

Kakali Ghosh 14.07.2021
Supervisor

Dated: 14.07.2021

Associate Professor & Head
Department of Sanskrit
Jadavpur University
Kolkata - 700 032

Swadhin Kumar Mandal 14.07.21
Candidate

Dated: 14.07.21

আমরা আছি একটা ঝামেলার মাঝে, ভেসে চলেছি পরিবর্তনের স্রোতে। এর মধ্যে সত্তার একটা স্থির নির্ভর কোথাও চাই নইলে আমাদের কাজ চলে না। বাইরে যেমন প্রকৃতির ক্রিয়াসারূপ্যের উপর আমাদের বিশ্বাস, অন্তরেও তেমনি চাই একটা অধ্যাত্ম ক্রিয়াসারূপ্যের অচল প্রতিষ্ঠা। চিত্তের এমন একটা ভূমি চাই, যাকে বলতে পারি প্রাকৃত চেতনার সমস্ত বৃত্তির আশ্রয়, তার সমস্ত কর্মপ্রবৃত্তির একটা নির্ভরযোগ্য উৎস। এই অধ্যাত্মপ্রতিষ্ঠাকেই পরাক্ দৃষ্টিতে বলি ঈশ্বর, প্রত্যক্ দৃষ্টিতে বলি আত্মা। এই গভীর উৎস হতে উৎসারিত যে বাণী, যা আমাদের কর্ম এবং ভাবনাকে সংশয় ও অনৈশ্চিত্যের আন্দোলন হতে প্রতিষ্ঠার ভূমিতে উত্তীর্ণ করে, তাই আমাদের কাছে আপ্তবাণী শাস্ত্র…

–শ্রীমৎ অনির্বাণ, *বেদ মীমাংসা* (প্রথম খণ্ড), পৃ. ১৪

প্রস্তাবনা

সমাজ, দেশ, কাল, সাহিত্য তথা সংস্কৃতির পটভূমিকায় 'বিবর্তন' এক অমোঘ বাস্তব। সুবিবেচকগণ এই ধারণাটির বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন না, বরং নিজ নিজ বিচার-বুদ্ধি দিয়ে নিরন্তর ঘটে যাওয়া ঐ বিবর্তনের যোগসূত্রগুলিকে খোঁজার চেষ্টা করেন এবং সমাজ, দেশ, কাল, সাহিত্য তথা সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্ন প্রবাহটি লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস করেন।

এই বঙ্গদেশে, ভারতীয় দর্শন পরম্পরায় এক একটি আস্তিক দর্শনের বিবর্তনের এইরূপ অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের যোগসূত্রের খোঁজ করতে গেলে, ন্যায়-বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনগুলির ক্ষেত্রে সেই সূত্র অনেকটা সুস্পষ্টভাবে পাওয়া গেলেও সাংখ্যদর্শনের ক্ষেত্রে ঐ বিবর্তনের ধারাবাহিক ইতিহাস ততখানি সহজলভ্য নয়। মহাকালের কালচক্রে পরিবর্তিত, পরিমার্জিত তথা পরিবর্ধিত সুস্পষ্ট ধারাবিবরণীর অপর্যাপ্ততার কারণে, সাংখ্যদর্শনের বিবর্তনের ইতিহাসটির যোগসূত্রের খোঁজ করার সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। এই কথা মাথায় রেখে, পূর্বাচার্যদের সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার থেকে অত্যন্ত সাবধানতার সাথে আহৃত তত্ত্ব ও তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত, "সাংখ্যতত্ত্বসমীক্ষায় আধুনিক বাঙালি মনীষা" নামক গবেষণা নিবন্ধটি, অদ্যাবধি এই বঙ্গদেশে সাংখ্যদর্শনের ধারাবাহিক বিবর্তনে বাঙালি মনীষার মূল্যবান যোগসূত্রগুলিকে একত্রিত করার এক বিনম্র প্রয়াস।

ভূমিকা ও উপসংহার সহ বর্তমান গবেষণা নিবন্ধটি মোট সাতটি অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়টি 'ভূমিকা', দ্বিতীয় অধ্যায়টি 'সাংখ্যদর্শনের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ', তৃতীয় অধ্যায়টি 'বঙ্কিম ভাবনায় সাংখ্যদর্শন', চতুর্থ অধ্যায়টি 'সাংখ্যের ঐতিহ্যানুসন্ধানে স্বামী বিবেকানন্দ', পঞ্চম অধ্যায়টি 'রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান-চিন্তনে সাংখ্যদর্শন', ষষ্ঠ অধ্যায়টি 'বাঙালির সাংখ্যচর্চার ইতিবৃত্ত' এবং সর্বশেষ সপ্তম অধ্যায়টি 'উপসংহার'। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োজনানুসারে 'উল্লেখপঞ্জি' সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এছাড়াও গবেষণা নিবন্ধের শেষে চারটি 'পরিশিষ্ট', 'গ্রন্থপঞ্জি' ও 'শব্দসূচি' যথাযথভাবে বিন্যস্ত হয়েছে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগে 'M.A.' ও 'M.Phil.' করার পর 'Ph.D' করার সুযোগ পেলে, ২০১৫ সালের ৩১শে জুলাই এই বিভাগে গবেষণার জন্য আমার নিবন্ধীকরণ (Ph.D Enrollment) হয়। গবেষণার বিষয় ও দিক নিয়ে বিস্তর খোঁজ ও আলোচনার পর আমার অধ্যাপিকা, ড. কাকলী ঘোষ মহাশয়া, যিনি বস্তুত এই গবেষণা কার্যের নির্দেশিকা (Supervisor), আমাকে সাংখ্যচর্চায় বাঙালিদের অবদানের ব্যাপারে পড়াশোনার জন্য নির্দেশ দেন। যেহেতু উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে নবজাগরণের প্রভাব ছিল স্পষ্ট, সেহেতু সাংখ্যচর্চার বিস্তৃত ধারাবিবরণীর খোঁজে এই উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারক ও তাঁদের রচনার মধ্যে প্রবেশ করি। প্রাথমিকভাবে হাতে আসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত "সাংখ্যদর্শন" প্রবন্ধটি। তারপর শুরু হয় সাংখ্যের উপর বাঙালি বিদ্বজ্জনের লেখা প্রবন্ধ, আলোচনা, অনুবাদ, মৌলিক রচনা তথা প্রাসঙ্গিক আলোচনার খোঁজ।

যেকোনও গবেষণা কার্যের শুরুর দিকে প্রধান যে বাধা থাকে, তা হল তথ্যের অপর্যাপ্ততা ও সঠিক দিকের নির্দেশ পাওয়া। আমার গবেষণার কাজটিও এর ব্যতিক্রম কিছু না। গবেষণা শুরুর দিকে তথ্যের যথেষ্ট পরিমাণে অভাব বোধ করেছি, তবে সৌভাগ্যক্রমে আমার অধ্যাপিকার সঠিক দিগ্‌নির্দেশে তথ্যের সন্ধান পেয়েছি ও তার ভিত্তিতে নিবন্ধের কাজ করেছি।

ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশনের ইন্টারভিউ অতিক্রম করে, ২০১৭ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি দুর্গাপুরে অবস্থিত মাইকেল মধুসূদন মেমোরিয়াল কলেজে সহকারী অধ্যাপক রূপে যোগদান করি। স্বাভাবিকভাবেই নানা কর্মব্যস্ততায় গবেষণার কাজ এই সময় অত্যন্ত ধীরলয়ে এগোতে থাকে। অবশ্য, কলেজের সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে থাকা পর্যাপ্ত বই থেকে গবেষণার বিষয়ে আরও অনেক তথ্য হাতে আসতে থাকে, যেগুলি পরবর্তীকালে আমার গবেষণা নিবন্ধটিকে আরও সমৃদ্ধ করেছে বলে আমার মনে হয়।

আমার কাছে এই বিষয়টি অত্যন্ত সৌভাগ্যের ও আনন্দের যে, আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপিকা ড. কাকলী ঘোষ মহাশয়ার কাছে গবেষণার কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। তিনি শুধুমাত্র আমাকে গবেষণার বৃহত্তর জগতের সাথে পরিচিত করিয়েছেন তাই নয়; সেই সুদীর্ঘ যাত্রাপথের প্রত্যেকটি স্তরে স্নেহ ও শাসনে একথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন 'স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্'। বিবিধ বিষয়ে, বিশিষ্ট জনের কাছে মতামত নেবার জন্য তিনি যেমন হৃষ্টচিত্তে অনুমতি দিয়েছেন, তেমনই গবেষণা বিষয়ে আমার হাজারো প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন সানন্দে। তাঁর এইরূপ সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এই গবেষণা নিবন্ধটি কখনই সম্পূর্ণ হত না বলে আমার বিশ্বাস। এপ্রসঙ্গে একথা বললে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হয় না যে, শাস্ত্রীয় পরিসর তো বটেই; তার সাথে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও ব্যাবহারিক জীবনেও তাঁর কাছ থেকে পাওয়া উপদেশ ও পরামর্শ আমার জীবনের পাথেয় স্বরূপ।

শর্তহীন সাধুবাদ জানাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে। আজ কর্মস্থল অন্যত্র হলেও যখনই কোনওভাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত হবার সুযোগ আসে, তখনই যুক্ত থাকার চেষ্টা করি। আমার ধারণা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল সময় না কাটালে জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা শূন্য থেকে যেত। তাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আমার কাছে প্রকৃত অর্থেই *alma mater*। ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ট কমিশনের (UGC) প্রতিও বিশেষ সাধুবাদ জানাই। কলেজে যোগদানের পূর্বে 'জুনিয়র রিসার্চ ফেলো' হিসেবে ইউ.জি.সি'র অর্থানুকূল্যেই গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি। এখানে স্বীকার করতেই হয় যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ আমাকে পড়ার ও গবেষণা করার জন্য যে 'প্ল্যাটফর্ম' দিয়েছে, তার সৌজন্যেই আজ কলেজে অধ্যাপনার কাজে ও বিবিধ বিষয়ে গবেষণার কাজে প্রতিনিয়ত নিজেকে নিযুক্ত রাখতে পেরেছি। এই প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি সংস্কৃত বিভাগের অন্যান্য সকল অধ্যাপক-অধ্যাপিকা বৃন্দকে, যাদের কাছে নিরন্তর পড়াশুনা ও গবেষণা কার্যের প্রেরণা পেয়েছি।

ঋণ স্বীকার করি সেই সমস্ত গ্রন্থাগারের নিকট, যেখানে থাকা সুবৃহৎ পুস্তকরাশি এই গবেষণা নিবন্ধের কাঠামোতে তত্ত্ব ও তথ্যের যোগান দিয়ে সম্পূর্ণ রূপ দিতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অফ কালচার্ মেন লাইব্রেরি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সেন্ট্রাল ও ডিপার্টমেন্টাল লাইব্রেরি, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ লাইব্রেরি, মাইকেল মধুসূদন মেমোরিয়াল কলেজ সেন্ট্রাল লাইব্রেরি -এই কয়েকটি গ্রন্থাগারের নাম কৃতজ্ঞতার সাথে উল্লেখ করার মতো। এবং মূল্যবান বইপত্র ব্যবহারের সুযোগ করে দেবার জন্য সেখানকার গ্রন্থাগারিকদের প্রতিও বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

আজকের 'ডিজিটাল দুনিয়া'তে গবেষণার মতো কাজে 'ডিজিটাল' মাধ্যমের সাহায্যের কথা বলাই বাহুল্য। বই থেকে শুরু করে অডিও, ভিডিও, বিভিন্ন আর্টিকেলের সম্ভার নিয়ে উপস্থিত ডিজিটাল লাইব্রেরি ও রিসোর্সেস সমূহ। Internet Archive, National Digital Library of India, West Bengal Public Library Network, ePustakalay,

JSTOR, Encyclopaedia Britannica, Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP), Shodhganga: a reservoir of Indian theses, Scribd, Sanskrit Documents –এই কয়েকটি ডিজিটাল লাইব্রেরি ও রিসোর্সের নাম কৃতজ্ঞতার সাথে উল্লেখযোগ্য একাধারে সময়, শ্রম ও অর্থ সাশ্রয়ের জন্য।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি আমার কর্মস্থলের অর্থাৎ মাইকেল মধুসূদন মেমোরিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ ও সহকর্মীদের, যাদের নিরন্তর উৎসাহ গবেষণা কার্যের অগ্রগতিতে স্বল্প হলেও গতি প্রদান করেছে। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি সেইসমস্ত শিক্ষাব্রতীদের প্রতি, যাদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর রাখা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, আমার দৃষ্টিকোণ প্রসারিত করতে সাহায্য করেছে। এপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কলকাতায় অবস্থিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপিকা ড. রত্না বসু এবং লোনাভলা (পুণে) স্থিত কৈবল্যধাম ইন্সটিটিউটের ফিলোসফিকো লিটারারি রিসার্চ ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ড. রাজেশ্বর মুখার্জী এবং পশ্চিম বর্ধমান স্থিত কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. আজাজুল আলি খান এই তিন জনের নাম।

বাংলা ভাষা ও হরফে গবেষণার কাজ নতুন কিছু না, তবে বাংলা হরফ কম্পিউটারে টাইপ করার ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা থেকেই যায়। এই কাজটি আমার কাছে অপেক্ষাকৃত সহজ বলে প্রতিপন্ন হয়েছে ‘অভ্র কিবোর্ড’ নামক এই ইউনিকোড সফটওয়্যারটির সৌজন্যে। বাংলা হরফে কম্পিউটারে টাইপিং এতখানি সহজ করে তোলার জন্য একজন গবেষক হিসেবে ‘অভ্র কিবোর্ড’ নামক সফটওয়্যার প্রস্তুতকারক ‘Omicronlab’ এর প্রতি সাধুবাদ জানাই।

সবথেকে শেষে বললেও যাদের মূল্যবান অবদানের কথা অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে স্বীকার করতেই হবে, তারা হলেন আমার পরিবার। গবেষণা নিবন্ধ লেখার এই সুদীর্ঘ সময়ে আমাকে অনেক পারিবারিক জটিলতা থেকে দূরে রেখে, কাজের মধ্যে মনোনিবেশ করতে আমার পরিবার প্রতিনিয়তই প্রেরণা দিয়েছে।

সাতটি অধ্যায় জুড়ে বিন্যস্ত এই গবেষণা নিবন্ধের প্রতিটি স্তরে আমি সর্বদাই চেষ্টা করেছি তত্ত্ব ও তথ্যের উপর ভিত্তি করে নিজের বক্তব্যকে উপস্থাপন করার। আমার ধারণাতে, যে পরিমাণ আন্তরিক ও অকৃত্রিম সাহায্য বিবিধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উচ্চমানের গ্রন্থাগার, ডিজিটাল রিসোর্স ও শিক্ষাব্রতীদের থেকে আমি পেয়েছি, তার প্রেক্ষিতে খুব সামান্যই প্রকাশ করতে পেরেছি এই গবেষণা নিবন্ধে। এই বিষয়টিতে আরও উচ্চমানের গবেষণার প্রয়োজন আছে এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অদূর ভবিষ্যতে তা গবেষকগণ কর্তৃক গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষা–জগতের সামনে উদ্ভাসিত হবে।

পূর্বজন্মকৃতং কর্ম তদ্দৈবমিতি কথ্যতে।
তস্মাৎ্ পুরুষকারেণ যত্নং কুর্যাতন্দ্রিতঃ।।
যথা মৃত্পিণ্ডতঃ কর্তা কুরুতে যদ্যদিচ্ছতি।
এবমাত্মকৃতং কর্ম মানবঃ প্রতিপদ্যতে।।

–নারায়ণ শর্মা, *হিতোপদেশ*, প্রস্তাবিকা, শ্লোক ৩৩–৩৪

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা		ক–গ
প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা		১–৭
দ্বিতীয় অধ্যায়: সাংখ্যদর্শনের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ		৮–৪৭
২.০.	ভূমিকা	৯
২.১.	সত্যের দিগ্‌দর্শনে সত্যান্বেষীগণ	৯
২.২.	প্রথম আলোর খোঁজে	৯–১০
২.৩.	সম্প্রদায়ের প্রাণপুরুষগণ	১০
২.৪.	তত্ত্বে ও তথ্যে সাংখ্য	১১–৪১
২.৪.১.	‘সাংখ্য’– শুধুই কি গণনা?	১১–১২
২.৪.২.	*সাংখ্যকারিকা* - শাস্ত্র বা প্রকরণ ?	১২–১৩
২.৪.৩.	সাংখ্যপ্রবেশ - অনুবন্ধচতুষ্টয়	১৩–১৪
২.৪.৪.	দুঃখ : পরিচয়–প্রকার–জিজ্ঞাসা	১৪–১৭
২.৪.৫.	তত্ত্ব–উদ্দেশ	১৭–১৮
২.৪.৬.	প্রমাণ (উদ্দেশ–লক্ষণ–পরীক্ষা)	১৮–২২
২.৪.৭.	প্রধান–সিদ্ধি	২২–২৭
২.৪.৮.	গুণত্রয়	২৭–২৮
২.৪.৯.	পুরুষ–সিদ্ধি	২৮–৩১
২.৪.১০.	সৃষ্টিক্রম	৩১–৩৪
২.৪.১১.	সূক্ষ্ম শরীর	৩৪–৩৫
২.৪.১২.	বুদ্ধিধর্ম	৩৫–৩৬
২.৪.১৩.	বুদ্ধির পরিণাম বা প্রত্যয়সর্গ	৩৬
২.৪.১৪.	ভূতসর্গ বা তন্মাত্রসর্গ	৩৬–৩৭
২.৪.১৫.	সর্গের দুঃখময়তা	৩৭
২.৪.১৬.	প্রকৃতি ও সৃষ্টি	৩৭–৩৯
২.৪.১৭.	বন্ধন বা মুক্তি– প্রকৃতির অথবা পুরুষের?	৩৯
২.৪.১৮.	কৈবল্য	৩৯–৪১

২.৫.	প্রচার-প্রসার ও অস্তিত্বের সংকট	৪১-৪২
২.৬.	উপসংহার	৪২
	উল্লেখপঞ্জি	৪৩-৪৭

তৃতীয় অধ্যায়: বঙ্কিম-ভাবনায় সাংখ্যদর্শন ৪৮-৭৫

৩.০.	ভূমিকা	৪৯
৩.১.	ব্যক্তিজীবন ও কর্মজীবন	৪৯-৫০
৩.২.	রচনাসম্ভার	৫০-৫১
৩.৩.	প্রবন্ধসাহিত্য ও বঙ্কিমচন্দ্র	৫১-৫২
৩.৪.	বঙ্কিম-দৃষ্টিকোণে 'সাংখ্যদর্শন'	৫২-৬৯
৩.৪.১.	ভারতবর্ষে সাংখ্যের গতিপথ	৫২-৫৪
৩.৪.২.	প্রসঙ্গ: দুঃখপ্রাধান্য	৫৪-৫৬
৩.৪.৩.	প্রসঙ্গ: দুঃখনিবৃত্তি	৫৬-৫৯
৩.৪.৪.	প্রসঙ্গ: সৃষ্টি	৫৯-৬১
৩.৪.৫.	প্রসঙ্গ: ঈশ্বর	৬১-৬৪
৩.৪.৬.	প্রসঙ্গ: বেদ	৬৪-৬৯
৩.৫.	উপসংহার	৬৯-৭০
	উল্লেখপঞ্জি	৭১-৭৫

চতুর্থ অধ্যায়: সাংখ্যের ঐতিহ্যানুসন্ধানে স্বামী বিবেকানন্দ ৭৬-১১২

৪.০.	ভূমিকা	৭৭
৪.১.	ব্যক্তিজীবন ও কর্মজীবন	৭৭-৮২
৪.২.	রচনাসম্ভার	৮২-৮৮
৪.৩.	প্রবন্ধসাহিত্য ও বিবেকানন্দ	৮৯-৯০
৪.৪.	বিবেক মননে সাংখ্য দর্শন	৯০-১০৬
৪.৪.১.	প্রস্তাব: প্রকৃতি	৯১-৯৫
৪.৪.২.	প্রস্তাব: পুরুষ	৯৫-৯৭
৪.৪.৩.	প্রস্তাব: সৃষ্টি	৯৭-১০০
৪.৪.৪.	প্রস্তাব: ঈশ্বর	১০০-১০৩
৪.৪.৫.	প্রস্তাব: সাংখ্যমত খণ্ডনেই বেদান্তের সোপান	১০৩-১০৬

৪.৫. উপসংহার ১০৬–১০৭
উল্লেখপঞ্জি ১০৮–১১২

পঞ্চম অধ্যায়: রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান-চিন্তনে সাংখ্যপ্রসঙ্গ ১১৩–১৪০

৫.০. ভূমিকা ১১৪
৫.১. ব্যক্তিজীবন ও কর্মজীবন ১১৪–১১৭
৫.২. রচনাসম্ভার ১১৭–১১৯
৫.৩. প্রবন্ধসাহিত্য ও রামেন্দ্রসুন্দর ১২০
৫.৪. রামেন্দ্র-চিন্তনে সাংখ্যের উপাদান ১২১–১৩৬
৫.৪.১. প্রসঙ্গ: প্রকৃতি ১২১–১২৫
৫.৪.২. প্রসঙ্গ: সৃষ্টি ১২৫–১২৯
৫.৪.৩. প্রসঙ্গ: জগতের অস্তিত্ব ১৩০–১৩২
৫.৪.৪. প্রসঙ্গ: পঞ্চভূত ১৩২–১৩৬
৫.৫. উপসংহার ১৩৬
উল্লেখপঞ্জি ১৩৭–১৪০

ষষ্ঠ অধ্যায়: বাঙালির সাংখ্যচর্চার ইতিবৃত্ত ১৪১–১৫৬

৬.০. ভূমিকা ১৪২
৬.১. ধারণার ধারাভাষ্যে উত্তরণ ১৪২–১৫৩
৬.১.১. সংস্কৃত ভাষায় রচিত ভাষ্য, টীকা, টিপ্পনী ও মৌলিক গ্রন্থ ১৪৩–১৪৬
৬.১.২. বাংলা ভাষায় রচিত অনুবাদ, ব্যাখ্যা, প্রবন্ধ ও সম্পাদিত গ্রন্থ ১৪৭–১৫০
৬.১.৩. ইংরাজি ভাষায় রচিত অনুবাদ, প্রবন্ধ ও আলোচনামূলক গ্রন্থ ১৫০–১৫৩
৬.২. উপসংহার ১৫৩–১৫৪
উল্লেখপঞ্জি ১৫৫–১৫৬

সপ্তম অধ্যায়: উপসংহার ১৫৭–১৬২

পরিশিষ্ট ১৬৩–১৭৭

গ্রন্থপঞ্জি ১৭৮–১৮৬

শব্দসূচি ১৮৭–১৯৮

প্রথম অধ্যায়

সত্ত্বাত্ সংজাযতে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ / প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোহজ্ঞানমেব চ ।।

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ / জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ।।

{সত্ত্বগুণ হতে জ্ঞান, রজোগুণ হতে লোভ এবং তমোগুণ হতে মোহ ও অজ্ঞান উৎপন্ন হয়। সত্ত্বপ্রধান ব্যক্তি ঊর্দ্ধলোকে, রজঃপ্রধান ব্যক্তি মধ্যলোকে বা মনুষ্যলোকে এবং তমঃপ্রধান ব্যক্তি অধোলোকে গমন করে।}

–*শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা*, ১৪/১৭–১৮

ভূমিকা

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাংচনঃ / তুল্যপ্রিযাপ্রিযো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ।।

মানাপমানযোস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষযোঃ / সর্বারংভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ।।

{সুখ ও দুঃখ যাঁর সমান, প্রস্তর ও কাঞ্চনে যাঁর তুল্য জ্ঞান, প্রিয় ও অপ্রিয়ে যার সমজ্ঞান, নিন্দা ও স্তুতিতে যার তুল্যজ্ঞান, মান ও অপমানে যাঁর সমান বোধ, মিত্রপক্ষে ও শত্রুপক্ষে যাঁর সমান জ্ঞান, তিনিই গুণাতীত।}

–*শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা*, ১৪/২৪–২৫

বাংলার ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দী একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় কারণ এই সময় পুরোনো ভাবনা, চিন্তা ও চেতনার সব স্তরে আমূল পরিবর্তন হয়ে, সমগ্র সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি নব উদ্যমে ও নব কলেবরে এক আলোকিত যুগের পথে অগ্রসর হয়েছিল। নতুন নতুন ভাবধারার জন্মদাত্রী এই শতাব্দীকে ঐতিহাসিক ও বিদ্বজ্জনেরা 'বাংলার নবজাগরণ' বলে অভিহিত করে থাকেন। পরিবর্তনশীল এই আধুনিক চিন্তাধারায়, সমগ্র ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে বাংলা অনেকটাই এগিয়েছিল এবং সেকারণেই ইউরোপ জুড়ে সংঘটিত 'রেনেসাঁসে'র পুরোধা রূপে যেমন ইতালির ভূমিকা মুখ্য বলে মনে করা হয়, তেমনই ভারতবর্ষের পরিবর্তিত চিন্তাধারা বা নবজাগরণের পুরোধা রূপে বাংলার ভূমিকাই প্রধান বলে গণ্য করা হয়– "পরিবর্তনশীল আধুনিক বিশ্ব সম্বন্ধে সচেতনতার ব্যাপারে প্রায় একশ বছর ধরে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের তুলনায় বাংলা অনেক এগিয়ে ছিল। তাই ভারতবর্ষের নবজাগরণের ক্ষেত্রে বাংলার ভূমিকাকে তুলনা করা যায় ইউরোপিয় রেনেসাঁসের ক্ষেত্রে ইতালির ভূমিকার সঙ্গে"।[১] বিদগ্ধ সমাজ সংস্কারক মহামান্য গোপাল কৃষ্ণ গোখলে যথার্থই বলেছিলেন 'what Bengal thinks today, India thinks tomorrow'।

নবজাগরণ তথা পরিবর্তনশীল চিন্তাধারা একটিমাত্র ক্ষেত্রে বিস্তার করেছিল– এমনটা কোনওভাবেই নয়। এমনটা সাধারণত হতেও পারে না। নতুন চিন্তাধারার আলো কোনও একটি প্রদেশকে স্পর্শ করে যাবার সময় স্বাভাবিকভাবেই অন্য প্রদেশটিকেও প্রভাবিত করে যায়। তাই শিক্ষা, ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি সর্বত্রই অন্ধকারময় নির্জীবতার অপসারণ ঘটিয়ে আলোকময় সজীবতার প্রাণসঞ্চার দেখা গিয়েছিল। সুশীল কুমার গুপ্ত এপ্রসঙ্গে ব্রিটিশ কবি John Addington Symonds এর মন্তব্য উদ্ধার করেছেন, "In like manner we cannot refer the whole phenomena of the Renaissance to any cause or circumstance, or limit them within the field of any one department of human knowledge"।[২]

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্পর্শে সাহিত্যে এক ব্যাপক প্রভাব দেখা যায়। বিদ্বজ্জনদের মতে সাহিত্যের 'অনাধুনিক' ধারাটি ধীরে ধীরে 'আধুনিক' ধারাতে মিশে যেতে থাকে এবং সাহিত্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব যে অনেকখানি বিস্তার করেছিল তার নিদর্শন পাওয়া যায় সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র রচিত *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার* ব্যাখ্যায় ভূমিকাংশে, "এখনকার পাঠকদিগের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই 'শিক্ষিত' সম্প্রদায়ভুক্ত। যাঁহারা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁহাদিগেরই সচরাচর 'শিক্ষিত' বলা হইয়া থাকে... এখন আমাদিগের 'শিক্ষিত' সম্প্রদায় শৈশব হইতে পাশ্চাত্ত্য চিন্তাপ্রণালীর অনুবর্তী। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় চিন্তা-প্রণালী তাঁহাদিগের নিকট অপরিচিত; কেবল ভাষান্তরিত হইলে প্রাচীন ভাবসকল তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাঁহাদিগকে বুঝাইতে গেলে পাশ্চাত্ত্য প্রথা অবলম্বন করতে হয়, পাশ্চাত্ত্য ভাবের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়"।[৩]

পাশ্চাত্ত্য ভাবের আলোকে শুরু হয় এই দেশের প্রাচীন সাহিত্যকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস। এই আঙ্গিকে ভারতীয় দর্শনগুলির দিকে আলোকপাত করলে স্পষ্টতই দেখতে পাওয়া যায় ন্যায় ও বেদান্ত দর্শনের চর্চাতেই বাঙালির সর্বাধিক অভিনিবেশ। বস্তুত নব্যন্যায় ও অদ্বৈত বেদান্ত চর্চার সর্বাধিক বিকাশ ও সমৃদ্ধিতে বাঙালি মনীষার অবদান দর্শনের সমস্ত পাঠক ও আলোচকদের নিকট সর্বজনবিদিত। কিন্তু প্রশ্ন যদি হয় সাংখ্যচর্চায় বাঙালি মনীষার অবদান কতখানি বা বলা ভালো কতটুকু, তাহলে উত্তর খুঁজতে সাংখ্যচর্চার ইতিহাসকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে আনতে হয়। সাংখ্য যেমন নব্যন্যায়ের মতো পুষ্প পত্র পল্লবিত দীর্ঘশাখায় রূপান্তরিত হতে পারেনি, তেমনই বাঙালির তথাকথিত বেদান্তচিন্তার 'কপিরাইটে'র ধাক্কায় মূল

শিকড়টিকে গভীরে প্রোথিত করতে পারেনি। তাহলে সাংখ্যচর্চায় বাঙালির নিযুক্তি ঠিক কতটা? টীকা-টিপ্পনী নির্ভর প্রত্যক্ষ আলোচনা, প্রাসঙ্গিক আলোচনা, এবং মৌলিক আলোচনা উপলব্ধ; তবে সবই পরিমাণে স্বল্প। যদিও সর্বত্র একথা বারংবার প্রতিধ্বনিত হয়েছে যে সাংখ্যের মতবাদকে মূলধন করেই ভারতীয় আস্তিক ও নাস্তিক দর্শনগুলির সবকটিই তাদের 'পসার' জমিয়েছিল।

মোক্ষের সন্ধানে ভারতীয় মনীষা শ্রুতির উৎসপথ ছাড়িয়ে ক্রমে স্মৃতির প্রমাণসাপেক্ষে ন্যায়ের ভাষায় ব্রতী হয়েছিলেন। সূত্র-ভাষ্যের দ্বারা পরমতত্ত্বের পর্যালোচনায় এক এক মত ও পথকে আশ্রয় করে সেই সত্যের স্বরূপে উপনীত হয়েছেন চিন্তাবিদরা। গড়ে উঠেছে সম্প্রদায়। বিচার-বিশ্লেষণ, যুক্তি-প্রতিযুক্তির সেই ধারাভাষ্য কেউ বেদের প্রামাণ্যের কষ্টিপাথরে যাচাই করে পরিবেশন করেছেন, কেউ বা তার প্রয়োজনীয়তাই বোধ করেননি। এদের মধ্যে পূর্বোক্ত পরম্পরাটি ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে 'আস্তিক সম্প্রদায়' এবং পরবর্তী পরম্পরাটি 'নাস্তিক সম্প্রদায়' নামে প্রচলিত হয়েছে। সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা এই ষড়্‌দর্শন আস্তিক দর্শনরূপে এবং চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন এই তিন দর্শন নাস্তিক দর্শনরূপে খ্যাত হয়েছে। আস্তিক দর্শনগুলির মধ্যে সাংখ্যপ্রণেতা কপিল, যোগপ্রবক্তা পতঞ্জলি, ন্যায়কার গৌতম, বৈশেষিকদর্শনকার কণাদ, পূর্বমীমাংসক জৈমিনি ও উত্তরমীমাংসক বা বেদান্তসূত্রকার বাদরায়ণ ব্যাস প্রসিদ্ধ।

পরমর্ষি কপিল হলেন সাংখ্যতত্ত্বের প্রথম প্রবক্তা। তাঁর শিষ্য আসুরি। আসুরির নিকট পঞ্চশিখ সাংখ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং তাকে বহু বিস্তৃত করেন। শিষ্যপরম্পরায় এই তত্ত্ব মহামতি ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রাপ্ত হন এবং আর্যা ছন্দে সত্তরটি কারিকায় *সাংখ্যকারিকা* রূপে তা প্রকাশ করেন। এটিই বর্তমানে সাংখ্যদর্শনের প্রচলিত প্রামাণিক গ্রন্থ। পরবর্তী কালের টীকা-টিপ্পনীগুলির বেশিরভাগই সাংখ্যকারিকার উপর রচিত হয়। এপ্রসঙ্গে বাচস্পতি মিশ্রের *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। এছাড়া অজ্ঞাতকর্তৃক *যুক্তিদীপিকা* ও *জয়মঙ্গলা* টীকার পরিচয়ও পাওয়া যায়। তবে *সাংখ্যসূত্র* নামে যে গ্রন্থ পাওয়া যায়, তার প্রামাণ্য বিচারসাপেক্ষ। তাই প্রচলিত সাংখ্যসিদ্ধান্তগুলি ঈশ্বরকৃষ্ণের *সাংখ্যকারিকা* অনুসারেই ব্যাখ্যেয়।

ন্যায় বা বেদান্ত দর্শনে যেরূপ উৎপত্তিকাল থেকে প্রায় ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বহু ভাষ্য-টীকার প্রণয়ন অব্যাহত ছিল, সাংখ্যের সেই ধারায় দ্বিতীয় শতাব্দী হতে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কালের ব্যাপ্তি থাকলেও কারিকা-ভাষ্য/টীকা-তট্টীকা এই পরম্পরায় গ্রন্থের অপবর্গ অঙ্গুলিগ্রন্থি পরিমিত।[৪] তথাপি, টীকা-টিপ্পনী নির্ভর প্রত্যক্ষ আলোচনায় বেশ কিছু বাঙালির এই বিষয়ে নিযুক্তি প্রশংসনীয়। অন্যদিকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় নবজাগরণের উন্মেষে যে কয়েকজন মনীষী ভারততত্ত্ব নিয়ে সারস্বত চর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন, 'সাংখ্য' নিয়ে তাদের যুগোপযোগী প্রাসঙ্গিক ও মৌলিক আলোচনাও কৃতিত্বের দাবি রাখে কারণ, শুধুমাত্র তত্ত্ব ও তথ্যের চর্বিতচর্বণে সেই শব্দভাণ্ডার খরচ হয়নি বরং পাশ্চাত্ত্য দর্শন, আধুনিক বিজ্ঞান, বর্তমান সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে সাংখ্যের 'মাল্টিডাইমেন্‌শনাল্ অ্যাপ্রোচে'র মাধ্যমে অত্যন্ত মনোগ্রাহী ও গুণগ্রাহী হয়ে উঠেছে। সেই মনোগ্রাহিতা ও গুণগ্রাহিতা যথাযথভাবে গবেষণা জগতের সামনে উপস্থাপন করার এক বিনম্র প্রয়াস, "সাংখ্যতত্ত্বসমীক্ষায় আধুনিক বাঙালি মনীষা" নামক বর্তমান গবেষণা নিবন্ধটি।

ভূমিকা ও উপসংহার সহ বর্তমান গবেষণা নিবন্ধটি মোট সাতটি অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়টি 'ভূমিকা', দ্বিতীয় অধ্যায়টি 'সাংখ্যদর্শনের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ', তৃতীয় অধ্যায়টি 'বঙ্কিম ভাবনায় সাংখ্যদর্শন', চতুর্থ অধ্যায়টি 'সাংখ্যের ঐতিহ্যানুসন্ধানে স্বামী বিবেকানন্দ', পঞ্চম অধ্যায়টি 'রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান-চিন্তনে সাংখ্যদর্শন', ষষ্ঠ অধ্যায়টি 'বাঙালির সাংখ্যচর্চার ইতিবৃত্ত' এবং সর্বশেষ সপ্তম অধ্যায়টি 'উপসংহার'। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োজনানুসারে

'উল্লেখপঞ্জি' সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এছাড়াও গবেষণা নিবন্ধের শেষে চারটি 'পরিশিষ্ট', 'গ্রন্থপঞ্জি' ও 'শব্দসূচি' যথাযথভাবে বিন্যস্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যদর্শনের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের পথটি যথাসম্ভব কারিকা ও টীকা-টিপ্পনীর সহায়তায় নির্দেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। যুক্তিনির্ভর আলোচনার মাধ্যমে দুঃখ হতে আত্যন্তিক মুক্তির খোঁজে, সাংখ্যদর্শনের প্রচেষ্টাই সর্বপ্রথম। সাংখ্যের মূল তত্ত্ব ও তথ্যগুলিকে সংক্ষেপে ও সহজে উপস্থাপন করতে শ্রীমদ্ ঈশ্বরকৃষ্ণ রচিত *সাংখ্যকারিকা* গ্রন্থটিকেই প্রামাণ্য গ্রন্থ রূপে বিবেচনা করা হয়েছে এবং কারিকার ব্যাখ্যার প্রয়োজনে বাচস্পতি মিশ্র প্রণীত *তত্ত্বকৌমুদী* টীকার ও অজ্ঞাতকর্তৃক রচিত *যুক্তিদীপিকা* নাম্নী টীকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সাংখ্যদর্শন স্বীকৃত প্রমাণত্রয়ের সাপেক্ষে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের আলোচনা তথা গুণত্রয়, সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, পুরুষসিদ্ধি, প্রধান সিদ্ধি, সূক্ষ্ম শরীর, বুদ্ধির ধর্ম, কৈবল্য প্রভৃতি বিষয়গুলি যথাসম্ভব সরলরূপে আলোচিত হয়েছে। সাংখ্যদর্শনের সামান্য ধারণাটি সংক্ষেপে সর্বপ্রথমে উপস্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়েই এই অধ্যায়টির অবতারণা।

তৃতীয় অধ্যায়ে আধুনিক বাঙালিদের মধ্যে অন্যতম, সাহিত্যসম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাবনায় ভারতবর্ষে সাংখ্যদর্শনের যে গতিপথের বিবরণ প্রতিফলিত, তার যুক্তিসঙ্গত পর্যালোচনার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। সাংখ্যদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি স্পষ্টতই উপলব্ধি করেছিলেন, অন্যান্য দর্শন-পরম্পরার মত সাংখ্য তার প্রাচীনত্বের শিরোপা নিয়ে বিদ্যমান। তবে এই প্রাচীনতা সাংখ্যের অসারতা নয়, বরং সুবিস্তৃত দর্শনারণ্যে প্রোথিত বনস্পতির পরিচায়ক।[৫] তন্ত্রের ও বৌদ্ধধর্মের সাংখ্যমূলকত্ব তিনি যথেষ্ট দৃঢ়তার সাথে দেখিয়েছেন। আবার সাংখ্যের মূলতত্ত্বগুলি যেমন, দুঃখপ্রাধান্য, দুঃখনিবৃত্তি, সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, ঈশ্বর (সেশ্বর অথবা নিরীশ্বর) প্রভৃতির বর্ণনার সময় অনেক লৌকিক জগতের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে দুঃখপ্রাধান্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি অবতারণা করেছেন সেইসব দৃষ্টান্তের যেগুলি প্রাচীন পন্ডিতদের না, বরং আধুনিক সমালোচকের। প্রসঙ্গক্রমে সেখানে মাদক সেবন, রাসায়নিক যৌগ কার্বনিক অ্যাসিড, ম্যালথাসের পপুলেশন থিয়োরি এইরকম বিবিধ বিষয় উঠে এসেছে। শাস্ত্রীয় বিষয়ের ব্যাখ্যায় তথা সমালোচনায় এটি একটি অভিনব উদ্যোগ, যা বিষয়ের উপলব্ধিতে অনেক বেশি সহায়ক। আবার দুঃখনিবৃত্তির আলোচনায় প্রাবন্ধিকের বক্তব্যের রেশ ধরে পাঠক পৌঁছে যেতে পারেন সূক্ষ্ম মস্তিষ্কের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায়। তাঁর এইরূপ আধুনিক এবং স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সাংখ্যদর্শন সম্পর্কে আলোচনাটি অত্যন্ত তথ্যসমৃদ্ধ ও যথার্থ অর্থে বহুমুখী।

চতুর্থ অধ্যায়ে উঠে এসেছে সাংখ্যদর্শনের ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়াস। বস্তুত, বেদান্তের প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য যাত্রায় এবং সমগ্র বিশ্বব্যাপী এক অসামান্য আবেদন সৃষ্টি করার জন্য অদ্বৈত বেদান্তের প্রচারক রূপেই তাঁর প্রসিদ্ধি। তবে, এই বেদান্তের আলোচনা করতে গিয়েই প্রসঙ্গক্রমে তিনি সাংখ্যদর্শনের বিবিধ তত্ত্বের যেমন মূলপ্রকৃতি, ইন্দ্রিয়, তন্মাত্র, মহাভূত, সৃষ্টি প্রক্রিয়া, পুরুষ, ঈশ্বর, প্রকৃতিলীন, জীবন্মুক্ত প্রভৃতির উপস্থাপন করেছেন। তিনি স্পষ্টতই উপলব্ধি করেছিলেন ভারতীয় আস্তিক দর্শনগুলির প্রথম প্রয়াসরূপ সাংখ্যদর্শনের মহত্ত্ব। সেই কারণে কপিল প্রণীত সাংখ্যদর্শনকে বেদান্তের উপলব্ধিতে 'stepping stone' বা প্রথম পদক্ষেপ বলতে তিনি দ্বিধা করেননি- "I want this to be clear, because it is the stepping-stone to Vedānta and it is absolutely necessary for you to understand it because this is the basis of the philosophy of the world. There is no philosophy

in the world that is not indebted to Kapila" {এই বিষয়টি আমি স্পষ্টভাবে আপনাদিগকে বুঝাইতে চাই, কারণ ইহা বেদান্ত বুঝিবার পক্ষে প্রথম সোপান স্বরূপ। আর ইহা আপনাদের জানা একান্ত আবশ্যক, কারণ ইহাই সমগ্র জগতের বিভিন্নপ্রকার দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তি। জগতের এমন কোন দর্শনশাস্ত্র নাই, যাহা এই সাংখ্যদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা কপিলের নিকট ঋণী নয়}।[৬] তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন যে, সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে বেদান্ত ও সাংখ্যের আপাতবিরোধ প্রতীত হলেও ভিতরের মূলসুর একই তারে বাঁধা।[৭] তাই সাংখ্যের সিঁড়ি অতিক্রম করে বেদান্তের অট্টালিকায় পদার্পণ করার সময় অত্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে তিনি কাপিল দর্শনের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেছেন– "We shall see how the Vedantists grope out of all these difficulties and reach a perfect solution, and yet all the glory really belongs to Sānkhya. It is very easy to give a finising touch to a building when it is constructed" {আমরা দেখিব, বেদান্তবাদীরা কিরূপে এই সকল আপত্তি ও আশঙ্কা কাটাইয়া নিখুঁত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সব গৌরব কপিলেরই প্রাপ্য। সমাপ্তপ্রায় অট্টালিকাকে সমাপ্ত করা অতি সহজ কাজ}।[৮] স্বামীজির দৃষ্টিভঙ্গিও আধুনিক এবং স্পষ্ট। স্বাভাবিকভাবেই প্রসঙ্গক্রমে হলেও, তাঁর নির্দেশিত তত্ত্ব ও তথ্যগুলি যথার্থ অর্থেই বিজ্ঞানসম্মত ও বহুমুখী।

পঞ্চম অধ্যায়ে, জড় বিজ্ঞানের বিবিধ ব্যাখ্যানাবসরে রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী সাংখ্যের তত্ত্বগুলির বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে যে পর্যালোচনা করেছেন, তার একটি রূপরেখা উপস্থাপনের প্রয়াস করা হয়েছে। প্রবন্ধের উপর প্রবন্ধ দিয়ে তাঁর রচিত প্রবন্ধের ইমারতে একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও সাহিত্যিক সত্তার সংমিশ্রণ ঘটেছিল।[৯] যার ফলস্বরূপ অনেক অব্যক্ত বিষয় সাহিত্যের রসে সিক্ত হয়ে, বিজ্ঞানের তিক্ততা অতিক্রম করে, দর্শনের মুক্ত পরিসরে ব্যক্ত হয়েছিল। 'প্রকৃতি', 'পঞ্চভূত', 'জগতের অস্তিত্ব', 'সৃষ্টিতত্ত্ব'– প্রভৃতি সেই প্রবন্ধের প্রাসাদের কয়েকটি মাত্র, যেখানে তিনি বিজ্ঞানকে উপরের খোলস থেকে নয়; একেবারে নিজ বিশ্বাস-অবিশ্বাস তথা আনন্দ-নিরানন্দের সাথে মিলিয়ে সেই অভিজ্ঞতার নিরিখে দার্শনিক ব্যাখ্যার সুলুকসন্ধানে তৎপর হয়েছেন। দর্শনের উত্তরাধিকার তিনি অত্যন্ত আনন্দের সাথে স্বীকার করেছিলেন এবং আধুনিক পৃথিবীকে সেই উত্তরাধিকারের মূল্য বোঝাতে সেখানেই নোঙর ফেলতে চেয়েছিলেন। এপ্রসঙ্গে Santanu Chacraverti যথার্থই বলেছেন– "He had gladly accepted the Orientalist verdict of the uniqueness and excellence of the vedic-vedantic-sanskritic spiritual legacy and now sought his moorings therein, striving at the same time to adapt this legacy to the challenges of modern world"।[১০] বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ হোক বা যুক্তি, তার অবতারণায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর সরস ও সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ রচনাশৈলীর কারণেই নীরস ও জটিল বৈজ্ঞানিক বিষয় সর্বসাধারণের নিকট উপভোগ্য ও উপাদেয় হয়েছে। তিনি ছিলেন যথার্থ অর্থেই 'Pathbreaking Populariser of Science in Bengal'। ব্যক্ত প্রকৃতি, সৃষ্টি প্রক্রিয়া, জগতের অস্তিত্ব, পঞ্চভূত প্রভৃতির আলোচনায় তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি কখনই কেবল 'কথার মারপ্যাঁচ' না, বরং তা অনেকখানি বৈজ্ঞানিক সত্যবিচারের মঞ্চ। এবং তাৎপর্যপূর্ণভাবে, দার্শনিকের গুণগত বিশ্লেষণ (Qualitative analysis) ও বৈজ্ঞানিকের মাত্রাগত বিশ্লেষণ (Quantitative analysis) –এই দুই পথে তিনি হেঁটে গেছেন সাহিত্যসুধা বর্ষণের মধ্যে দিয়ে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে বাঙালির সাংখ্যচর্চার ইতিবৃত্তটি যথাসম্ভব তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করার চেষ্টা করা হয়েছে। সাংখ্যের মূল ধারণাটি সুপ্রাচীন উপনিষদের সময় থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সময় জুড়ে বিস্তার লাভ করেছে ধারাভাষ্যের মধ্যে দিয়ে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কারিকাকার, টীকাকার, ভাষ্যকার, প্রবন্ধকার, সমালোচক তাদের ভাষ্যস্রোতে

সাংখ্যধারাকে বহমান রেখেছেন। সাংখ্যদর্শনের ঐ প্রবাহে অন্যান্য বাঙালি মনীষাও তাদের মূল্যবান যোগদান রেখে গেছেন সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরাজি ভাষায় টীকা, টিপ্পনী, ভাষ্য, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনার মধ্যে দিয়ে। সংস্কৃত ভাষায় ভাষ্য, টীকা, টিপ্পনী, মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়নে রঘুনাথ তর্কবাগীশ, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, নরেন্দ্রনাথ তত্ত্বনিধি, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, পঞ্চানন তর্করত্ন, কুঞ্জবিহারী তর্কসিদ্ধান্ত, রমেশ চন্দ্র তর্কতীর্থ, কালীপদ তর্কাচার্য, হরিহরানন্দ অরণ্য প্রভৃতি বাঙালি মনীষার নিযুক্তি উল্লেখ করার মত।[১১] এমনকি সাংখ্যদর্শনের বিবিধ দিক অবলম্বন করে যারা সংস্কৃত ভাষায় তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ রচনা করেছেন, তাদের মধ্যে বিধুভূষণ ন্যায়তর্কতীর্থ (ভট্টাচার্য), বেণুধর তর্কতীর্থ, আশুতোষ ন্যায়াচার্য, শরচ্চন্দ্র খাঁ, নিখিলেশ চক্রবর্তী, দীননাথ ত্রিপাঠী, সুরমা মিত্র প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১২] বাংলা ভাষায় অনুবাদ, ব্যাখ্যা, প্রবন্ধ ও সম্পাদিত গ্রন্থ রচনায় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি, কালীবর বেদান্তবাগীশ, সুরেন্দ্রনাথ রায়, মহেশ চন্দ্র পাল, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু, ভূপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী প্রভৃতি বাঙালি বিদ্বজ্জনের নিযুক্তি উল্লেখ করার মত। এবং ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ, প্রবন্ধ ও আলোচনামূলক গ্রন্থ প্রণয়নে পুলিনবিহারী চক্রবর্তী, অভয় কুমার মজুমদার, জে. এন. মুখার্জি, যজ্ঞেশ্বর ঘোষ, নন্দলাল সিনহা, সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জী, ব্রজেন্দ্র নাথ শীল, গোপীনাথ কবিরাজ, অণিমা সেনগুপ্ত প্রভৃতি বাঙালি মনীষার নিযুক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাংখ্য চর্চায় এইরূপ নিযুক্তি স্পষ্টতই সাংখ্যতত্ত্বসমীক্ষায় আধুনিক বাঙালির চিন্তনের গভীরতার দিকটি নির্দেশ করে।

বাংলা ভাষায় গবেষণা নিবন্ধ রচনা করতে গিয়ে যে বিষয়টি সর্বাগ্রে 'শিরঃপীড়া'র কারণ হয়, তা হল বাংলা বানান। বাংলা বানান সম্পর্কে কোনও রাখঢাক না রেখে বলা যায় 'নানা মুনির নানা মত'। স্বাভাবিকভাবেই গবেষণার প্রয়োগবিজ্ঞান (Research Methodology) অনুসরণ করলে 'নানা মতে'র প্রয়োগ না করে, কোনও একটি নির্দিষ্ট মানক (Standardization) অনুসরণ করায় বাঞ্ছনীয়। এই ব্যাপারে আকাদেমি বানান উপসমিতির সম্পাদনায়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কর্তৃক প্রকাশিত *আকাদেমি বানান অভিধানকেই* আমি মানক হিসেবে স্থির করেছি এবং তদনুসারে যথাসম্ভব বানানের শুদ্ধি রক্ষার চেষ্টা করেছি। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে, বিরামচিহ্নের (Punctuation Marks) যথাবিধি প্রয়োগের ব্যাপারে সুভাষ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় আনন্দ পাবলিশার্স কর্তৃক প্রকাশিত *তিষ্ঠ ক্ষণকাল: বাংলা বিরামচিহ্ন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* বইটিকে অনুসরণ করার যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি।

গবেষণা নিবন্ধের সার্বিক সজ্জায় অপর দুটি বিষয় যথা, উল্লেখপঞ্জি (Reference) ও গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই নিবন্ধে Modern Language Association নির্ধারিত সপ্তম সংস্করণের (MLA 7th Edition) প্রয়োগ অনুসারে, উল্লেখপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জি সজ্জিত হয়েছে। উল্লেখপঞ্জিতে বাংলা গ্রন্থের উল্লেখ বাংলা ভাষায়, ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থের উল্লেখ ইংরাজিতে করা হয়েছে। গ্রন্থ, লেখক (অথবা সম্পাদক) ও স্থান অর্থাৎ পৃষ্ঠা সংখ্যা এক হলে ঠিক তার পরের উল্লেখে 'তত্রৈব' বা 'Loc.cit.' এবং স্থান অর্থাৎ পৃষ্ঠা সংখ্যা আলাদা হলে '*তদেব*' বা '*Ibid.*' এবং একই গ্রন্থ পরে উল্লেখ করা হলে '*প্রাগুক্ত*' বা '*Op.cit.*' প্রয়োগ করা হয়েছে। অন্যদিকে, গ্রন্থপঞ্জিতে বাংলা ভাষার গ্রন্থগুলিকে একটি গুচ্ছে এবং ইংরাজি, সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষার গ্রন্থগুলিকে অপর একটি গুচ্ছে রাখা হয়েছে গ্রন্থপঞ্জি সজ্জার সুবিধার্থে। প্রবন্ধের কোথাও শব্দসংক্ষেপ (abbreviation) ব্যবহার করা হয়নি।

@@@@@

উল্লেখপঞ্জি

---

১ অসীম কুমার চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), *বাংলার রেনেসাঁস* , বাংলার রেনেসাঁসের প্রকৃতি, পৃ. ১০

২ সুশীল কুমার গুপ্ত, *উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ* , প্রাক্‌কথন, পৃ. ৩

৩ বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ সংস্করণ), দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৬৮০

৪ *Encyclopedia of Indian Philosophies*. Vol. IV. pp. 14-17

৫ বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ সংস্করণ), দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ২২৪

৬ *The Complete Works of Swami Vivekananda* (150th Birth Anniversary Ed.), Vol.2 (*A Study of the Sānkhya Philosophy*), p.435

৭ Kakali Ghosh, "Legacy of Sāṁkhya Concepts in Śaṁkara's Interpretation: An Exegesis", *The Quintessence of Yoga*, pp. 65-80

৮ *The Complete Works of Swami Vivekananda* (150th Birth Anniversary Ed.), Vol.2 (*A Study of the Sānkhya Philosophy*), p. 442

৯ অপূর্বকৃষ্ণ ঘোষ, *আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর*, পৃ. ১৩

১০ He had gladly accepted the Orientalist verdict of the uniqueness and excellence of the vedic-vedantic-sanskritic spiritual legacy and now sought his moorings therein, striving at the same time to adapt this legacy to the challenges of modern world. (Santanu Chacraverti, "Ramendrasundar Trivedi: A Pathbreaking populariser of Science in Bengal", *Uncharted Terrains*, p. 76)

১১ Karl. H. Potter, *Encyclopedia of Indian Philosophies*. Vol. I.(Bibliography)

১২ Sanskrit-Sāhitya-Pariṣat-Patrikā: Viṣayādi-Sūcīpatram, Vol. 61 & 87

ж ж ж ж ж

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৃহচ্চৈবমিদং শাস্ত্রমিত্যাহুর্বিদুষো জনাঃ।
অস্মিংশ্চ শাস্ত্রে যোগানাং পুনর্বেদে পুরঃ সরঃ।।
(*বৈয়াসিক-মহাভারতম্*, শান্তিপর্ব, অধ্যায়-২৯৮, শ্লোক-৪৬)

সাংখ্যদর্শনের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

Sāṁkhya is not one of the systems of Indian Philosophy.
Sāṁkhya is the philosophy of India!
(*Encyclopedia of Indian Philosophies*, Vol. IV)

২.০. ভূমিকা

চিন্তা কী? চিন্তা হচ্ছে এক বয়ে যাওয়া স্রোত, যার প্রবাহ বিরামহীন। বিরামহীন এই চিন্তাস্রোত ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয় গন্তব্যের দিকে। যে গন্তব্যের পারিভাষিক নাম 'দর্শন'। √দৃশ্ ধাতুর উত্তর ল্যুট্ প্রত্যয়ে করণবাচ্যে দর্শন শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। পাণিনীয় ধাতুপাঠে √দৃশ্ ধাতুটি জ্ঞানার্থক– 'দৃশির্ প্রেক্ষণে'।[১] সুতরাং 'দৃশ্যতে যথার্থতত্ত্বমনেন ইতি দর্শনম্' এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে যথার্থজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় যে শাস্ত্রের দ্বারা তাই হল দর্শন। অন্যদিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিত C. M. Joad মহাবিশ্বে আত্মার অভিযানের যে নথি, সেই নথিকেই দর্শন বলতে আগ্রহী এবং তাঁর মতে দার্শনিক হলেন সেই ব্যক্তি যিনি ঐ অভিযানে মানসিক ও আধ্যাত্মিক আনন্দান্বেষী।[২] অতএব মানসিক ও আধ্যাত্মিক অন্বেষণ হোক বা যথার্থজ্ঞানের অনুসন্ধান, সেই অনুসন্ধান বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব মানুষকে চিন্তাস্রোতে ব্যাপৃত করল। উদ্ভাবিত হল জীবন জিজ্ঞাসা এবং তার উত্তরের খোঁজে শুরু হল তত্ত্বের বিচার, তথ্যের বিশ্লেষণ, যুক্তির নিরূপণ, প্রতিযুক্তির পৃথক্করণ। শুভ মহরৎ হল দর্শনের।

২.১. সত্যের দিগ্‌দর্শনে সত্যান্বেষীগণ

মানব মনের নিরন্তর চিন্তাস্রোতের ফসল রূপে যে দর্শনের গোড়াপত্তন, সেই দর্শন আত্মার অভিযান নাকি অনুসন্ধান? যদি বলা হয় অভিযান মাত্র, তাহলে প্রশ্ন হয় ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী এই অভিযান কার উদ্দেশ্যে? আর যদি বলা হয় অনুসন্ধান মাত্র, তাহলে প্রশ্ন হয় সেই আত্মানুসন্ধান প্রকৃতপক্ষে কার অন্বেষণ? অবশ্য উভয়ত্রই উত্তর এক। সত্যের অনুসন্ধানেই বা সত্যান্বেষণেই এই যাত্রা।

স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় দর্শন পরম্পরায় এই সত্যের উদ্‌ঘাটনে ব্রতী হয়েছেন সত্যান্বেষীগণ। এক এক মত ও পথকে আশ্রয় করে সেই সত্যের স্বরূপে উপনীত হয়েছেন চিন্তাবিদরা। গড়ে উঠেছে সম্প্রদায়। বিচার–বিশ্লেষণ, যুক্তি–প্রতিযুক্তির সেই ধারাভাষ্য কেউ বেদের প্রামাণ্যের কষ্টিপাথরে যাচাই করে পরিবেশন করেছেন, কেউ বা তার প্রয়োজনীয়তাই বোধ করেননি। এদের মধ্যে পূর্বোক্ত পরম্পরাটি ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে 'আস্তিক সম্প্রদায়' এবং পরবর্তী পরম্পরাটি 'নাস্তিক সম্প্রদায়' নামে প্রচলিত হয়েছে। সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা এই ষড়্দর্শন আস্তিক দর্শনরূপে এবং চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন এই তিন দর্শন নাস্তিক দর্শনরূপে খ্যাত হয়েছে। আস্তিক দর্শনগুলির মধ্যে সাংখ্যের প্রণেতারূপে কপিল, যোগপ্রবক্তারূপে পতঞ্জলি, ন্যায়প্রণেতারূপে গৌতম, বৈশেষিকদর্শনকাররূপে কণাদ, পূর্বমীমাংসকরূপে জৈমিনি ও উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তসূত্রকাররূপে বাদরায়ণ ব্যাস প্রসিদ্ধ। পরবর্তীকালে এক একটি পথ অবলম্বনে বিন্দু বিন্দু যুক্তি–প্রতিযুক্তির বহরে যে সত্য–সিন্ধু উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল, সেই সত্যের প্রথম অন্বেষণে ব্রতী হয়েছিলেন এই সত্যান্বেষীগণ।

২.২. প্রথম আলোর খোঁজে (সাংখ্যই প্রথম তত্ত্বান্বেষণের পদক্ষেপ)

'বস্তুজগৎ দুঃখময়'– একথা চিন্তাবিদেরা বিচার–বিশ্লেষণপূর্বক স্থির করেছেন। অথচ দেহধারীর নিকট বস্তুর প্রতি এক মোহময় আকর্ষণ সর্বজনসিদ্ধ। তবে এরকম আকর্ষণ সত্ত্বেও বলতে দ্বিধা নেই যে এই পাঞ্চভৌতিক শরীরের বিনাশ, কালে কালে অবশ্যম্ভাবী এবং স্বাভাবিকভাবেই সেই বিনাশজনিত দুঃখও সর্বৈব সত্য। কিন্তু এই দুঃখের কি বাস্তবিক কোনও

অন্ত নেই? যদি দুঃখের বোধ থাকে তাহলে দুঃখ থেকে পরিত্রাণের উপায়ও নিশ্চয় আছে। সেই উপায় উদ্ভাবনের প্রক্রিয়ার অনুসন্ধানেই ভারতীয় দর্শন পরম্পরায় এক একটি দর্শন শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে।

আস্তিক দর্শনগুলির মধ্যে আবির্ভাবের পৌর্বাপর্য নিশ্চিতভাবে বলা শ্রমসাধ্য, তবে আনুমানিক বলা চলে সাংখ্যদর্শনই এই ধারায় প্রথম পথ আর মহর্ষি কপিল হলেন এই পথের প্রথম অভিযাত্রী। *শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে...* ইত্যাদি মন্ত্রে কপিলের উল্লেখ সাংখ্যদর্শনের প্রাচীনত্বের দাবি করে এরূপ ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের অভিমত।[৩] যদিও মন্ত্রোল্লিখিত এই 'কপিল' আক্ষরিক অর্থেই মহর্ষি কপিল কিনা সেবিষয়ে সংশয় থেকে যায়।[৪] তবে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বৈয়াসিক-মহাভারত* ইত্যাদি গ্রন্থে মহর্ষি কপিলের নাম সমাদরের সাথে গৃহীত হয়েছে। *যুক্তিদীপিকা*কারের মতে সৃষ্টির প্রারম্ভে উৎপন্ন দেবগণের মধ্যে কপিল সর্বপ্রথম।[৫] অন্যান্য দর্শনপ্রণেতাদের মধ্যে মহর্ষি কপিলই শাস্ত্রাদিতে এমন বহুধা ভাবে স্তুত হয়েছেন। তাই দর্শনকার রূপে মহর্ষি কপিল ও দর্শন রূপে সাংখ্যের প্রাচীনত্বের অনুমান করা চলে।

তাছাড়া আর একটি বিষয় লক্ষ্য করার মত। প্রমেয় নিরূপণের ক্ষেত্রে সাংখ্যদর্শন যেখানে পঁচিশটি তত্ত্বের উল্লেখ করে সেখানে ন্যায় ষোলোটি পদার্থের, বৈশেষিক সাতটি পদার্থের ও বেদান্ত একটি মাত্র পদার্থের উল্লেখ করে। বিচার-বিশ্লেষণ, যুক্তি-প্রতিযুক্তি যখন অনুক্ষণ অগ্রসর হতে থাকে তখনই তা নিষ্কর্ষে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপে গমন করে। সেদিক থেকে ভাবলে, সাংখ্যদর্শনকে বিচার-বিশ্লেষণের একেবারে প্রথম দিকের ফসল বললে অত্যুক্তি হয় না।

২.৩. সম্প্রদায়ের প্রাণপুরুষগণ

মহর্ষি কপিলকে সাংখ্যদর্শনের প্রণেতা বলা হলেও তাঁর রচিত কোনও গ্রন্থ এখনও উপলব্ধ নয়। তাই সাংখ্য মতাদর্শের উপর প্রামাণ্যগ্রন্থরূপে শ্রীমদ্ ঈশ্বরকৃষ্ণের *সাংখ্যকারিকা*কে স্বীকার করা হয়। *সাংখ্যকারিকা* থেকে এই বিষয়টি জানা যায় যে, সাংখ্যের তত্ত্ব মহর্ষি কপিল, আসুরি ও পঞ্চশিখ হয়ে পরম্পরাগতভাবে ঈশ্বরকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হয়েছে। কারিকারের কথাতে তা স্পষ্ট–

এতত্ পবিত্রমগ্র্যং মুনিরাসুরযেঽনুকম্পযা প্রদদৌ/ আসুরিরপি পঞ্চশিখায তেন চ বহুধা কৃতং তন্ত্রম্।।
শিষ্যপরম্পরযাগতমীশ্বরকৃষ্ণেণ স চৈতদার্যাভিঃ/ সংক্ষিপ্তমার্যমতিনা সম্যগ্ বিজ্ঞায সিদ্ধান্তিতম্।।[৬]

অতএব, *সাংখ্যকারিকা* থেকে যতটুকু অনুধাবন করা যায়, সেই ক্রমে পরমর্ষি কপিল হলেন সাংখ্যের প্রথম প্রবক্তা। তাঁর শিষ্য আসুরি। আসুরির নিকট হতে বিদ্যালাভ করেন পঞ্চশিখ এবং পঞ্চশিখ হতে শিষ্যপরম্পরাক্রমে তা ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রাপ্ত হন। পঞ্চশিখ হতে ঈশ্বরকৃষ্ণ অবধি এই পরম্পরাটি স্পষ্ট নয়। অদ্যাবধি প্রমাণাভাবে কেবল এইটুকুই মেনে নেওয়া যায় ঐ পর্বেও সাংখ্যের ধারা বিস্তৃত হয়েছিল তবে তাদের নাম কালের গর্ভে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। *বৈয়াসিক-মহাভারত, মাঠরবৃত্তি,* ও *যুক্তিদীপিকা* -নাম্নী টীকায় ঐ মধ্যবর্তীকালের বেশ কিছু সাংখ্যাচার্যের নাম উল্লিখিত হয়েছে। যদিও ঐগুলিকে নিশ্চিত মনে করার কোনও কারণ নেই যেহেতু তালিকাগুলির মধ্যে ক্রমে বিস্তর ফারাক বিদ্যমান। তাই সাংখ্যাচার্যদের গণনায়, উপলব্ধ প্রামাণ্যের উপর ভিত্তি করে ঈশ্বরকৃষ্ণ বরণীয় এবং ঈশ্বরকৃষ্ণ কর্তৃক উল্লেখের সৌজন্যে পঞ্চশিখ, আসুরি ও মহর্ষি কপিল স্মরণীয়।

২.৪. তত্ত্বে ও তথ্যে সাংখ্য

শ্রীমদ্ ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত *সাংখ্যকারিকা* অনুসারেই সাংখ্যের মূল বক্তব্যগুলি এখানে অনুসন্ধেয়। সমগ্র জগতের নিকট যে দার্শনিক চিন্তার উপাদান সাংখ্যদর্শন উপস্থিত করেছিল, তার একমাত্র প্রামাণ্য সংকলন যেহেতু *সাংখ্যকারিকা*, তাই সেই *সাংখ্যকারিকা* ও তার উপর সর্বদর্শনশিরোমণি বাচস্পতি মিশ্র রচিত *তত্ত্বকৌমুদী* টীকা ও অজ্ঞাতকর্তৃক রচিত *যুক্তিদীপিকা* টীকা অনুসারে সাংখ্যের তত্ত্বগুলি সর্বাগ্রে আলোচনীয়।

২.৪.১. 'সাংখ্য'– শুধুই কি গণনা?

'সাংখ্য' শব্দটি ব্যাকরণগত দিক থেকে 'সংখ্যা' শব্দের সাথে তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন হয়। তাই পূর্বে 'সংখ্যা' শব্দের বিচার করণীয়। আপাতভাবে গণনা অর্থেই 'সংখ্যা' শব্দ বহুল প্রচলিত, যদিও ব্যুৎপত্তিগতভাবে সম্ পূর্বক √খ্যা ধাতুর উত্তর অঙ্ প্রত্যয়ে পদটি নিষ্পন্ন হয়। ধাতুপাঠে √খ্যা ধাতুর পাঠ রয়েছে *খ্যা প্রকথনে*।[৭] প্রকথন অর্থাৎ খ্যাতি। তাহলে ব্যুৎপত্তি থেকে 'সংখ্যা' শব্দের অর্থ পাই সম্যক্ রূপে বা প্রকৃষ্টরূপে যা খ্যাত। এই 'সংখ্যা' শব্দের সাথে অণ্ প্রত্যয়ে ক্লীবলিঙ্গ 'সাংখ্য' শব্দটি উৎপন্ন হয় যা মহর্ষি কপিলপ্রণীত সাংখ্যদর্শনকে বোঝায়। কিন্তু প্রশ্ন সেই মূল 'সংখ্যা' শব্দটিকে নিয়েই।

মৎস্য-পুরাণ জানাচ্ছে *সাংখ্যং সংখ্যাত্মকত্বাচ্চ কপিলাদিভিরুচ্যতে*,[৮] *বৈয়াসিক-মহাভারতের* শান্তিপর্বে পাচ্ছি *সাংখ্যাঃ প্রকুর্বতে চৈব প্রকৃতিং চ প্রচক্ষতে/ তত্ত্বানি চ চতুর্বিংশৎ পরিসংখ্যায় তত্ত্বতঃ*,[৯] *ভারতকৌমুদী* টীকাতেও পাচ্ছি *তত্ত্বানি পরিসংখ্যায় গণয়িত্বা...*,[১০] অন্যদিকে অধ্যাপক A. B. Keith মহোদয়ও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন তত্ত্বগণনার উপর।[১১] তাহলে কি গণনাই মুখ্য? পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের গণনার জন্যই কি কাপিলদর্শনের পরিচিতি সাংখ্যদর্শনরূপে? অবশ্য, গণনারূপ অর্থে পণ্ডিত উদয়বীর শাস্ত্রী মহোদয়ের যথেষ্ট আপত্তি। তাঁর মতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বগণনার জন্য কাপিলদর্শনকে যদি সাংখ্য বলা হয়, তবে ষোড়শ-পদার্থ গণনার জন্য গৌতম-প্রণীত দর্শনকে এবং সপ্তপদার্থ গণনার জন্য কণাদ-প্রণীত দর্শনকে সাংখ্য বলা হবে না কেন?[১২] শাস্ত্রী মহাশয়ের ইঙ্গিত পরিষ্কার, সংখ্যা বা গণনা থেকে 'সাংখ্য' শব্দের উৎপত্তি ভ্রমাত্মক ধারণা। যদিও শাস্ত্রী মহাশয়ের সাথে এব্যাপারে সহমত পোষণ করা যায় না কারণ, সংখ্যার যে একটা রহস্যময় ভূমিকা সাংখ্যদর্শনে আছে সেকথা একটু তলিয়ে দেখলেই পাওয়া যায়। সাংখ্যে পুরুষ এক, পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুই এর পৃথক্‌করণই মূল, তার সাধন প্রমাণ তিন, তত্ত্বগুলি আবার কার্য-কারণ দৃষ্টিতে চার, তন্মাত্র, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের সংখ্যা পাঁচ, প্রকৃতি-বিকৃতির সংখ্যা সাত, সিদ্ধি আট, তুষ্টি নয়, মূলিকার্থ দশ, ইন্দ্রিয় একাদশ, করণ ত্রয়োদশ (অহংকার ও বুদ্ধি সমেত), সর্গ চতুর্দশ, সূক্ষ্মশরীরাবয়ব সপ্তদশ/অষ্টাদশ ইত্যাদি। এমনকি, *ষষ্টিতন্ত্র* যা মোটামুটিভাবে সাংখ্যের অনুমিত বা অস্তিত্বযুক্ত তথা অধুনালুপ্ত মূলধারার শাস্ত্রগ্রন্থ, সেখানেও তত্ত্বের সংখ্যা ষাট (৬০)। বস্তুত গ্রন্থটির নামও সেকারণে *ষষ্টিতন্ত্র*।[১৩] অতএব, গণনার ব্যাপারটা সাংখ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে একেবারেই ফেলনা নয়। অবশ্য এ তো গেল প্রথম পক্ষ।

দ্বিতীয় পক্ষে, *অমরকোষ* জানাচ্ছে *চর্চা সংখ্যা বিচারণা* অর্থাৎ সংখ্যা শব্দে আলোচনা ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা বোঝায়।[১৪] শ্রীধরস্বামী *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* টীকায় ব্যাখ্যা করেছেন– *সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়েতি সংখ্যা,*

সম্যগ্‌জ্ঞান তস্মিন্ প্রকাশমানমাত্মতত্ত্বং সাংখ্যম্[১৫] অর্থাৎ সম্যগ্‌জ্ঞান যেখানে প্রকাশিত সেটিই সাংখ্য। অপর টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার গূঢ়ার্থদীপিকা* নাম্নী টীকায় ব্যক্ত করেছেন– *সাংখ্যে সম্যক্ খ্যায়তে সর্বোপাধিশূন্যতয়া প্রতিপাদ্যতে পরমাত্মতত্ত্বমনয়েতি সংখ্যোপনিষত্* অর্থাৎ সকল উপাধিশূন্য পরমাত্মতত্ত্ব সম্যক্ রূপে খ্যাত হয় যেখানে সেটি সংখ্যা উপনিষদ্।[১৬] *ব্রহ্মসূত্রের ভামতী* টীকায় বাচস্পতি মিশ্রও 'সাংখ্য' শব্দে সম্যগ্‌বুদ্ধি বা জ্ঞান এর প্রতি নির্দেশ করেছেন, *সংখ্যা সম্যগ্‌বুদ্ধির্বৈদিকী, তয়া বর্তন্ত ইতি সাংখ্যাঃ।*[১৭] অতএব, দ্বিতীয় পক্ষের নিষ্কর্ষ এই যে সম্যক্ জ্ঞান বা বুদ্ধি এই অর্থেই সংখ্যা শব্দের তাৎপর্য।

তৃতীয় একটি পক্ষও উপলব্ধ। হরিভদ্রসূরি বিরচিত *ষড়্দর্শনসমুচ্চয়* গ্রন্থের টীকাকার গুণরত্নসূরি তৎপ্রণীত *তর্করহস্যদীপিকা* টীকায় মন্তব্য করেছেন– *যদ্বা তালব্যাদিরপি সাংখ্যধ্বনিরস্তোতি বৃদ্ধাম্নায়ঃ। তত্র শঙ্খ নামা কশ্চিদাদ্যঃ পুরুষবিশেষস্তস্যাপত্যং পৌত্রাদিরিতি গর্গাদিত্যাত্ যঞ্ প্রত্যযে শাঙ্খ্যাস্তেষামিদং সাংখ্যং শাঙ্খ্য বা* অর্থাৎ সাংখ্যদর্শনের আদি পুরুষ 'শঙ্খ' বা 'সঙ্খ' এর নামানুসারে এই শাস্ত্রের নামকরণ হয়েছে সাংখ্য। উক্ত গ্রন্থের অন্যতম টীকাকার মণিভদ্রসূরি তৎপ্রণীত *লঘুবৃত্তি* টীকায় এবিষয়ে সদৃশমত পোষণ করেন– *সাংখ্য ইতি পুরুষনিমিত্তেযং সংজ্ঞা, সংখ্যস্য ইমে সাংখ্যাঃ, তালব্যো বা শকারঃ, শঙ্খ নামাদি পুরুষঃ।*[১৮]

তৃতীয় পক্ষটি অবশ্যই বিচার–সাপেক্ষ এবং যথেষ্ট প্রমাণের অপেক্ষা রাখে কারণ 'সঙ্খ' বা 'শঙ্খ' নামে সাংখ্যের কোনও আদি পুরুষের উল্লেখ অন্যত্র উপলব্ধ নয়। এমনকি, গুণরত্নসূরি বা মণিভদ্রসূরি তাঁদের উপস্থাপিত তথ্যের কোনও সূত্রও উল্লেখ করেননি। তাই তৃতীয় পক্ষটি নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে নেওয়া যায় না। তবে প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষদ্বয় বিচারপূর্বক একথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে 'গণনা' ও 'সম্যক্ জ্ঞান' এই দুই অর্থেই সংখ্যা শব্দটির গ্রহণ হতে পারে। কারণ, 'পঞ্চবিংশতি তত্ত্বে'র সম্যগ্‌জ্ঞান বা বিচার যেমন সাংখ্যদর্শনের মূল প্রতিপাদ্য তেমনই 'পঞ্চবিংশতি' এই শব্দটিই প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট যে গণনাও এই দর্শনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পুলিন বিহারী চক্রবর্তী মহাশয় সমন্বয়সাধনের চেষ্টায় বলেছেন, সাংখ্য যেটি ভারতীয় দর্শনের একটি সম্প্রদায়, সেই সাংখ্য শব্দের উৎপত্তি সংখ্যা শব্দ থেকেই। এবং ঐ সংখ্যা শব্দটি একাধারে জ্ঞান, চিন্তন, পরীক্ষণ, আলোচন, পৃথক্‌করণ ইত্যাদি অর্থ সূচিত করে।[১৯] সুতরাং, পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের গণনার মধ্যে দিয়ে তার সম্যগ্‌জ্ঞান বা বিচার যে শাস্ত্রের বিষয়, তাই সাংখ্য।

২.৪.২. *সাংখ্যকারিকা* - শাস্ত্র বা প্রকরণ ?

সাংখ্যদর্শনের প্রথম প্রবক্তা হিসেবে মহর্ষি কপিলের মান্যতাই দার্শনিকদের দ্বারা স্বীকৃত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মহর্ষি কপিলের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত হয়েছে যে গ্রন্থে (যদি হয়ে থাকে!) তা অদ্যাবধি অপ্রাপ্ত। শিষ্য পরম্পরায় শ্রীমদ্ ঈশ্বরকৃষ্ণের পূর্বপর্যন্ত যাঁরা মতামত দিয়েছেন তাঁদের বক্তব্যও লিপিবদ্ধ আকারে প্রাপ্ত হয়নি। *ষষ্টিতন্ত্রের* নামোল্লেখ থাকলেও অদ্যাবধি তা অপ্রাপ্ত। অনুমান করা চলে মহর্ষি কপিল তাঁর সুচিন্তিত মতামত লিখিত আকারে পরিবেশন করেননি, উপদেশাকারেই শিষ্যদের প্রদান করেছিলেন। মৌখিক পরম্পরায় হয়তো সেই তত্ত্বজ্ঞান ব্যষ্টিমানস থেকে সমষ্টিমানসে সঞ্চারিত হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে 'মেধা'র হ্রাসের কারণেই হোক বা 'স্বীকৃতি'র উদ্দেশ্যেই হোক; সেই সুচিন্তিত মতামত সম্ভবত প্রথম লিপিবদ্ধ করা হয় *ষষ্টিতন্ত্রে* (যা অদ্যাবধি অপ্রাপ্ত)। অন্যদিকে, *ষষ্টিতন্ত্রের* বিশালতা ঐ গ্রন্থটির সর্বজনীন হওয়ার পথে ছিল প্রধান অন্তরায়, সেকারণেই কাপিল পরম্পরার ধারক–বাহক শ্রীমদ্ ঈশ্বরকৃষ্ণ মহর্ষি কপিল ও তৎপরবর্তী শিষ্য–

প্রশিষ্যদের সুচিন্তিত মতামত সত্তরটি (৭০) কারিকায় সংকলিত করলেন *সাংখ্যকারিকা* নামে। যা অদ্যাবধি প্রাপ্ত সাংখ্যমতের একমাত্র উজ্জ্বল প্রামাণ্য গ্রন্থ রূপে স্বীকৃত।

যদিও আপত্তির জায়গা এখানেই যে, ঈশ্বরকৃষ্ণ বিরচিত *সাংখ্যকারিকা* গ্রন্থদৃষ্টিতে মূলগ্রন্থ (main text) নাকি প্রকরণ গ্রন্থ (manual text)? সাধারণত প্রকরণ গ্রন্থ, মূলগ্রন্থের বা শাস্ত্রের অংশবিশেষের প্রতিপাদন করে। অর্থাৎ মূলগ্রন্থ যদি অংশী হয় তবে প্রকরণ গ্রন্থ হবে তার অংশ। পারিভাষিকভাবে, শাস্ত্রের একদেশের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে যে গ্রন্থ শাস্ত্রের মূল বিষয়টি প্রতিপাদন করে তাকে প্রকরণগ্রন্থ বলা হয়।[২০] কিন্তু এই যুক্তিতে *সাংখ্যকারিকা* মূল সাংখ্যদর্শনের একদেশের সাথে যুক্ত একথা বলা যায় না কারণ সাংখ্যদর্শনের সব বিষয়ই *সাংখ্যকারিকায়* আলোচিত হয়েছে। কারিকাকার স্পষ্ট নির্দেশ করেছেন, *ষষ্টিতন্ত্রের* সকল বিষয়ই এই সত্তরটি কারিকায় ব্যাখ্যাত তবে অভিনবত্বের জায়গা এটুকুই যে আখ্যায়িকা ও পরমত খণ্ডন-মণ্ডন এখানে বর্জিত-

সপ্তত্যাং কিল যেঽর্থাস্তেঽর্থাঃ কৃত্স্নস্য ষষ্টিতন্ত্রস্য

আখ্যাযিকাবিরহিতাঃ পরবাদবিবর্জিতাশ্চাপি ।। [২১]

অর্থাৎ এটি স্বয়ং মূলগ্রন্থ। *তত্ত্বকৌমুদী* টীকায় বাচস্পতি মিশ্রও এই গ্রন্থের শাস্ত্রত্বে সমর্থন জানিয়েছেন এবং পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন।[২২] অন্যদিকে *যুক্তিদীপিকা* নাম্নী টীকায় টীকাকার একটি তন্ত্র বা শাস্ত্রগ্রন্থের বৈশিষ্ট্যগুলি বিশদে উপস্থাপনপূর্বক[২৩] যথেষ্ট যুক্তি সহযোগে *সাংখ্যকারিকার* তন্ত্রত্ব বা শাস্ত্রত্ব প্রতিপাদন করেছেন।[২৪] অতএব *সাংখ্যকারিকা* প্রকরণগ্রন্থরূপে নয়, মূলগ্রন্থরূপেই বিবেচ্য।

২.৪.৩.সাংখ্যপ্রবেশ - অনুবন্ধচতুষ্টয়

শাস্ত্র বা গ্রন্থপ্রবেশের প্রাচীনরীতিই হল প্রবেশের পূর্বে সেই শাস্ত্রের অনুবন্ধ-চতুষ্টয়ের সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান কারণ অনুবন্ধ-চতুষ্টয়ের যথার্থ জ্ঞান ছাড়া শাস্ত্রব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত হয় না।[২৫] মীমাংসকাচার্য কুমারিল ভট্ট যথার্থই নির্দেশ করেছেন, *সিদ্ধার্থং জ্ঞাতসংবন্ধং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ততে/ শাস্ত্রাদৌ তেন বক্তব্যঃ সংবন্ধঃ সপ্রযোজনঃ*।[২৬] এই 'অনুবন্ধ' দর্শনশাস্ত্রের একটি পারিভাষিক শব্দ। আপোদেবের *বালবোধিনী* টীকায় 'অনুবন্ধ' শব্দে নির্দেশ করা হয়েছে, নিজ জ্ঞানের অনন্তর যা পুরুষকে কোনও গ্রন্থ বা শাস্ত্রপাঠে প্রেরণ করে তাই অনুবন্ধ।[২৭] অর্থাৎ সোজা কথায় অনুবন্ধ হল 'নিমিত্ত', শাস্ত্রপাঠের নিমিত্ত। অবশ্য ব্যাকরণগত পর্যালোচনার মধ্যে দিয়েও অনুবন্ধ শব্দটির একটি যুক্তিযুক্ত ও সুস্পষ্ট অর্থ পাওয়া যেতে পারে। যেমন পাণিনীয় পরম্পরায় 'অনু'র কর্মপ্রবচনীয়ত্ব সিদ্ধ হয়েছে। কর্মপ্রবচনীয়ত্ব সাধক এমনই একটি সূত্র *লক্ষণেত্থম্ভূতাখ্যানভাগবীপ্সাসু প্রতিপর্যনবঃ* (*অষ্টাধ্যায়ী*, ১/৪/৯০)। যার অর্থ লক্ষীকরণ, ইত্থম্ভূতাখ্যান বা যথাযথ ঘটনা বর্ণন, ভাগ বা অংশ ও বীপ্সা বোঝাতে প্রতি, পরি ও অনু কর্মপ্রবচনীয় হয়। অতএব 'লক্ষীকরণ' অর্থটি সামনে রেখে, অনুবন্ধ শব্দের এমন অর্থ করা যায় যে, শাস্ত্র বা বিষয়কে লক্ষ্য করে যেগুলি পাঠককে শাস্ত্রে বা বিষয়ে প্রবর্তিত করে সেগুলি অনুবন্ধ। আবার, ব্যাকরণে লক্ষ্য করা যায়, অনুবন্ধগুলি একটি বিশেষ কাজে তাদের ভূমিকা পালন করে কিন্তু কাজ সম্পূর্ণ হবার পর তাদের আর কোনও অস্তিত্ব থাকে না। যেমন মাহেশ্বর সূত্রগুলি অনুধাবন করলেই বোঝা যায় হলন্ত ব্যঞ্জনগুলি এক একটি অনুবন্ধ।

প্রত্যাহার গঠনে এদের ভূমিকা কিন্তু প্রত্যাহারস্থ বর্ণগুলিতে এদের স্থান নেই। শাস্ত্রের ক্ষেত্রেও অনুবন্ধগুলি পাঠককে শাস্ত্রপাঠে প্রবৃত্ত করে। শাস্ত্রপাঠে পাঠককে নিযুক্ত করা পর্যন্তই এদের ভূমিকা।

বেদান্তসার প্রণেতা সদানন্দযোগীন্দ্র অনুবন্ধ-চতুষ্টয়ের উল্লেখ করেছেন- অধিকারী, বিষয়, সংবন্ধ ও প্রয়োজন।[২৮] অতএব, সাংখ্যশাস্ত্রে প্রবেশের পূর্বে ঐ শাস্ত্রের অনুবন্ধচতুষ্টয় বর্তমানে অনুধাবনীয়। শ্রীমদ্ ঈশ্বরকৃষ্ণবিরচিত *সাংখ্যকারিকার* বিষয় পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। বিষয় ও শাস্ত্রের মধ্যে প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক সংবন্ধ বিদ্যমান। পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হল প্রতিপাদ্য আর *সাংখ্যকারিকা* তার প্রতিপাদক। এই শাস্ত্রের প্রয়োজন মুক্তি অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখ (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক) থেকে আত্যন্তিক নিবৃত্তি। এবং মুক্তিকামী ব্যক্তি বা মুমুক্ষু পুরুষই হলেন সাংখ্যশাস্ত্রের যথার্থ অধিকারী। টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও *তত্ত্বকৌমুদী* টীকায় অধিকারীর স্থলে প্রেক্ষাবান্, বিষয়ের স্থলে প্রতিপিত্সিত অর্থ, প্রয়োজনের স্থলে পরমপুরুষার্থ এইভাবে কিঞ্চিৎ শব্দবন্ধের পরিবর্তন ঘটিয়ে ভিন্ন শব্দপ্রয়োগের মাধ্যমে অনুবন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন।[২৯]

২.৪.৪. দুঃখ : পরিচয়-প্রকার-জিজ্ঞাসা

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ - সেই সুদূর অতীত থেকেই সুখের নিমিত্ত মানুষের একান্ত আকুতি। এই পৃথিবীতে সুখ কে না চায়? আর, ঠিক বিপরীতপ্রান্তে দুঃখ কে বা চায়? ঋষিকণ্ঠে তাই নিষেধবাণী শোনা যায় *মা কশ্চিত্ দুঃখভাগ্ ভবেত্*। অথচ জীবনের বৈপরীত্য এখানেই যে জগতে সুখ বেশি না দুঃখ বেশি তার যুক্তি-প্রতিযুক্তি খুঁজলে 'কালি-কলম কম পড়িয়া যাবে'। তবে আপাতভাবে যুক্তি-প্রতিযুক্তির বাইরে দুঃখাধিক্যেরই প্রতীতি হয়।

সাংখ্যতত্ত্বে দুঃখকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সাংখ্যকারিকাকার কারিকার শুরুই করেছেন 'দুঃখ' শব্দের উল্লেখের মধ্যে দিয়ে *দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদপঘাতকে হেতৌ*। তবে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই যে জীবমাত্রের অন্যতম প্রয়োজন, সেবিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব নিয়ে আপত্তির জায়গা থেকেই যায়

দুঃখনিবৃত্তি ও শাস্ত্রজিজ্ঞাসা

যেহেতু এক পক্ষ মনে করেন শাস্ত্রীয় বিষয়ের জ্ঞান দুঃখের আত্যন্তিক উচ্ছেদে অক্ষম, অন্যদিকে আর এক পক্ষের মতে শাস্ত্রীয় বিষয়ের জ্ঞানই দুঃখের আত্যন্তিক উচ্ছেদে সক্ষম। তাই দুঃখনিবৃত্তিতে শাস্ত্রজিজ্ঞাসার স্থান কতখানি সেই বিচার কিঞ্চিৎ বিচার্য। দুঃখনিবৃত্তিতে শাস্ত্রীয় জিজ্ঞাসার আবশ্যকতা নিয়ে যারা প্রশ্ন করেন তাদের আপত্তির কারণ প্রথমত, ইহজগতে যদি দুঃখ নামে কোনও পদার্থ না থাকে। দ্বিতীয়ত, যদি দুঃখ নামে কোনও পদার্থ থাকেও, সেটি যদি ত্যাজ্য না হয়। অর্থাৎ কেউ যদি দুঃখকে ত্যাগ করতে না চায়। তৃতীয়ত, দুঃখ ত্যাজ্য হলেও, যদি সেই দুঃখের সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ সম্ভব না হয়। চতুর্থত, দুঃখ যদি নিত্য হয় (যেমন আত্মা নিত্য) তাহলে দুঃখের উচ্ছেদ কোনওভাবেই সম্ভব নয়। পঞ্চমত, যদি দুঃখ থেকে নিষ্কৃতির প্রকৃত উপায় অজানা থাকে তাহলেও দুঃখের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সম্ভব হয় না। ষষ্ঠত, দুঃখসমুচ্ছেদ সম্ভবপর হলেও শাস্ত্রীয় বিষয়-জ্ঞান যদি সেই দুঃখসমুচ্ছেদের কারণ না হয় অথবা দুঃখনিবৃত্তির জন্য শাস্ত্রীয়জ্ঞান অপেক্ষা অন্য অনায়াসসাধ্য উপায় থাকে। পূর্বপক্ষীর এই আপত্তিগুলির কারণেই সংশয় উপস্থিত হয় দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিতে শাস্ত্রীয় বিষয়জ্ঞানের আবশ্যকতা নিয়ে। যদিও এরূপ সংশয় খণ্ডনপূর্বক যারা শাস্ত্রীয় জিজ্ঞাসাকেই দুঃখনিবৃত্তির উপায় বলে মনে করেন, তারা প্রতিযুক্তি উপস্থাপন করেন- প্রথমত, জগতে সর্বজনসম্মত দুঃখের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় কি? অতএব স্বীকার করতেই হয় ইহজগতে দুঃখ আছে। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তির নিকট দুঃখ অনিষ্টরূপে বা প্রতিকূলরূপেই বোধ হয়। তাই দুঃখ মাত্রই তা ত্যাগের

ইচ্ছাও হয়। তৃতীয়ত, দুঃখের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও দুঃখের অভিভব (অর্থাৎ অনুভব না হওয়া) যে সম্ভব, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। চতুর্থত, দুঃখ নিত্য নয় কারণ, দুঃখের অবসান বা বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। পঞ্চমত, দুঃখ থেকে নিষ্কৃতির উপায় অপরিজ্ঞাত নয়। শাস্ত্রীয় বিষয়ের জ্ঞানই দুঃখ থেকে নিবৃত্তির উপায়। ষষ্ঠত, দুঃখ নিবৃত্তিতে অন্য অনায়াসসাধ্য উপায় থাকলেও সেগুলি দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিতে অক্ষম। দুঃখের সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ সেই সুকর-উপায়গুলির দ্বারা সম্ভব হয় না। অতএব, দুঃখনিবৃত্তিতে শাস্ত্রবিষয়ের জিজ্ঞাসাই একমাত্র পাথেয়।

ত্রিবিধ দুঃখ

প্রাণীমাত্রেই দুঃখ-যন্ত্রণাধীন এবং অগুণতি দুঃখভোগ তার জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই দুঃখের বাস্তবিকই পরিসংখ্যান হয়না। এক এক ব্যক্তি কোটি কোটি দুঃখের মধ্যে দিয়ে যায়। তথাপি গ্রন্থকার বললেন *দুঃখত্রয়া...* অর্থাৎ দুঃখত্রয়। তাহলে কি দুঃখের সংখ্যা তিনটি? কিন্তু ব্যক্তির তো অনেক দুঃখের অনুভব হয়। বস্তুত দুঃখের সংখ্যা না, দুঃখের প্রকার এখানে বিবক্ষিত। অর্থাৎ, জগতে যতপ্রকার দুঃখ আছে সেই সমস্ত দুঃখ সংখ্যায় যতই হোক না কেন তা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তিন প্রকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। আধ্যাত্মিক অর্থাৎ আত্মাকে আশ্রয় করে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়। আত্মার ধর্ম যেহেতু সুখ বা দুঃখ নয়, তাই 'আত্মা' বলতে বুঝতে হবে শরীর ও মন। সুতরাং, শরীর ও মনকে আশ্রয় করে যে দুঃখ উৎপন্ন হয় তা আধ্যাত্মিক। শারীর দুঃখ যেমন বাত-পিত্ত-কফ এই ধাতুত্রয়ের বৈষম্যজনিত উৎপন্ন দুঃখ। মানস দুঃখ যেমন কাম-ক্রোধ-লোভাদি হতে জাত দুঃখ।[৩০] আধিভৌতিক অর্থাৎ ভূতকে আশ্রয় করে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়। ভূত শব্দের অর্থ স্থাবর ও জঙ্গম। অতএব মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ প্রভৃতি জঙ্গম এবং প্রস্তর, উদ্ভিদ প্রভৃতি স্থাবর হতে যে দুঃখ জন্মায় তা আধিভৌতিক দুঃখসমূহ।[৩১] আর সবশেষে আধিদৈবিক। 'দেব' অর্থাৎ দেবযোনিবিশেষ তথা দৈবউৎপাত নিমিত্ত যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, সেইসব দুঃখসমূহ। অতএব, বিদ্যাধর-অপ্সরা-যক্ষ-রাক্ষসাদি দেবযোনিবিশেষ হতে এবং শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-বজ্রাদি দৈবউৎপাত হতে জাত দুঃখসমূহ আধিদৈবিক দুঃখ।[৩২] অতএব, আধ্যাত্মিক অর্থাৎ শারীর ও মানস দুঃখসমূহ শরীরাভ্যন্তরস্থ উপায়ের দ্বারা সাধ্য হওয়ায় এগুলিকে আন্তরোপায়সাধ্য দুঃখও বলা যায়। অন্যদিকে, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক উভয়প্রকার দুঃখসমূহ বাহ্য উপায়ের দ্বারা সাধ্য হওয়ায় এগুলিকে বাহ্যোপায়সাধ্য দুঃখও বলা যায়। একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টি দেখানো যেতে পারে-

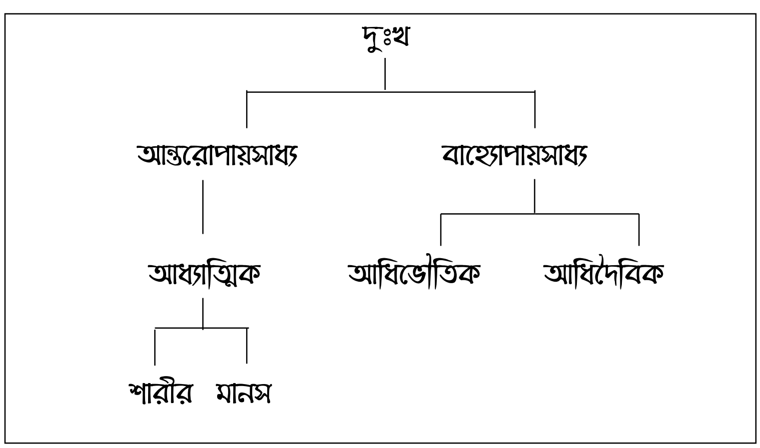

কোনও বিষয়ের প্রাপ্তিতে ব্যক্তিকে উপায়ের খোঁজ করতে হয়। বিষয়প্রাপ্তিতে এই উপায় সাধারণত দুই প্রকার হয়ে থাকে, সুকর ও দুষ্কর উপায়। বলা বাহুল্য যেকোনও ব্যক্তি সুকর উপায় অবলম্বনেই চেষ্টা করবেন কারণ এরকম বলা হয়ে থাকে– *অর্কে চেন্মধু বিন্দেত্ কিমর্থং পর্বতং ব্রজেত্* অর্থাৎ গৃহকোণে যদি মধু উপলব্ধ হয়, তাহলে কেই বা মধুর নিমিত্ত

দৃষ্ট উপায় ও ব্যর্থতা

পর্বতে যাবে! তাই স্বাভাবিকভাবেই দুঃখনিবৃত্তির জন্য সেই ব্যক্তি অনায়াসসাধ্য পথই অবলম্বন করবেন। যেমন বাত-পিত্ত-কফজনিত যে শারীরদুঃখ তা চিকিৎসকের উপদেশ ও পথ্যের সাহায্যে অনায়াসে দূরীকরণযোগ্য। আবার কামক্রোধাদি যে মানসদুঃখ তা স্ত্রী-পান-ভোজন-বিলেপন ইত্যাদি বিষয়ভোগের দ্বারা সহজেই দূর করা যায়।[৩৩] এরকমই পশু, পক্ষী, প্রস্তর, উদ্ভিদ প্রভৃতি হতে জাত যে আধিভৌতিক দুঃখ, তা নীতিশাস্ত্রের যথার্থ অনুসরণে ও নিরুপদ্রবস্থানে বসবাসের দ্বারা সহজেই দূরীকরণযোগ্য।[৩৪] এবং যক্ষ-রাক্ষসাদি হতে জাত যে আধিদৈবিক দুঃখ, তা রত্নাদিধারণ, মন্ত্রপাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে অনায়াসেই নিবৃত্ত হওয়ার যোগ্য।[৩৫] সুতরাং, দুঃখনিবৃত্তিতে সহজসাধ্য লৌকিক উপায় উপলব্ধ হওয়ায় সেগুলির গ্রহণ অধিক যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু সমস্যা এই যে, লৌকিক উপায়গুলিতে প্রকৃতপক্ষে দুঃখের ঐকান্তিক বা আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না। আধ্যাত্মিক প্রভৃতি দুঃখগুলি অনায়াসসাধ্য উপায়গুলির দ্বারা সাময়িক দূর হলেও সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্ত হয় না, সময়ের সাথে সাথে সেগুলির পুনরায় উৎপত্তি হয়। ফলত লৌকিক উপায়গুলি দুঃখসমূহের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তিতে ব্যর্থ।

লৌকিক উপায়গুলি সুকর হলেও সেগুলি দুঃখের সম্পূর্ণ নাশ করতে পারে না। তাই বৈদিক উপায়গুলির দিকে মানুষের প্রবৃত্তি হয়। বৈদিক উপায় যেমন জ্যোতিষ্টোমাদি যাগযজ্ঞ। বৈদিক যাগযজ্ঞগুলির একটি বিশেষ দিক এই যে এগুলি অহোরাত্র থেকে শুরু করে সংবৎসরকাল সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই, জন্ম-জন্মান্তরসাধ্য শাস্ত্রীয় বিষয়

বৈদিক উপায় ও সীমাবদ্ধতা

বিচারের তুলনায় উক্ত যাগযজ্ঞাদি অনেক সহজসাধ্য। এই জাতীয় যাগযজ্ঞগুলির ফলে ব্যক্তির স্বর্গলাভ হয়। স্বর্গ অর্থাৎ দুঃখবর্জিত যে সুখ। সুতরাং, বৈদিক উপায়গুলি দুঃখনিবৃত্তিতে অন্যতম সহায়ক। তবে দুঃখনিবৃত্তি বলতে দুঃখবর্জিত সুখ নয়, বুঝতে হবে দুঃখের আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক নিবৃত্তি আর দুঃখের ঐরূপ আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক নিবৃত্তিতে বৈদিক উপায়গুলি স্বাভাবিকভাবেই অক্ষম কারণ তারা অবিশুদ্ধি, ক্ষয় ও অতিশয়বিশিষ্ট।[৩৬] সোমাদিযাগে যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় পশু ও বীজাদির বধ করা হয়ে থাকে। যজ্ঞকার্যে একদিকে যেমন পুণ্য উৎপন্ন হয় তেমনই পশুবধজনিত হিংসার ফলে দুঃখও উৎপন্ন হয়। ফলত যাগাদি উপায়সমূহ অবিশুদ্ধি আক্রান্ত। অন্যদিকে যাগাদির ফলস্বরূপ যে স্বর্গাদি তাও ক্ষয় ও অতিশয় যুক্ত। স্বর্গপ্রভৃতি যজ্ঞাদি হতে উৎপন্ন হওয়ায় তা কার্যবস্তু। ঘটাদি কার্যবস্তু যেমন বিনাশপ্রাপ্ত হয় তেমনই স্বর্গাদিরও ক্ষয়প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। এমনকি যাগাদির ফলের তারতম্য লক্ষ্য করার বিষয়। জ্যোতিষ্টোমাদি যাগে স্বর্গলাভ হয় কিন্তু বাজপেয়াদি যাগে স্বর্গাধিপত্য লাভ হয়। এইভাবে দুটি যাগের ফলের তারতম্য অতিশয়তা নির্দেশ করে। বৈদিক উপায়গুলির এইরূপ সীমাবদ্ধতা প্রাচীন সাংখ্যাচার্য পঞ্চশিখও স্বীকার করেছেন।[৩৭] সুতরাং দুঃখের আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক নিবৃত্তিতে বৈদিক উপায়সমূহ পাথেয় হতে পারে না।

অতএব, উপায় লৌকিক হোক বা বৈদিক; দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য এগুলি অনায়াস-সাধ্য হলেও কোনওভাবেই প্রশস্ত নয়। তাই এই উপায়দ্বয়ের বিপরীত শ্রেষ্ঠ উপায়ের নিদান দেওয়া হচ্ছে 'ব্যক্ত-অব্যক্ত-জ্ঞ' এর বিজ্ঞানরূপে[৩৮] বা 'সত্ত্বপুরুষান্যতাপ্রত্যয়' রূপে।[৩৯] সত্ত্ব অর্থাৎ প্রকৃতি, অন্যতাপ্রত্যয় অর্থাৎ ভিন্নরূপে জ্ঞান। অতএব প্রকৃতি ও পুরুষের

পৃথক্‌রূপে জ্ঞানের মধ্যে দিয়েই দুঃখের সর্বাত্মক নিবৃত্তি সম্ভব। কিন্তু প্রকৃতি ও পুরুষের ভিন্নরূপে জ্ঞান তখনই সম্ভব যখন 'ব্যক্ত' অর্থাৎ মহদাদি, 'অব্যক্ত' অর্থাৎ প্রকৃতি এবং 'জ্ঞ' অর্থাৎ পুরুষ এর যথার্থ ধারণা একজন ব্যক্তির থাকে। সেকারণেই উপায় হল- শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণ হতে 'ব্যক্ত', 'অব্যক্ত' এবং 'জ্ঞ' সম্পর্কে পৃথক্‌ভাবে শ্রবণ করে, সাংখ্যশাস্ত্র-প্রতিপাদিত যুক্তির দ্বারা শ্রুত বিষয়ের উপযুক্ত মনন করে, দীর্ঘকাল অবিচ্ছিন্নভাবে শ্রদ্ধাপূর্বক নিদিধ্যাসন করলে 'সত্ত্বপুরুষান্যতাপ্রত্যয়' অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকজ্ঞান হয়।[৪০] সাংখ্যসম্মত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের মহিমা প্রকাশ করে লৌকিক আভাণকে বলা হয়েছে *পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞো যত্র কুত্রাশ্রমে বসেত্/ জটী মুণ্ডী শিখী বাপি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ*[৪১] অর্থাৎ সন্ন্যাসী, গৃহী, বাণপ্রস্থী যেই হোক না কেন পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সম্যক্ জ্ঞানে অবশ্যই মুক্তি লাভ করেন। সুতরাং, তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমে প্রকৃতি ও পুরুষের ভিন্নরূপে জ্ঞানই দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তিতে যথার্থ ও প্রশস্ত উপায়।

তত্ত্বজ্ঞান ও প্রশস্ততা

২.৪.৫. তত্ত্ব-উদ্দেশ

তত্ত্বজ্ঞান কষ্টসাধ্য তথা দুষ্কর হলেও, দুঃখনিবৃত্তিতে একমাত্র প্রশস্ত উপায়। তবে তত্ত্বজ্ঞানের পূর্বে 'তত্ত্ব'গুলির নির্দেশ করণীয়। *সাংখ্যকারিকায়* শ্রীমদ্ ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যের মূল পঁচিশটি তত্ত্বকে উদ্দেশ করেছেন প্রধান চারটি ভাগে। যথা- প্রকৃতি, প্রকৃতি-বিকৃতি, বিকৃতি এবং অনুভয় অর্থাৎ যা প্রকৃতিও নয়, বিকৃতিও নয়।

মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্নবিকৃতিঃ পুরুষঃ।।[৪২]

প্রথম ভাগ প্রকৃতি। অর্থাৎ মূলপ্রকৃতি, যা সংখ্যায় একটি। *প্রকরোতীতি প্রকৃতি* অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে যা কার্যসকলকে উৎপন্ন করে তাই হল প্রকৃতি। এর দ্বারা প্রকৃতির কর্তৃত্বই নির্দেশিত হয়। বস্তুত যেটি সমস্ত কার্যবস্তুর মূল কারণ, যার আর কোনও কারণ হয় না তাই হল মূলপ্রকৃতি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থারূপ মূলপ্রকৃতির অন্য কারণ অনুসন্ধান করা চলে না, নচেৎ অনবস্থা দোষ হয়। দ্বিতীয় ভাগ প্রকৃতি-বিকৃতি। প্রকৃতি অর্থাৎ কারণ এবং বিকৃতি অর্থাৎ কার্য। অতএব যেগুলি একাধারে কারণ ও কার্য দুইই। এরা সংখ্যায় সাতটি। যথা- মহৎ, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র [শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ]। মহৎতত্ত্ব প্রকৃতির কার্য এবং অহংকারের কারণ। অহংকার মহৎতত্ত্বের কার্য এবং পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়ের কারণ। আবার পঞ্চতন্মাত্র অহংকারের কার্য এবং পঞ্চমহাভূতের কারণ। সুতরাং মহদাদি সাতটি এইভাবে কারণ ও কার্যরূপে প্রতীত হওয়ায় প্রকৃতিও হয় আবার বিকৃতিও হয়। তৃতীয় ভাগ বিকৃতি। অর্থাৎ যেগুলি কেবলমাত্র বিকার বা কার্যবস্তু। এরা সংখ্যায় ষোলোটি। যথা- পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় [চক্ষুঃ-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক্], পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় [বাক্-পাণি-পাদ-পায়ু-উপস্থ], অন্তরিন্দ্রিয় মন, এবং পঞ্চমহাভূত [ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম]। উক্ত একাদশ ইন্দ্রিয় কেবলমাত্র অহংকারের কার্য এবং পঞ্চমহাভূত কেবলমাত্র পঞ্চতন্মাত্রের কার্য। এই ষোলোটি কোনও বিষয়ের প্রতি কারণ হয় না। চতুর্থ ভাগ অনুভয় অর্থাৎ যা প্রকৃতিও নয়, বিকৃতিও নয়। স্পষ্ট করে বললে, যেটি কারণও নয় আবার কার্যও নয়। এই তত্ত্বটির নাম পুরুষ, যা সংখ্যায় এক। এই পুরুষ কোনও তত্ত্বান্তরের প্রতি যেমন কারণ হয় না তেমনই তত্ত্বান্তরের কার্যরূপেও প্রতীত হয় না।

একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টি দেখানো যেতে পারে-

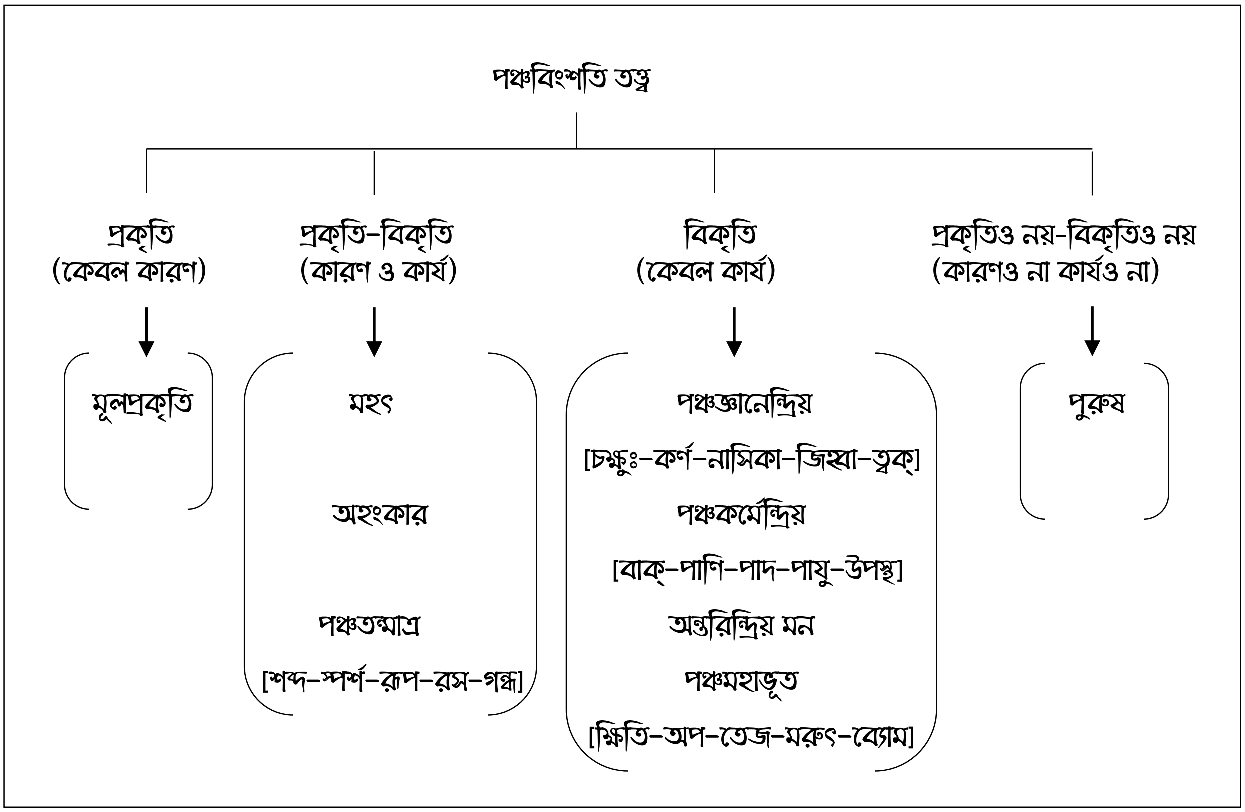

২.৪.৬. প্রমাণ (উদ্দেশ-লক্ষণ-পরীক্ষা)

দুঃখনিবৃত্তির উপায়স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞানের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য কিন্তু বিবেচক ব্যক্তি শুধুমাত্র আবশ্যকতার বিচারে কোনও বিষয় গ্রহণ করেন না। অতএব বিষয়ের প্রামাণ্য স্বীকার অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সেজন্য পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের যথার্থোপলব্ধির জন্য সামান্য ও বিশেষভাবে সাংখ্যসম্মত প্রমাণজ্ঞান আবশ্যক। বস্তুত ব্যাকরণকে পদশাস্ত্র, মীমাংসাকে বাক্যশাস্ত্র, ন্যায়-বৈশেষিককে প্রমাণশাস্ত্র এবং সাংখ্য-যোগ-বেদান্তকে প্রমেয়শাস্ত্র বলা হয়ে থাকে। তাই আপত্তি হতে পারে প্রমেয়শাস্ত্ররূপ সাংখ্যে প্রমাণ নিরূপণের কী প্রয়োজন? উত্তরে বলতে হয়, *প্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাদ্ধি* অর্থাৎ প্রমাণের নিরূপণ হলেই প্রমেয়ের সিদ্ধি হয়। অতএব, প্রমাণ নিরূপণ অবশ্যকর্তব্য।

প্রমাণ শব্দটির নির্বচনই প্রমাণের লক্ষণরূপে অভিপ্রেত। প্র-√মা ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয়ে ‘প্রমাণ’ পদটি সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের যেটি অসাধারণ কারণ সেটিই হল প্রমাণ। শাস্ত্রীয় পরিভাষায় বলা যেতে পারে অসন্দিগ্ধ

প্রমাণ-উদ্দেশ

অর্থাৎ যে বিষয়ে সন্দেহ নেই, অবিপরীত অর্থাৎ যথাযথ এবং অনধিগত অর্থাৎ যা পূর্বে জ্ঞাত হয়নি, এরূপ চিত্তবৃত্তিকে প্রমাণ বলে।[৪৩] সাংখ্যমতানুসারে সকল প্রমাণই চিত্তবৃত্তিরূপ। চিত্তবৃত্তি কী? প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির প্রথম পরিণাম হল ‘চিত্ত’ যাকে বুদ্ধি, মহৎতত্ত্ব, অন্তঃকরণ ইত্যাদিও বলা হয়ে থাকে। প্রদীপ যেমন নিজের স্থানে থেকেও স্থানান্তরের পদার্থ বা বিষয়ের সাথে সম্বন্ধিত হয়, তেমনই চিত্ত দেহস্থিত হয়েও

দেহমধ্যস্থ বা দেহবহির্ভূত পদার্থের বা বিষয়ের সাথে সম্বন্ধিত হয়। ফলত বিষয়ের সাথে চিত্তের এই যে সম্বন্ধ অর্থাৎ চিত্তের বিষয়াকার পরিণাম, তাকেই চিত্তবৃত্তি বলে। অতএব, সাংখ্যমতে চিত্তবৃত্তি = জ্ঞান।

প্রমাণত্রয়

শ্রীমদ্ ঈশ্বরকৃষ্ণ কারিকায় তিনটি প্রমাণের উল্লেখ করেছেন– দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আপ্তবচন বা শব্দ।[৪৪] অপরাপর আস্তিক ও নাস্তিক দর্শনগুলিতে এই সংখ্যার কিছুটা তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। চার্বাক দর্শনে শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ, বৌদ্ধ ও বৈশেষিক দর্শনে প্রত্যক্ষ তথা অনুমান, যোগদর্শনে প্রত্যক্ষ–অনুমান–শব্দ, ন্যায়দর্শনে প্রত্যক্ষ–অনুমান–উপমান–শব্দ, প্রভাকরমতে প্রত্যক্ষ–অনুমান–উপমান–শব্দ–অর্থাপত্তি, বেদান্তদর্শনে প্রত্যক্ষ–অনুমান–উপমান–শব্দ–অর্থাপত্তি–অনুপলব্ধি, পৌরাণিকমতে প্রত্যক্ষ–অনুমান–উপমান–শব্দ–অর্থাপত্তি–অনুপলব্ধি–সম্ভব–ঐতিহ্য স্বীকৃত হয়েছে। তবে সাংখ্যের জ্ঞেয়বস্তুর অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের যথার্থ উপলব্ধির জন্য সাংখ্যসম্মত উক্ত ত্রিবিধ প্রমাণই (দৃষ্ট–অনুমান–আপ্তবচন) অবলম্বনীয়।

প্রত্যক্ষ–লক্ষণ

সাংখ্যমতে সকল প্রমাণই চিত্তবৃত্তিরূপ, তবে তাদের মধ্যে বিশেষত্ব আছে। নতুবা প্রমাণের ত্রৈবিধ্যের যৌক্তিকতা কোথায়? তাই কারিকাকার প্রত্যক্ষের লক্ষণে বলেছেন, *প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টং*...। 'দৃষ্টম্' পদটি লক্ষ্যনির্দেশক এবং 'প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ো' পদটি লক্ষণসূচক। বিষয় অর্থাৎ যা নিজ আকারের দ্বারা চিত্তবৃত্তিকে আকারিত করে এবং প্রত্যক্ষের যোগ্য করে তোলে। যেমন ঘট,পট প্রভৃতি বাহ্যবিষয়, সুখ–দুঃখাদি আন্তরবিষয়। এখন এই এক একটি বিষয়ের প্রতি যার বৃত্তি (সম্বন্ধ) অর্থাৎ প্রতিটি বিষয়ের সাথে যার সম্বন্ধ বা সন্নিকর্ষ হয়, তাই হল প্রতিবিষয় বা ইন্দ্রিয়। এবং এইরূপ প্রতিবিষয়ে বা ইন্দ্রিয়ে যে অধ্যবসায় হয় অর্থাৎ সেই সেই ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ে বুদ্ধির যে পরিণাম বা জ্ঞান হয়, তাই হল দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ। প্রকৃতপক্ষে বিষয়ের সাথে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধে ইন্দ্রিয় বিষয়াকারে পরিণত হয়। এখন ইন্দ্রিয় বিষয়াকারে পরিণত হলেই অন্তঃকরণ বিষয়াকার ধারণ করতে পারে। ফলে বিষয়াকারে পরিণত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে অন্তঃকরণবৃত্তি বা জ্ঞান হয় তাকে অধ্যবসায় বলে। অতএব, অধ্যবসায় = জ্ঞান = অন্তঃকরণবৃত্তি। উক্ত লক্ষণে 'অধ্যবসায' পদের দ্বারা 'সংশয' নিরস্ত হয়। সংশয হল অনিশ্চিত, উভয়দিকে ধাবমান। অন্যদিকে অধ্যবসায হল নিশ্চিত। 'বিষয' পদের দ্বারা বিপর্যয় বা ভ্রম জ্ঞান নিরস্ত হয় এবং 'প্রতি' পদের দ্বারা ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগ বোঝানোয় অনুমান, স্মৃতি ইত্যাদির নিরাস হয়। সুতরাং, *প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টং* এটি প্রত্যক্ষপ্রমাণের নির্দোষ লক্ষণ।

অনুমান–লক্ষণ

অনুমানের লক্ষণে কারিকাকার বলেছেন, *ত্রিবিধমনুমানমাখ্যাতং তল্লিঙ্গলিঙ্গিপূর্বকম্* ...। 'অনুমানম্' পদটি লক্ষ্যনির্দেশক এবং 'লিঙ্গলিঙ্গিপূর্বকং' পদটি লক্ষণসূচক। লিঙ্গ শব্দের অর্থ *লিঙ্গ্যতে জ্ঞাযতে অপ্রত্যক্ষার্থঃ যেন* অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সাথে অসম্বন্ধিত পদার্থ জ্ঞাত হয় যার দ্বারা। লিঙ্গ (হেতু) প্রকৃতপক্ষে সেই ইন্দ্রিয়–অসন্নিকৃষ্ট পদার্থটিকে ব্যাপ্তির সাহায্যে জ্ঞাপন করে। সেকারণে লিঙ্গকে ব্যাপ্য বলে। এবং লিঙ্গের দ্বারা লিঙ্গীর (সাধ্য) জ্ঞান হয় বলে লিঙ্গী শব্দের অর্থ ব্যাপক। এখন এই ব্যাপ্য–ব্যাপকভাবজ্ঞান ও ব্যাপ্যের পক্ষধর্মতাজ্ঞান থেকে যে বুদ্ধিবৃত্তি হয়, তাই হল অনুমান। ব্যাপ্য–ব্যাপকভাব অর্থাৎ ব্যাপ্য ও ব্যাপকের মধ্যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি। যেমন, ধূমের সাথে বহ্নির স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকায় ধূম ব্যাপ্য এবং বহ্নি ব্যাপক। সেইসাথে ধূম যেখানে থাকে বহ্নিও সেখানে থাকে এই স্বভাবসম্বন্ধের জ্ঞানই ব্যাপ্য–ব্যাপকভাবজ্ঞান। অন্যদিকে পক্ষই (যে আধারে সাধ্যের অনুমিতি হয়) হেতুর

অধিকরণ অর্থাৎ ব্যাপ্যরূপে জ্ঞায়মান বস্তুটি পক্ষে আছে, এই জ্ঞান হল পক্ষধর্মতা জ্ঞান। যেমন বহ্নির ব্যাপ্য ধূম পক্ষে বা পর্বতে আছে এটি পক্ষধর্মতা জ্ঞান। ব্যাপ্য–ব্যাপকভাব ও পক্ষধর্মতাজ্ঞান থেকেই অনুমান সম্ভব হয়।

সাংখ্যকারিকাকার সামান্যরূপে লক্ষিত অনুমানের তিনটি প্রকার স্বীকার করেছেন এবং কারিকাকারের ঐ অভিমত ন্যায়দর্শনানুসারী বলে *তত্ত্বকৌমুদী*কার বাচস্পতি মিশ্র মনে করেছেন।[৪৫] ত্রিবিধ অনুমান যথা– পূর্ববত্, সামান্যতোদৃষ্ট ও

অনুমানত্রয়

শেষবত্। যদিও প্রাথমিকরূপে এদের দুটি ভাগে ভাগ করা হয়– বীত ও অবীত অনুমান। যে অনুমান হেতু ও সাধ্যের অর্থাৎ ব্যাপ্য–ব্যাপকের অন্বয়সহচারের মাধ্যমে ভাবরূপে সাধ্যের সাধন করে, তা হল বীত অনুমান। অন্যদিকে যে অনুমান হেতু ও সাধ্যের অর্থাৎ ব্যাপ্য–ব্যাপকের ব্যতিরেকসহচারের মাধ্যমে অভাবরূপে সাধ্যের সাধন করে, তা হল অবীত অনুমান। বীত অনুমান দুই প্রকার– পূর্ববত্ ও সামান্যতোদৃষ্ট। পূর্ববত্ অর্থাৎ পূর্ববিষয়ক। পূর্ব শব্দের অর্থ প্রসিদ্ধ। অতএব যে অনুমানে সাধ্যটি প্রসিদ্ধ অর্থাৎ হেতু ও

পূর্ববত্

সাধ্যের সহচারদর্শনবশত সাধ্যটি পূর্বজ্ঞাত, সেই অনুমানই পূর্ববত্। যেমন পর্বতে বহ্নির অনুমানের ক্ষেত্রে পূর্বে মহানসাদিতে ধূম–বহ্নির সাহচর্যদর্শনে বহ্নির জ্ঞান হয়ে থাকে। এইরূপ অনুমান হল পূর্ববত্ অনুমান। অপরটি সামান্যতোদৃষ্ট। দৃষ্ট শব্দের অর্থ দর্শন। ষষ্ঠী বিভক্ত্যর্থক ‘তসি’ প্রত্যয়ান্ত ‘সামান্যতঃ’ শব্দের অর্থ সামান্যের। সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান আসলে পূর্ববত্ অনুমানের বিপরীত। এই অনুমানে সাধ্যটি পূর্বদৃষ্ট হয় না তবে

সামান্যতোদৃষ্ট

তজ্জাতীয় যাবতীয় বস্তুর ব্যাপ্য–ব্যাপকভাব ও পক্ষধর্মতাজ্ঞান হতে অনুমান জন্মায়। যেমন– রূপাদিজ্ঞানের করণরূপে ইন্দ্রিয় সিদ্ধ হয়। তবে এই ইন্দ্রিয় সাধক অনুমানের পূর্বে কোনও বিশেষ ইন্দ্রিয় দৃষ্ট হয় না। অর্থাৎ সাধ্যটি ঠিক যেরূপ সেইরূপ বস্তু পূর্বে দৃষ্ট হয় না। অবীত অনুমানকে শেষবত্ বা শেষানুমান বা পরিশেষানুমানও বলা হয়ে থাকে। যে পদার্থটি সবদিক থেকে অবশিষ্ট থাকে তাকে বলে শেষ বা পরিশেষ। এবং এরূপ

শেষবত্

পদার্থ যে অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয় তা হল পরিশেষানুমান। একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়। শব্দ, যা শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য হয়, তা কোন পদার্থের অন্তর্গত? অর্থাৎ দ্রব্য–গুণ–কর্ম–সামান্য–বিশেষ–সমবায়–অভাব এই (বৈশেষিক সম্মত) সপ্তপদার্থের কোনটির মধ্যে শব্দের অন্তর্ভুক্তি হবে? শব্দ হল সৎ ও অনিত্য। যেহেতু সৎ অতএব অভাব পদার্থ নয় এবং যেহেতু অনিত্য সেহেতু সামান্য বা বিশেষ বা সমবায়ও নয়। এখন দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই সবকটি সৎ এবং অনিত্য। কিন্তু শব্দ দ্রব্য নয় যেহেতু অনিত্য দ্রব্য একটি দ্রব্যে সমবেত হয় না। অথচ শব্দ আকাশে সমবেত। শব্দ কর্মও নয় যেহেতু কর্ম কর্মান্তরের জন্ম দেয় না। অথচ শব্দ শব্দান্তরের জন্ম দেয়। উক্তরূপে সবকটি পদার্থে শব্দের নিষেধ হওয়ায় পরিশেষ বা শেষবত্ থাকে গুণ। এবং এই গুণেই শব্দের অন্তর্ভুক্তি হয় পরিশেষানুমানের দ্বারা।

শব্দপ্রমাণের লক্ষণে কারিকাকার বলেছেন *আপ্তশ্রুতিরাপ্তবচনং তু*। ‘আপ্তবচনম্’ পদটি লক্ষ্যসূচক এবং ‘আপ্তশ্রুতি’ পদটি

শব্দ–লক্ষণ

লক্ষণনির্দেশক। ‘আপ্ত’ কথার অর্থ প্রাপ্ত বা যোগ্যতাবিশিষ্ট। বলা চলে অবাধিতত্ব। ‘শ্রুতি’ শব্দে আপাতভাবে শ্রবণক্রিয়া বা বেদশাস্ত্রকে বোঝালেও, এখানে বাক্যজনিত বাক্যার্থজ্ঞানকেই বুঝতে হবে।[৪৬] অতএব, বাক্যজনিত বাক্যার্থজ্ঞান, যা কিনা অবাধিত, সর্বপ্রকার দোষাশঙ্কা বিনির্মুক্ত, তাই হল শব্দপ্রমাণ।

প্রমাণ–পরীক্ষা

প্রমাণের সামান্য ও বিশেষ লক্ষণ লক্ষিত করা হলেও প্রমাণের সংখ্যা নিয়ে বিবিধতার প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিন প্রমাণের মধ্যে অন্যান্য প্রমাণগুলির অন্তর্ভুক্তি সাংখ্যাচার্যরা স্বীকার করেছেন। নৈয়ায়িকরা উপমানকে পৃথক্ প্রমাণরূপে স্বীকার করলেও সাংখ্যের দৃষ্টিতে উপমান আদতে অনুমান বা শব্দপ্রমাণেরই অন্তর্ভুক্ত। কারণ, যে ব্যক্তি কোনওদিন 'গবয়' দেখেনি, তাকে যখন বোঝানোর জন্য বলা হচ্ছে 'যথা গোঃ তথা গবয়ঃ' অর্থাৎ 'গবয়' হল গোসদৃশ একটি পশু তখন যিনি বলছেন তিনি যদি আপ্ত বা যথার্থবাদী হন, তাহলে সেই বাক্যজনিত জ্ঞানকে শব্দপ্রমাণ বললেই হয়ে যায়। আর যদি 'যথা গোঃ তথা গবয়ঃ' ইত্যাদির দ্বারা 'গবয় শব্দ গোসদৃশের বাচক' এরূপ জ্ঞান হয়, তাহলেও সেটি অনুমানেরই অন্তর্ভুক্ত কারণ 'গবয়' শব্দের প্রয়োগ গোসাদৃশ্যেই এবং সেইস্থলে 'গবয় শব্দ গোসদৃশের বাচক' এরূপ জ্ঞান অনুমান। মীমাংসকেরা অর্থাপত্তিকে পৃথক্ প্রমাণরূপে স্বীকার করেন। তবে সাংখ্যের যুক্তিতে উক্ত অর্থাপত্তিও অনুমানের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, 'জীবী চৈত্রঃ গৃহে নাস্তি' অর্থাৎ জীবিত চৈত্র গৃহে নেই এরূপ অবস্থায় চৈত্রের বাইরে অস্তিত্বের যে কল্পনা তাই অর্থাপত্তি। কিন্তু এরূপ অর্থাপত্তি স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা নেই কারণ, চৈত্র জীবিত একথা জ্ঞাত। এখন বর্তমান স্থলে (গৃহে) তার নাস্তিত্ব যেমন অন্যত্র অস্তিত্ব সূচিত করে, তেমনই অন্যত্র অস্তিত্ব তার বর্তমান স্থলে (গৃহে) নাস্তিত্বকে দ্যোতিত করে। অতএব, এরূপে ব্যাপ্তির নিশ্চয় হওয়ায় অনুমান প্রমাণের দ্বারাই চৈত্রের অন্যত্র অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়ে যায়। ভাট্টমীমাংসক ও বেদান্তীরা অনুপলব্ধিকেও পৃথক্ প্রমাণরূপে স্বীকার করেন। ভূতলে ঘটের অভাবের জ্ঞানের প্রতি অনুপলব্ধিকে তারা প্রমাণ বলে মনে করেন। যদিও সাংখ্যাচার্যদের যুক্তিতে অনুপলব্ধি প্রমাণ স্বীকারের কোনও যৌক্তিকতাই নেই কারণ ভূতলের সাথে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হওয়ায় তদাকার বৃত্তির দ্বারাই ভূতলে ঘটের অভাবেরও জ্ঞান হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাই কার্যসিদ্ধি হয়ে যায়। এমনকি সাংখ্যাচার্যরা ঘটাভাবকে পৃথক্ প্রমেয় রূপে স্বীকৃতি দিতে অপারগ যেহেতু ঘটাভাব অতিরিক্ত পদার্থ হলে তার সাথে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ ও তদাকার অন্তঃকরণবৃত্তি স্বীকৃতির প্রয়োজন পড়ে। অতএব ঘটাভাব যেহেতু ভূতলাভিন্ন অর্থাৎ ভূতল ব্যতিরেকে নয়, তাই অনুপলব্ধির প্রয়োজনীয়তা প্রশ্নের দাবি রাখে। সম্ভব নামে একটি পৃথক্ প্রমাণ বেদান্তীরা স্বীকার করেন। কিন্তু সাংখ্যের যুক্তিতে এটি অনুমানেরই অন্তর্ভুক্ত। কারণ, 'খার্যাং দ্রোণাঢকপ্রস্থাদ্যবগমঃ' অর্থাৎ 'খারীতে দ্রোণ, আঢ়ক, প্রস্থ ইত্যাদি পরিমাণের জ্ঞান' এই স্থলে খারী, দ্রোণ, আঢ়ক এগুলি সবই পরিমাণের বিভিন্ন একক। তাই দ্রোণ, আঢ়ক ইত্যাদি খারীতেই আছে, তা অনুমানের দ্বারাই বোধগম্য হয়। যেমন, কিলোমিটার, মিটার, সেন্টিমিটার, মিলিমিটার এগুলি সবই পরিমাণের একক কিন্তু কিলোমিটার বৃহৎ একক এবং মিলিমিটার ক্ষুদ্র একক। ফলত কিলোমিটারের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই মিলিমিটারের অনুমান হয়ে যায়। তেমনই, খারী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ একক হওয়ায় দ্রোণ, আঢ়ক ইত্যাদির অন্তর্ভুক্তি খারীর মধ্যে অনুমান করা চলে। অতএব পৃথক্‌রূপে সম্ভব প্রমাণ স্বীকারের যৌক্তিকতা নেই। ঐতিহ্য নামক অপর একটি প্রমাণ পৌরাণিকরা স্বীকার করে থাকেন, যা মূলত পরম্পরা প্রবাদমাত্র। 'ইহ বটে যক্ষঃ প্রতিবসতি' এরূপ পরম্পরাক্রমে চলে আসা বাক্যই ঐতিহ্য। কিন্তু, সাংখ্যের যুক্তিতে ঐ বাক্যের বক্তা যদি সুনিশ্চিত থাকে অর্থাৎ আপ্ত হন, তাহলে বাক্যার্থজ্ঞানজন্য শব্দ প্রমাণ স্বীকার করে নিলেই হয়ে যায়। অন্যথা, বক্তার আপ্তত্ব বিষয়ে সংশয় থাকলে ঐতিহ্যকে প্রমাণরূপে অভিহিত করাতেই যৌক্তিকতার প্রশ্ন এসে যায়। অতএব, সাংখ্য মতানুসারে প্রমাণ তিনটি। প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ।

সাংখ্যশাস্ত্রে প্রমেয়রূপে ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং জ্ঞ (অর্থাৎ পুরুষ) স্বীকৃত এবং প্রমেয়সিদ্ধি প্রমাণের দ্বারাই সম্ভব বলে তিনটি প্রমাণও নিরূপিত। এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রমাণগুলির বিষয়বিন্যাসের জিজ্ঞাসা হয় অর্থাৎ কোন প্রমাণের দ্বারা কীরূপ প্রমেয়

প্রমাণিত হয়? সাধারণত, বিষয় দুই প্রকারের– ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয়। এর মধ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যেগুলি অর্থাৎ পৃথিবী, তেজ, জল প্রভৃতি স্থূলতত্ত্বগুলি প্রত্যক্ষ প্রমাণের এবং ধূমাদি দর্শনের দ্বারা বহ্নিপ্রভৃতির জ্ঞান পূর্ববত্ অনুমান প্রমাণের বিষয় হয়।

প্রমাণ-বিষয়বিন্যাস

অন্যদিকে, প্রধান, পুরুষ ইত্যাদি অতীন্দ্রিয় পদার্থগুলি সামান্যতোদৃষ্ট ও শেষবত্ অনুমান প্রমাণের বিষয় হয়। এবং যেসকল অতীন্দ্রিয় পদার্থ উক্ত অনুমানের বিষয় হয় না, যেমন মহদাদির সৃষ্টিক্রম, স্বর্গ, অপূর্ব প্রভৃতি; সেইগুলি শব্দপ্রমাণের বিষয় হয়। *মহতঃ পরম্ অব্যক্তম্, মনসশ্চ পরা বুদ্ধিঃ* ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা মহদাদির সৃষ্টিক্রম এবং *স্বর্গকামঃ অশ্বমেধেন যজেত্* ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা স্বর্গের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। অতএব, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয় উভয় প্রকার পদার্থ সাংখ্যোক্ত ত্রিবিধ প্রমাণের বিষয় হয়।

২.৪.৭. প্রধান-সিদ্ধি

আকাশকুসুম, কূর্মরোম, শশবিষাণ, বন্ধ্যাপুত্র এগুলি প্রত্যক্ষ হয় না, কারণ এগুলি অলীক। অর্থাৎ অভাবত্বই এদের অপ্রত্যক্ষতার কারণ। এই একই যুক্তিতে প্রধানাদির অপ্রত্যক্ষতার প্রতি সেগুলির অভাবত্বকে কারণরূপে আপত্তি করা যেতে পারে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অভাবত্ব প্রধানাদির অপ্রত্যক্ষতার কারণ নয়। প্রত্যক্ষের বাধক দোষই প্রধানাদির অপ্রত্যক্ষতার কারণ। সাংখ্যকারিকাকার এরূপ আটটি দোষের উল্লেখ করেছেন– অতিদূরত্ব, অতিসামীপ্য, ইন্দ্রিয়ঘাত, অন্যমনস্কতা,

প্রধানাদির অপ্রত্যক্ষতা

সূক্ষ্মতা, ব্যবধান, অভিভব এবং সমানাভিহার।[৪৭] 'অতিদূরত্ব'– আকাশে অনেক উপরে থাকা উড্ডীয়মান পক্ষী অতিদূরত্ববশত উপলব্ধির বিষয় হয় না। 'অতিসামীপ্য'– চোখের কাজল খুব নিকটে অবস্থিত হওয়ায় একইভাবে প্রত্যক্ষের বা উপলব্ধির বিষয় হয় না। 'ইন্দ্রিয়ঘাত'– ইন্দ্রিয়ঘাত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ধ্বংসে অন্ধত্ব বা বধিরত্ববশত রূপ বা শব্দ উপলব্ধির বিষয় হয় না। 'অন্যমনস্কতা'– মনের অনবস্থানবশত ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের সংযোগ হলেও তা উপলব্ধির বিষয় হয় না। 'সূক্ষ্মতা'– সূক্ষ্মতাবশত (নিরবয়বদ্রব্যত্ববশত) অণু পরমাণু ইন্দ্রিয় সংযুক্ত হয়েও উপলব্ধির বিষয় হয় না। 'ব্যবধান'– গৃহমধ্যস্থ পদার্থ দেওয়াল বা বস্ত্রের দ্বারা আবৃত হলে ব্যবধানবশত উপলব্ধির বিষয় হয় না। 'অভিভব'– দিবসে সূর্যালোকের অভিভববশত অর্থাৎ প্রভাবকশত অন্য গ্রহ-নক্ষত্রমণ্ডলীর উপলব্ধি হয় না। 'সমানাভিহার'– মেঘের জল জলাশয়ে পতিত হলে একই জাতীয় বস্তুর মিশ্রণে দুটির পৃথক্ উপলব্ধি হয় না। এই আটটি দোষ ছাড়াও অপর একটি দোষের কথা বলা যায় যা হল 'অনুদ্ভব'। অর্থাৎ একটি পদার্থ যতক্ষণ আবির্ভূত না হয়, ততক্ষণ তা উপলব্ধির বিষয় হয় না। যেমন দুধ থেকে দধি হয়, কিন্তু দধির আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত দুধে দধির প্রত্যক্ষ হয় না। অতএব, প্রধানাদির অপ্রত্যক্ষতার কারণ অভাবত্ব বা অলীকত্ব নয় এবিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেলেও প্রশ্ন থেকে যায়, প্রধানাদির অপ্রত্যক্ষতার জন্য তাহলে কি উপরোক্ত সবকটি দোষই ভাগীদার? কারিকাকার উক্ত দোষগুলির মধ্যে 'সূক্ষ্মতা'কেই প্রধান বাধক বলে মনে করেছেন– *সৌক্ষ্ম্যাত্তদনুপলব্ধি...*। সূক্ষ্মতা বলতে সাধারণ অর্থে অতি ক্ষুদ্র পরিমাণকে বোঝায়। যেমন অণু, পরমাণু ইত্যাদি। কিন্তু আপত্তির জায়গা এই যে, প্রকৃতি বা পুরুষ তো অণু পরমাণুর মত সূক্ষ্ম নয়, তা সর্বব্যাপী, বিভু। স্বাভাবিকভাবেই, সর্বব্যাপী পদার্থকে অতিক্ষুদ্র বলা আপত্তিজনক। তাই সূক্ষ্মতা বলতে 'নিরবয়বদ্রব্যত্ব'ই বুঝতে হবে কারণ, প্রকৃতি মহৎপরিমাণ হলেও অবয়বহীন।

মোট কথা সূক্ষ্মতার কারণেই প্রকৃতির উপলব্ধি হয় না, কিন্তু প্রকৃতি আছে এবং প্রকৃতির অস্তিত্বের উপলব্ধি হয় তার কার্য থেকে -*কার্যতস্তদুপলব্ধিঃ*। মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি হচ্ছে সেই কার্য, যেগুলি একাধারে প্রকৃতির সরূপও আবার বিরূপও।[৪৮] অতএব

প্রধানের অস্তিত্ব

প্রকৃতি সকল জন্য বস্তুর বা কার্য বস্তুর কারণ– এই প্রতিজ্ঞা তখনই সিদ্ধ হয় যদি কারণে কার্যের সত্তা প্রমাণ করা যায়। অর্থাৎ সৎ কারণ থেকে সৎ কার্য উৎপন্ন হয়– একথা প্রতিস্থাপন করলেই মহদাদি কার্যবস্তুগুলির কারণরূপে প্রকৃতির অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।

সত্‌কার্যবাদ

অবশ্য, কার্যোৎপত্তিতে অন্যান্য মতবাদগুলিও এপ্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। বৌদ্ধমতে *অসতঃ সত্‌ জায়তে*– অসৎ বলতে বুঝতে হবে অভাব। অর্থাৎ অভাব থেকেই ভাব এর উৎপত্তি বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত। বীজ থেকে যে অঙ্কুরের উৎপত্তি সেখানে বীজের বিনাশরূপ অভাবকে কারণ স্বীকার করেন তাঁরা। বেদান্তমতে *একস্য সতো বিবর্তঃ, কার্যজাতং ন বস্তুসত্‌* অর্থাৎ সর্বপ্রকার ভেদবর্জিত ব্রহ্মই একমাত্র সৎ এবং তার কার্যবর্গ বিবর্ত (স্বরূপত অবিকৃত থেকে অন্য বস্তুরূপে প্রতীতি)। ন্যায়-বৈশেষিকমতে *সতঃ অসত্‌ জায়তে* অর্থাৎ সৎ কারণ (পরমাণু) হতে অসৎ কার্য (জগৎ) উৎপন্ন হয়। তবে সাংখ্যে সৎ কারণ হতে সৎ কার্যোৎপত্তি স্বীকৃত হয়েছে। উপাদান কারণ একেবারে বিজাতীয় কার্য উৎপাদনে অক্ষম বলেই তাঁরা মনে করেন–*সতঃ সত্‌ জায়তে ইতি বৃদ্ধাঃ*। অতএব, কারণ সৎ, কার্যও সৎ এবং উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণের মধ্যেই অবস্থান করে। সাংখ্যকারিকাকার পাঁচটি যুক্তি বা অনুকূল তর্কের সাহায্যে তা প্রতিপাদনে তৎপর হয়েছেন। যথা– ক) *অসদ্‌-অকরণাত্‌*, খ) *উপাদান-গ্রহণাত্‌*, গ) *সর্বসম্ভব-অভাবাত্‌*, ঘ) *শক্তস্য শক্যকরণাত্‌* এবং ঙ) *কারণভাবাত্‌*।[৪৯]

অসদ্‌-অকরণাত্‌

প্রথম যুক্তি *অসদ্‌-অকরণাত্‌*। যা অসৎ তা চিরদিনই অসৎ, তাকে কখনো সৎ করা যায় না এরূপ সাংখ্যের অভিমত। যদি ব্যাপারের পূর্বে কার্য যদি অসৎ হয়, তাহলে কোনও কিছুর দ্বারাই কার্যের সত্ত্ব স্বীকৃত হয় না। যেমনভাবে, নীলরূপে পীতরূপ অসৎ বলেই সহস্র শিল্পী প্রাণপাত পরিশ্রম করলেও নীলকে পীত করতে পারে না। তেমনই ঘট যদি উৎপত্তির পূর্বে মৃত্তিকাতে অসৎ হতো, তাহলে কেউ মৃত্তিকা থেকে ঘট নির্মাণ করতে পারতো না। উৎপত্তির পূর্বে কার্যের সত্তা স্বীকারে এরূপ আপত্তি হয় যে কার্য যদি কারণে বর্তমান থাকে তাহলে তার আবার 'উৎপত্তি' কী? এবিষয়ে সমাধান এই যে উৎপত্তি বলতে কোনও নতুন সৃষ্টি নয়, তা হল অভিব্যক্তি বা প্রকাশমাত্র।[৫০] যেমন, চাল ধানের মধ্যেই থাকে কেবল অবঘাতের (আঘাতের) দ্বারা তার উৎপত্তি বা প্রকাশ হয় মাত্র। কিংবা, তেল তিলের মধ্যেই অবস্থান করে কেবল পেষণের দ্বারা তার উৎপত্তি হয় মাত্র। অতএব, উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণে অবস্থান করে অর্থাৎ কারণ সৎ এবং কার্যও সৎ।

উপাদান-গ্রহণাত্‌

দ্বিতীয় যুক্তি *উপাদান-গ্রহণাত্‌*। উপাদান শব্দে কারণ এবং গ্রহণ শব্দে সম্বন্ধ বোঝায়। অর্থাৎ কার্যের সাথে সম্বন্ধিত কারণই কার্যের জনক হয়। সাংখ্যমতে ঐ সম্বন্ধ তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ কারণ সৎ কারণের সাথে সৎ কার্যেরই তাদাত্ম্যসম্বন্ধ হয়, সৎ কারণের সাথে অসৎ কার্যের কদাপি হয় না। তাই, কারণের সাথে কার্যের সম্বন্ধ স্বীকার না করে কারণ হতে কার্যোৎপত্তি বিচার করলে কারণ হতে কার্যের কোনও সুব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না। অর্থাৎ তন্তু হতে পট, মৃত্তিকা হতে ঘট, বীজ হতে অঙ্কুর প্রভৃতি যে প্রসিদ্ধ কার্যোৎপত্তি সেখানে যদি কারণ ও কার্যের মধ্যে সম্বন্ধ না থাকে তাহলে নির্দিষ্ট কারণ হতে নির্দিষ্ট কার্য উৎপন্ন হবে না। অর্থাৎ মৃত্তিকা থেকে ঘটের উৎপত্তি ছাড়াও পট, বীজ প্রভৃতিরও উৎপত্তি হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। তাই, কারণের সাথে কার্যের সম্বন্ধ স্বীকার করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে কার্যকে সৎ রূপেই স্বীকার করতে হবে।[৫১]

তৃতীয় যুক্তি *সর্বসম্ভব-অভাবাত্*। উপরিউক্ত যুক্তির অনুকূলে পুনরায় অপর একটি যুক্তির অবতারণা করা হচ্ছে। কারণের সাথে কার্যের সম্বন্ধ স্বীকার করলে একথা বলা যায় যে, নির্দিষ্ট কারণ হতে নির্দিষ্ট কার্যের উৎপত্তি হয়। কিন্তু এই সম্বন্ধের আপত্তি করলে অর্থাৎ কেউ যদি স্বীকার করেন কার্যের সাথে কোনও সম্বন্ধ নেই এমন কারণ কার্যের উৎপাদন করে; তাহলে সকল কারণ সকল কার্যের জনক হবে একথাও তাকে স্বীকার করতে হবে। অথচ দেখা যায় যে, সকল কারণ সকল কার্যের জনক হয় না। সেজন্য প্রাচীন সাংখ্যাচার্যরা সম্বন্ধ কারণ হতে সম্বন্ধ কার্যোৎপত্তি স্বীকার করেছেন।[৫২] অর্থাৎ কারণের সাথে কার্যের সম্বন্ধ অবশ্যই স্বীকার্য।

সর্বসম্ভব-অভাবাত্

চতুর্থ যুক্তি *শক্তস্য শক্যকরণাত্*। কারণের সাথে কার্যের সম্বন্ধ স্বীকার না করে কারণে কার্যজনক শক্তি স্বীকারের মধ্যে দিয়ে কারণে কার্যের অস্তিত্বে আপত্তি দেখা যায়। অর্থাৎ যে কারণে যে কার্যোৎপাদক শক্তি আছে সেই কারণ সেই কার্য উৎপাদন করে এরূপ পূর্বপক্ষী মনে করেন। কিন্তু এই যে শক্তির কথা বলা হল, তার আশ্রয় কোথায়? আশ্রয় ছাড়া শক্তি থাকতে পারে না। তাই ঐ শক্তির আশ্রয় রূপে কারণকে স্বীকার করতে হবে। যেমন মৃত্তিকা থেকে ঘট উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ মৃত্তিকাতে ঘটজনন শক্তি আছে। এখন মৃত্তিকাস্থিত এই ঘটজনন শক্তির সাথে ঘটের সম্বন্ধ স্বীকার করলে ঘটকে কোনওভাবেই অসৎ বলা যায় না কারণ ঘট অসৎ হলে শক্তির সাথে কীরূপে সম্বন্ধিত হবে? শক্তিযুক্ত কারণ শক্তিসম্বন্ধিত কার্যকেই উৎপন্ন করে। তাই সম্বন্ধের অনুরোধে কার্য সৎ একথা স্বীকার্য।

শক্তস্য শক্যকরণাত্

পঞ্চম যুক্তি *কারণভাবাত্*। কারণভাব বলতে বোঝায় কারণাত্মক অর্থাৎ কারণ হতে অভিন্ন। সাধারণত কারণ হতে কার্যকে আলাদাভাবে দেখা যায় না। মৃত্তিকাকে ছেড়ে ঘটের কিংবা তন্তুকে ছেড়ে পটের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না। সুতরাং, কার্য কারণাত্মক বা কারণ হতে অভিন্ন। ফলত কার্য যদি কারণ হতে আলাদা না হয় তাহলে কারণ সৎ হলে কার্যও সৎ একথা স্বীকার করতে হবে।

কারণভাবাত্

এইভাবে সৎকার্যবাদের সিদ্ধিতে প্রধান-সিদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়।

অব্যক্ত অর্থাৎ মূলপ্রকৃতি এবং ব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি হতে সৃষ্ট মহদাদি স্থূলভূত পর্যন্ত ২৩টি পদার্থ। সৎকার্যবাদ উপস্থাপনের দ্বারা প্রধান-সিদ্ধির পথ প্রশস্ত হয় একথা নিশ্চিত, তবে সেই প্রধান কীরূপ? এই প্রসঙ্গে ব্যক্ত-অব্যক্তের বৈধর্ম্য ও সাধর্ম্য আলোচনা করা হচ্ছে। কারিকাকার প্রায় নয় (৯) রকম ভাবে এই বৈধর্ম্য প্রদর্শন করেছেন।[৫৩] প্রথমত, ব্যক্তপদার্থগুলি হেতুমৎ অর্থাৎ কারণবিশিষ্ট। এরা প্রত্যেকেই কোনও না কোনও কারণ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু অব্যক্ত বা মূলপ্রকৃতির কোনও কারণ হয় না। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তপদার্থগুলি অনিত্য বা তিরোভাবী অর্থাৎ এই পদার্থগুলি স্ব স্ব কারণে তিরোভূত হয় বা সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে। সোজা কথায় এদের আবির্ভাব-তিরোভাব আছে কিন্তু মূলপ্রকৃতি নিত্য অর্থাৎ এরূপ আবির্ভাব-তিরোভাব বর্জিত। তৃতীয়ত, মহদাদি ব্যক্তপদার্থগুলি অব্যাপী অর্থাৎ দেশ-কালে সীমাবদ্ধ কিন্তু মূলপ্রকৃতি এই মহদাদি ২৩টি পদার্থকে ব্যাপ্ত করে আছে অর্থাৎ তা ব্যাপক বা সার্বত্রিক। চতুর্থত, ব্যক্তপদার্থগুলি সক্রিয় অর্থাৎ স্পন্দনযুক্ত। এই পদার্থগুলি যেহেতু দেশ-কালাদিতে পরিচ্ছিন্ন এবং গ্রহণ-বর্জনাদি ক্রিয়াবিশিষ্ট, তাই এদের স্পন্দন হয় কিন্তু মূলপ্রকৃতির পরিণাম থাকলেও পরিস্পন্দন থাকে না কারণ এই মূলপ্রকৃতিতে কোনওপ্রকার অবকাশ (space) এর জায়গা নেই। পঞ্চমত, মহদাদি ব্যক্তপদার্থগুলি পুরুষভেদে অনেক কিন্তু প্রকৃতির একভিন্নতার কোনও প্রসঙ্গই উপস্থিত হয় না। ষষ্ঠত, ব্যক্তপদার্থগুলি

ব্যক্ত-অব্যক্তের বৈধর্ম্য

আশ্রিত কারণ এগুলি কার্যপদার্থ। এবং কার্যপদার্থ হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই এরা নিজ নিজ কারণে আশ্রিত। অন্যদিকে মূলপ্রকৃতির কোনও কারণ না থাকায় সে স্বয়ং আশ্রয়, আশ্রিত না। সপ্তমত, ব্যক্তপদার্থগুলি প্রধানের লিঙ্গ বা অনুমাপক হয়ে থাকে অন্যদিকে প্রধান কখনই নিজের অনুমাপক হয় না (যদিও প্রধান পুরুষের লিঙ্গ বা অনুমাপক হয়)। অষ্টমত, ব্যক্তপদার্থগুলি সাবয়ব। অবয়ব অর্থাৎ দুটি পদার্থের সংযোগ। মহদাদি পদার্থগুলি বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করলেও তাদের সংযোগ হয়। পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থগুলি থেকেই তা উপলব্ধ হয়। কিন্তু মূলপ্রকৃতির ব্যক্তের সাথে সংযোগ হয় না। নবমত, ব্যক্তপদার্থগুলি পরতন্ত্র। পরতন্ত্র অর্থাৎ পরনির্ভরশীলতা, স্বকার্যসিদ্ধিতে অন্যের সহায়তার উপর নির্ভরতা। মহাদাদি প্রত্যেকের যে পরিণাম সেই পরিণাম সর্বদা প্রকৃতিকে অপেক্ষা করেই নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু প্রকৃতি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, স্বকার্যসিদ্ধিতে সে কারও মুখাপেক্ষী নয়।

বৈধর্ম্যের পর ইদানীং সাংখ্যকারিকাকার প্রায় ছয় (৬) রকম ভাবে সাধর্ম্য প্রদর্শন করছেন।[৫৪] প্রথমত, ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়ই ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সুখদুঃখমোহাত্মক। সুখদুঃখমোহাত্মক বলতে বুঝতে হবে সুখদুঃখমোহস্বরূপ। তবে লক্ষণীয় যে, ত্রিগুণ অর্থে সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এখানে বিবেচ্য নয়, কারণ ব্যক্ত ও অব্যক্তের মধ্যে কার্যকারণভাব উপপন্ন না হওয়া পর্যন্ত

ব্যক্ত-অব্যক্তের সাধর্ম্য

ব্যক্তকে সত্ত্বরজস্তমোরূপ ত্রিগুণাত্মক বলা যুক্তিসঙ্গত হয় না। দ্বিতীয়ত, ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়ই অবিবেকী। বিবেক অর্থাৎ ভেদ, অতএব অবিবেকী অর্থাৎ ভেদবর্জিত। অব্যক্ত প্রধানের পুরুষের সাথে ভেদ থাকে তবে নিজের সাথে কোনও ভেদ নেই, এবং ব্যক্ত মহদাদি সকল প্রধানের সাথে স্বরূপত ভেদবর্জিত। তবে বাচস্পতি মিশ্র অবিবেকী শব্দের অন্য একটি অর্থ করতে চেয়েছেন 'সম্ভূয়কারিতা'।[৫৫] অর্থাৎ অন্যের সাহায্য নিয়ে কার্যোৎপাদন করা। ব্যক্ত মহদাদি প্রকৃতির সাহায্য নিয়ে কার্যোৎপাদন করে এবং অব্যক্ত প্রধানও অদৃষ্টাদির সাহায্য নিয়ে কার্যোৎপাদন করে। অতএব, অবিবেকী অর্থে সম্ভূয়কারিতা স্বীকার্য। তৃতীয়ত, ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়ই বিষয়। প্রশ্ন হতে পারে কার বিষয়? উত্তরে বলতে হয় জ্ঞানের বিষয়। অর্থাৎ ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়ই জ্ঞানগ্রাহ্য হয়। ঘট-পটাদি বাহ্য বিষয়কে বিজ্ঞানের আকার বলে আপত্তি করা হয়ে থাকে কিন্তু তার নিরসনে বলা যায় জাগতিক পদার্থসকল জ্ঞানমাত্র নয়, তারা জ্ঞেয় অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়। চতুর্থত, ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়ই সামান্য বা সাধারণ। অর্থাৎ উভয়ই ঘটাদিপদার্থের ন্যায় অনেক পুরুষের দ্বারা গৃহীত হয়ে থাকে। পঞ্চমত, ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়ই অচেতন। অব্যক্ত প্রধানের অচেতনত্ব প্রসিদ্ধ এবং সেইকারণে তা হতে সৃষ্ট ব্যক্ত মহদাদির অচেতনত্বও স্পষ্ট। ষষ্ঠত, ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়ই প্রসবধর্মি। অর্থাৎ উভয়ই পরিণামশীল। পরিণামের সাথে সততই উভয়ের সম্বন্ধ।

পূর্বপক্ষী ন্যায় ও বৈশেষিক সম্প্রদায়, অব্যক্ত বা মূল কারণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আপত্তি তুললে সাংখ্যকারিকাকার খন্ডনপূর্বক বলেছেন *কারণমস্ত্যব্যক্তম্* । মহৎ হতে পৃথিবী পর্যন্ত পদার্থগুলিকে কারিকায় 'ভেদ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে,

প্রধান-স্বীকার

যার অর্থ যে পদার্থসমূহ পরস্পর ভিন্নরূপে প্রতীত হয়। বস্তুত এই সবকটিই আবার কার্য পদার্থ। স্বাভাবিকভাবেই এই কার্যসমূহের মূল কারণ আছে, তা স্বীকার করতে হবে। কারিকাকার মূল কারণ বা অব্যক্ত স্বীকারের জন্য পাঁচটি যুক্তির অবতারণা করেছেন। যথা-*পরিমাণাত্, সমন্বয়াত্, শক্তিতঃ প্রবৃত্তেঃ, কারণকার্য-বিভাগাত্, বৈশ্বরূপস্য অবিভাগাত্*।[৫৬]

পরিমাণাত্

প্রধান স্বীকারে প্রথম যুক্তি *পরিমাণাত্* অর্থাৎ পৃথিবী হতে মহৎ পর্যন্ত পদার্থগুলি পরিমিত হওয়ায় প্রধান স্বীকার্য। আপত্তি এই যে, মহাভূত গুলির কারণ তন্মাত্র, তন্মাত্রের কারণ অহংকার ও অহংকারের কারণ মহৎতত্ত্ব এইরূপে কার্য-কারণ পরম্পরার অবধি মহৎতত্ত্বেই ব্যবস্থিত হোক। আপত্তির নিরসনে বলতে হয়, কোনও বস্তু যদি পরিমিত বা অব্যাপী হয় তাহলে তার উৎপত্তি অবশ্যই স্বীকার্য। এই বিচারে মহাভূত, তন্মাত্র, অহংকার ও মহৎ অব্যাপী বা পরিমিত হওয়ায় তা উৎপন্ন পদার্থ। এবং উৎপন্ন পদার্থ হওয়ায় উৎপত্তির কারণও অবশ্যই স্বীকার্য। যেমন ঘট প্রভৃতি কার্যবস্তু পরিমিত হওয়ায় ঐ কার্যবস্তুর প্রতি মূল কারণ রূপে মৃত্তিকা স্বীকার করা হয় তেমনই মহদাদি পদার্থগুলির প্রতি পরম্পরাক্রমে মূল কারণ রূপে প্রধান স্বীকার্য।

সমন্বয়াত্

প্রধান স্বীকারে দ্বিতীয় যুক্তি *সমন্বয়াত্* অর্থাৎ পৃথিব্যাদি পদার্থগুলি সমানরূপ হওয়ায় প্রধান স্বীকার্য। সমন্বয় শব্দে বোঝায় সমরূপতা। এখন মহাভূত, তন্মাত্র, অহংকার ও মহৎ প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম (স্থূলগন্ধাদি, সূক্ষ্মগন্ধাদি, অভিমান, অধ্যবসায়) থাকলেও এদের একটি সাধারণ ধর্ম আছে। সেই সাধারণ ধর্মটি হল ত্রিগুণাত্মকত্ব বা সুখদুঃখমোহাত্মকত্ব। অতএব পৃথিব্যাদি প্রত্যেকটি তত্ত্বই সুখদুঃখমোহাত্মক। সুতরাং সমানরূপ এই কার্যবস্তুগুলির তৎস্বভাববিশিষ্ট মূলকারণ অবশ্যই স্বীকার্য। যেমন ঘটপ্রভৃতি কার্যবস্তুর সমরূপতা থেকে মূলকারণ রূপে মৃৎপিণ্ড স্বীকৃত হয় তেমনই মহদাদি কার্যবস্তুর প্রত্যেকটি সুখদুঃখমোহাত্মক হওয়ায় সমরূপ মূল কারণ প্রধান স্বীকার্য।

শক্তিতঃ প্রবৃত্তেঃ

প্রধান স্বীকারে তৃতীয় যুক্তি *শক্তিতঃ প্রবৃত্তেঃ* অর্থাৎ শক্তির চরম আশ্রয় স্বীকৃত হওয়ায় প্রধান স্বীকার্য। কারণের শক্তি হতে কার্য উৎপন্ন হয় এবং কারণ যদি শক্তিহীন হয় তাহলে কার্য উৎপন্ন হয় না এরূপ সাংখ্যের অভিমত। সৎকার্যবাদ সিদ্ধির সময়েও শক্তিবিশিষ্ট কারণের দ্বারা কার্যোৎপত্তি স্বীকৃত হয়েছে। অতএব কারণে শক্তি আছে একথা অনস্বীকার্য তবে ঐ শক্তি কোনও অতিরিক্ত পদার্থ নয়। প্রকৃতপক্ষে ঐ শক্তি কারণে থাকা কার্যের অব্যক্তাবস্থা বা অনাগতাবস্থা। যেমন তৈল তার উপাদান কারণ তিলে অনাগত অবস্থায় থাকে তেমনই পৃথিব্যাদি পদার্থগুলি স্ব স্ব কারণে অব্যক্তাবস্থায় থাকে। এইরূপে শক্তির চরম আশ্রয়ের স্বীকার করলে অবশ্যই অব্যক্ত বা প্রধান স্বীকার্য।

কারণকার্য-বিভাগাত্

প্রধান স্বীকারে চতুর্থ যুক্তি *কারণকার্য-বিভাগাত্* অর্থাৎ কারণ হতে কার্যের অভিব্যক্তি হওয়ায় প্রধান স্বীকার্য। কারণে অবস্থিত কার্যেরই অভিব্যক্তি হয় এবং সেই কার্যটি ভিন্নরূপে প্রতীত হয়। যেমন কচ্ছপের অঙ্গগুলি যখন শরীরে প্রবিষ্ট থাকে তখন অব্যক্ত অবস্থায় থাকে কিন্তু অঙ্গগুলি প্রকাশিত হলেই শরীর থেকে তার বিভাগের প্রতীতি হয়। যেমন ঘট বা অলংকার যখন মৃৎপিণ্ডে বা সুবর্ণপিণ্ডে থাকে তখন অব্যক্ত অবস্থাতেই থাকে কিন্তু ঘটরূপে বা অলংকাররূপে যখন প্রকাশিত হয় তখন ভিন্নরূপে প্রতীত হয়। তেমনই পৃথিব্যাদি পদার্থগুলি মহৎ হতে পরম্পরাক্রমে আবির্ভূত হয় ও ভিন্নরূপে প্রতীত হয়। বস্তুত কার্যটি কারণে বিদ্যমান থেকে আবির্ভূত ও ভিন্নরূপে প্রতীত হয়। এই যুক্তিতে স্বীকার করতে হয় মহৎ তত্ত্বও কোনও কারণ হতে আবির্ভূত ও ভিন্নরূপে প্রতীত এবং সেই মূল কারণটি নিশ্চিতভাবে প্রধান।

বৈশ্বরূপস্য অবিভাগাত্

প্রধান স্বীকারে পঞ্চম তথা শেষ যুক্তি *বৈশ্বরূপস্য অবিভাগাত্* অর্থাৎ সকল কার্যবস্তুর অভিন্নরূপে প্রতীতি হওয়ায় প্রধান স্বীকার্য। বিশ্বরূপ শব্দ হতে বৈশ্বরূপ শব্দটির উৎপত্তি। বিশ্বরূপ কথার অর্থ কার্যসমূহ। পৃথিবী হতে মহৎ পর্যন্ত কার্যগুলি প্রত্যেকেই নিজ নিজ কার্যবস্তুর অপেক্ষায় অব্যক্ত হয়।

যেমন পৃথিব্যাদিভূতাপেক্ষায় তন্মাত্রসমূহ অব্যক্ত, তন্মাত্রসমূহের অপেক্ষায় অহংকার অব্যক্ত, অহংকারের অপেক্ষায় মহৎতত্ত্ব অব্যক্ত। কিন্তু এগুলির অব্যক্ত হওয়া আপেক্ষিক মাত্র কারণ মহৎ তত্ত্বও মূল কারণে প্রবিষ্ট হয়। একমাত্র মূল কারণ বা প্রকৃতি বা প্রধান কোথাও প্রবিষ্ট হয় না। সেটিই চরম অব্যক্ত।

অব্যক্ত বা প্রধানের অস্তিত্ব যুক্তিবলে প্রতিষ্ঠাপিত। কিন্তু এই প্রকৃতি কীরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয় সেটিই এখন আলোচ্য বিষয়। অব্যক্ত ত্রিগুণাত্মক এবং এই ত্রিগুণ সতত পরিণামশীল।[৩৭] তবে এই পরিণাম দুই প্রকারে হয়, সদৃশ পরিণাম যা প্রলয়কালে হয়ে থাকে গুণগুলির সাম্যাবস্থা হেতু এবং অন্যদিকে বিসদৃশ পরিণাম যা সৃষ্টিকালে হয়ে থাকে গুণগুলির বৈষম্যাবস্থা হেতু।

প্রধান-প্রবৃত্তি

কিন্তু আপত্তির জায়গা এই যে একরূপ গুণগুলির অনেকরূপে অনন্তবৈচিত্র্যময় জগৎরূপে প্রবৃত্তি হয় কীরূপে? সত্ত্বরূপে সত্ত্বগুণের পরিণাম, রজঃরূপে রজোগুণের পরিণাম ও তমঃরূপে তমোগুণের পরিণাম- গুণগুলির স্বভাববশত হয় একথা বোধগম্য হয় কিন্তু ঐ গুণত্রয়ের পরিণামস্বরূপ জগতের উৎপত্তি কীভাবে হয়? কারিকাকার সমাধানে বলেছেন, *পরিণামতঃ সলিলবত্...*। জলের দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি উপস্থাপিত করেছেন কারিকাকার। বৃষ্টির জলের স্বাদ একরকম হলেও ঐ জল যখন ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, তখন নানাবিধ বিকারের সাহায্যে মধুর-অম্ল-লবণ-কটু-কষায়-তিক্ত রসরূপে প্রকাশিত হয়। সেইরকম একটি গুণ তারতম্যের কারণে প্রধান বা অপ্রধানরূপে বিবিধভাবে পরিণত হতে পারে। এবং ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির এইরূপ বিচিত্র পরিণামই প্রকৃতপক্ষে জগৎবৈচিত্র্যরূপে আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়।

২.৪.৮. গুণত্রয়

সাংখ্যে গুণের ত্রৈবিধ্য স্বীকৃত। প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা-

প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ প্রকাশপ্রবৃত্তিনিযমার্থাঃ
অন্যোঽন্যাভিভবাশ্রযজননমিথুনবৃত্তযশ্চ গুণাঃ।[৩৮]

প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ পদে গুণত্রয়ের স্বরূপ, *প্রকাশপ্রবৃত্তিনিযমার্থাঃ* পদে গুণত্রয়ের প্রয়োজন এবং *অন্যোঽন্যাভিভবাশ্রযজননমিথুনবৃত্তযঃ* পদে গুণত্রয়ের ক্রিয়া নিরূপিত হয়েছে।

স্বরূপ

প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ পদে কোনও একটি গুণের লক্ষণ ব্যক্ত হয়নি কারণ পরস্পরবিরুদ্ধ হওয়ায় সেটি একটি মাত্র গুণের স্বরূপ হতে পারে না। অতএব, সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই ক্রমানুসারে গুণের উল্লেখ বুঝে লক্ষণটি বিচার্য। প্রীতি শব্দে সুখ, অপ্রীতি শব্দে দুঃখ ও বিষাদ শব্দে মোহ বোঝায়। এবং আত্ম শব্দটি এই শব্দগুলির প্রত্যেকের সাথে যুক্ত থাকায় (দ্বন্দান্তে শ্রূযমাণঃ শব্দঃ প্রত্যেকং সংবধ্যতে) সত্ত্বের স্বরূপ হয় প্রীত্যাত্মক বা সুখাত্মক, রজের স্বরূপ হয় অপ্রীত্যাত্মক বা দুঃখাত্মক এবং তমের স্বরূপ হয় বিষাদাত্মক বা মোহাত্মক। তবে সুখ প্রকৃত অর্থে দুঃখের অভাব বা দুঃখ প্রকৃত অর্থে সুখের অভাব এরূপ আপত্তি করলে আপত্তির নিরসন হয় 'আত্ম' শব্দের দ্বারা। আত্ম শব্দটি ভাবের বাচক। ফলত, সুখ ভাব পদার্থ তা কোনওভাবেই দুঃখাভাব নয় এবং একই যুক্তিতে দুঃখও ভাব পদার্থ তা কোনওভাবে সুখাভাব নয়।

প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ পদে গুণত্রয়ের প্রয়োজন ব্যক্ত হয়েছে এবং এখানেও সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই ক্রম বোদ্ধব্য। সত্ত্বগুণের প্রয়োজন প্রকাশ, রজঃগুণের প্রয়োজন প্রবৃত্তি এবং তমঃগুণের প্রয়োজন নিয়মন (Balance)। প্রকাশ বলতে জ্ঞান এবং

প্রয়োজন

প্রবৃত্তি বলতে প্রযত্ন বোঝায়। অতএব জ্ঞান ও প্রযত্নের দ্বারাই যেখানে কার্যসিদ্ধি হয়ে যায় সেখানে নিয়মনের ভূমিকা কী? এরূপ আপত্তি উঠলে তার সমাধানে বলা হচ্ছে, সত্ত্বগুণ নিজে ক্রিয়াহীন তাই রজঃগুণ সত্ত্বগুণকে প্রবর্তিত করে। রজঃগুণ নিজে যেহেতু প্রবর্তক তাই সে সর্বত্র সত্ত্বগুণকে প্রবর্তিত করে কিন্তু এই প্রবর্তনা তমোগুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উদাহরণরূপে বলা যায়, একটি দীপশিখার স্বভাবই হল প্রকাশ। ফলত এটি সত্ত্বগুণাত্মক। এখন ঐ শিখা উর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হয় রজঃগুণের প্রেরণায়। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়, ঐ উর্ধ্বগতি পরিমিত হয়। কারণ তমোগুণের দ্বারা রজঃগুণের কার্য নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই নিয়মন (Balance) অবশ্যই প্রয়োজন।

স্বরূপ ও প্রয়োজন উক্ত হওয়ার পর এখন গুণত্রয়ের বৃত্তি নির্দেশ করা হচ্ছে *অন্যোঽন্যাভিভবাশ্রয়জননমিথুনবৃত্তয়ঃ*। বৃত্তি শব্দে ক্রিয়া এবং অন্যোন্য শব্দে পারস্পর্য বোঝায়। অতএব অভিভব, আশ্রয়, জনন ও মিথুন এই চারটি হল গুণত্রয়ের পারস্পরিক ক্রিয়া। উক্ত চারটি ক্রিয়ার সাথে বৃত্তি ও অন্যোন্য শব্দ সম্বন্ধিত হয়ে (দ্বন্দ্বান্তে শ্রূয়মাণঃ শব্দঃ প্রত্যেকং সংবধ্যতে) নির্দেশ করে অন্যোন্য-অভিভব-বৃত্তি, অন্যোন্য-আশ্রয়-বৃত্তি, অন্যোন্য-জনন-বৃত্তি ও অন্যোন্য-মিথুন-বৃত্তিকে। প্রথম ক্রিয়াটি হল অভিভব। গুণত্রয়ের মধ্যে কোনও একটি গুণ উদ্ভূত হলে অপর দুটি গুণ অভিভূত হয়। অর্থাৎ একটি গুণ

বৃত্তি

ক্রিয়োন্মুখ হলে অন্য গুণগুলি নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে। যেমন রজঃ ও তমঃ গুণকে অভিভূত করে সত্ত্বগুণ শান্তবৃত্তি লাভ করে। একইভাবে সত্ত্ব ও তমঃ গুণকে অভিভূত করে রজোগুণ ঘোর বা দুঃখবৃত্তি লাভ করে এবং সত্ত্ব ও রজঃ গুণকে অভিভূত করে তমোগুণ মূঢ়তাবৃত্তি লাভ করে। লক্ষণীয় এই যে উক্ত পরস্পর বিরুদ্ধ বৃত্তিত্রয় কিন্তু একটি অন্যটির প্রতিবন্ধক নয়, তবে একের কার্যকারিতায় অপর দুটি হীনবল হয়। দ্বিতীয় ক্রিয়াটি হল আশ্রয়। আশ্রয় শব্দে এখানে আধার বা অধিকরণ বোঝায় না কারণ গুণত্রয়ের পরস্পর আধারাধেয় ভাব হয় না। তাই আশ্রয় শব্দে সহকারিত্ব বুঝতে হবে। গুণত্রয়ের মধ্যে একটি গুণের ক্রিয়া অপর দুটি গুণের ক্রিয়াকে আশ্রয় করে বা সহকারিরূপে গ্রহণ করে। যেমন সত্ত্বগুণের প্রকাশ ক্রিয়া রজোগুণের প্রবৃত্তি ও তমোগুণের নিয়মনকে আশ্রয় করে। একইভাবে রজোগুণের প্রবৃত্তি ক্রিয়া সত্ত্বগুণের প্রকাশ ও তমোগুণের নিয়মনকে আশ্রয় করে এবং তমোগুণের নিয়মন ক্রিয়া সত্ত্বগুণের প্রকাশ ও রজোগুণের প্রবৃত্তিকে আশ্রয় করে। অতএব, গুণত্রয়ের একটির কার্যকারিতায় অপর দুটি সহকারী হয়। তৃতীয় ক্রিয়াটি হল জনন। জনন শব্দে এখানে উৎপত্তি এরূপ মুখ্য অর্থের পরিবর্তে পরিণাম এরূপ লাক্ষণিক অর্থ গ্রাহ্য। এবং সদৃশ ও বিসদৃশ এই দুই পরিণামের মধ্যে অন্যোন্য-জনন-বৃত্তির দ্বারা সদৃশ পরিণামকেই বোঝায়। অর্থাৎ প্রত্যেকটি গুণ প্রত্যেকটি গুণকে উৎপন্ন কর। সত্ত্বগুণের পরিণাম সত্ত্বগুণ, রজোগুণের পরিণাম রজোগুণ ও তমোগুণের পরিণাম তমোগুণ। তবে এই পরিণাম কোনওভাবেই কার্য নয় যেহেতু এগুলি কোনও তত্ত্বান্তর নয়। চতুর্থ ক্রিয়াটি হল মিথুন। মিথুন শব্দে সাহচর্য বোঝায়। গুণত্রয়ের একটি গুণ অপরদুটিকে কখনই ত্যাগ করে থাকতে পারে না। গুণগুলির আধিক্য বা অনধিক্য হতে পারে, তবে একেবারেই সম্বন্ধশূন্য হয় না। যেমন রজোগুণ ও তমোগুণ সত্ত্বগুণের মিথুন হয়। একইভাবে সত্ত্বগুণ ও তমোগুণ রজোগুণের এবং সত্ত্বগুণ ও রজোগুণ তমোগুণের মিথুন হয়।

২.৪.৯. পুরুষ-সিদ্ধি

কার্য ব্যক্ত ও কারণ অব্যক্ত– এই বিষয়টি সাধারণভাবে নিরূপিত হয়েছে। কিন্তু এরা উভয়েই জড়। অথচ এই সংসার চিৎ ও জড় উভয়কে নিয়েই। তাই কারিকাকার নিজেও জ্ঞাপন করেছেন যে, *ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাত্*...। অতএব সেই 'চিৎ' বা 'জ্ঞ' এর ধারণা এবার আবশ্যক।

সাংখ্যশাস্ত্রে যেটি 'পুরুষ', সেটিই অন্যান্য দর্শনশাস্ত্রে 'আত্মা' শব্দের দ্বারা বোঝানো হয়েছে। সম্পূর্ণ *সাংখ্যকারিকা* এক অর্থে পরমত খন্ডন ও মন্ডন বিবর্জিত তত্ত্ব ও তথ্যের প্রকাশক; তবে টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র পূর্বপক্ষীরূপে

পুরুষ-স্বীকার

তৌষ্টিকগণকে[৫৯] (তুষ্টিকেই যারা পরম প্রয়োজন বলে মনে করেন) স্বীকার করেছেন। অবশ্য কারিকাকার নির্দিষ্ট কোনও প্রতিপক্ষকে পর্যদুস্ত করার লক্ষ্যে নয়; বরং ব্যক্ত-অব্যক্তের পরিচয় প্রদানের পর স্বাভাবিক ক্রমে 'জ্ঞ' বা 'পুরুষ' এর সিদ্ধিতে ব্রতী হয়ে পাঁচটি যুক্তির অবতারণা করেছেন-*সংঘাতপরার্থত্বাত্, ত্রিগুণাদি-বিপর্যযাদ্, অধিষ্ঠানাত্, ভোক্তৃভাবাত্, ও কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেঃ*।[৬০] মজার ব্যাপার হল সাংখ্য শ্রুতির প্রামাণ্য স্বীকার করে কিন্তু প্রকৃতি হোক বা পুরুষ; তাদের সিদ্ধিতে অনুমানের আশ্রয় অবলম্বন করে।

পুরুষ-স্বীকারে প্রথম যুক্তি *সংঘাতপরার্থত্বাত্*। সংঘাত বলতে বোঝায়, যে পদার্থ মিলিতভাবে কার্য করে। বস্তুত জড়পদার্থমাত্রেই অন্যের সাথে মিলিত হয়ে কার্য করে, তাই জড় পদার্থই সংঘাত। এবং যে পদার্থগুলি সংঘাত সেগুলি একই

সংঘাতপরার্থত্বাত্

সাথে পরার্থ অর্থাৎ পরের প্রয়োজন সিদ্ধি করে। যেমন শয়ন, আসন প্রভৃতি মিলিত হয়ে সর্বদা পরের প্রয়োজন সাধন করে সেইরূপ প্রকৃতিমহদাদি মিলিতভাবে কার্য করে যার প্রয়োজন সাধন করে তিনি হলেন প্রকৃতিমহদাদি ব্যতিরিক্ত পুরুষপদবাচ্য। প্রকৃতিমহদাদিকে সংঘাত বলার তাৎপর্য এই যে প্রকৃতি হোক বা তদুৎপন্ন মহদাদি, প্রত্যেকেই সুখদুঃখমোহাত্মক।[৬১] ফলত প্রকৃতি-মহদাদি সংঘাত অর্থাৎ মিলিত ভাবে কার্য করে।

দ্বিতীয় যুক্তি *ত্রিগুণাদি-বিপর্যযাদ্*। পুরুষের অস্তিত্ব সাধনে এটি প্রত্যক্ষ যুক্তি নয় পরোক্ষ যুক্তি। এই যুক্তির দ্বারা পুরুষের অসংহতত্ব সিদ্ধ হয়। আর তা সিদ্ধ হলেই অস্তিত্ব সিদ্ধি হয়। প্রকৃতিমহদাদি সংঘাত এবং সেই সাথে ত্রিগুণাত্মক। তবে এইগুলি

ত্রিগুণাদি-বিপর্যযাদ্

যার প্রয়োজন সাধন করে সেই পুরুষ 'ত্রিগুণাদিবিপর্যয়' অর্থাৎ ত্রিগুণের বিপরীত এবং একই সাথে প্রকৃতিমহদাদির মত সংহত বা মিলিত নয়। এই অসংহতত্বই প্রকৃতিমহদাদি হতে ভিন্নকিছুর অস্তিত্ব সিদ্ধ করে এবং সেটি হল পুরুষ।

তৃতীয় যুক্তি *অধিষ্ঠানাত্*। অধিষ্ঠান বলতে বুঝতে হবে সান্নিধ্য। বস্তুত যে পদার্থগুলি সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক (অর্থাৎ জড়),

অধিষ্ঠানাত্

সেগুলি অন্যের (চেতনের) সান্নিধ্যবশত চালিত হয়। যেমন, রথ (জড়) প্রভৃতি সারথির বা অশ্বের (চেতন) দ্বারা চালিত হয়। একইরকমভাবে প্রকৃতি-মহদাদি প্রত্যেকেই সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক এবং প্রত্যেকের পরিণাম লক্ষণীয়। অতএব যার সান্নিধ্যবশত এই পরিণাম সেই চেতন পুরুষ অবশ্যই স্বীকার্য।

চতুর্থ যুক্তি *ভোক্তৃভাবাত্*। ভোগ্য অর্থাৎ ভোগের বিষয় এবং ভোক্তা অর্থাৎ ভোগকর্তা। ভোগ বলতে বুঝতে হবে সুখ-দুঃখ

ভোক্তৃভাবাত্

সাক্ষাৎকার বা সুখ-দুঃখোপলব্ধি। প্রকৃতি ও মহদাদি সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক হওয়ায় অচেতন। ফলত ব্যক্ত মহদাদি যেমন অব্যক্ত প্রকৃতিকে ভোগ করতে পারে না, তেমনই অব্যক্ত প্রকৃতিও ব্যক্ত মহদাদিকে ভোগ করতে পারে না। তাই এরা ভোগ্য। এবং ভোগ্যত্ব যেহেতু ভোক্তৃত্ব সাপেক্ষ তাই ঐ ভোগ্য বিষয়গুলির জন্য

একজন চেতন ভোক্তার অর্থাৎ পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। অন্য মতে ভোগ্য বলতে বুঝতে হবে 'দৃশ্য' অর্থাৎ জ্ঞানবিষয়ত্ব। এখন দৃশ্যের দ্বারাই দ্রষ্টার অনুমান হয় তাই দৃশ্যত্ব সিদ্ধির জন্য দ্রষ্টার অর্থাৎ পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হবে। যদিও আপত্তির জায়গা উভয়ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। পুরুষের অকর্তৃত্ব সাংখ্যে প্রসিদ্ধ, সেখানে পুরুষকে ভোক্তা বা দ্রষ্টা বলা কতখানি সঙ্গত? আবার একথাও ঠিক যে ভোগ বা জ্ঞানবিষয়ত্ব কোনও অচেতনের হওয়া সম্ভব নয়। তাই ভোক্তৃত্ব বা দ্রষ্টৃত্ব যাই হোক না কেন তা পুরুষেরই স্বীকার্য; তবে আপত্তি নিরসনে এটুকু বলা যায় যে ঐ ভোক্তৃত্ব বা দ্রষ্টৃত্ব পুরুষের স্বাভাবিক নয়, একান্তই আরোপিত।

কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেঃ

পঞ্চম তথা শেষ যুক্তি *কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেঃ*। কৈবল্য বলতে বুঝতে হবে আত্যন্তিক দুঃখত্রয়ের বিনাশ।[৬২] উক্ত কৈবল্যের নিমিত্ত শাস্ত্রের ও মহর্ষিগণের প্রবৃত্তি দেখা যায়। বস্তুত শাস্ত্রের প্রবৃত্তি বা মহর্ষিগণের প্রবৃত্তি ভ্রমমূলক হতে পারে না, তাই কৈবল্যের জন্য অর্থাৎ আত্যন্তিক দুঃখত্রয়ের বিনাশের নিমিত্ত প্রবৃত্তি হওয়ায় অদুঃখাত্মক পুরুষ অবশ্যই স্বীকার্য।

পুরুষ-বহুত্ব

পুরুষের অস্তিত্ব যুক্তিসহ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। যদিও যুক্তিগুলির সবলতা-দুর্বলতা বিচারসাপেক্ষ, তথাপি যুক্তিবলেই পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার্য। ইদানীং আপত্তির বিষয় সেই স্বীকৃত পুরুষের সংখ্যা নিয়ে। পুরুষ এক অথবা বহু? সাংখ্যমতে অবশ্য পুরুষ বহু এবং এই পুরুষবহুত্ব প্রতিষ্ঠাপন করতে কারিকাকার তিনটি যুক্তির অবতারণা করেছেন- *জনন-মরণ-করণানাং প্রতিনিযমাদ্, অযুগপত্-প্রবৃত্তেঃ* এবং *ত্রৈগুণ্যবিপর্যযাত্*।[৬৩]

জনন-মরণ-করণানাং প্রতিনিযমাদ্

পুরুষ-বহুত্ব সাধক প্রথম যুক্তি *জনন-মরণ-করণানাং প্রতিনিযমাদ্*। জনন অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদির মিলিতভাবে পুরুষের সাথে অভিসম্বন্ধ। মরণ অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদির মিলিতভাবে পুরুষের সাথে অভিসম্বন্ধ পরিত্যাগ। এবং করণ অর্থাৎ অন্তঃকরণাদি ইন্দ্রিয়সমূহ। এই জন্ম, মরণ ও ইন্দ্রিয়সমূহের প্রতিনিয়ম বা ব্যবস্থা থাকায় অর্থাৎ প্রত্যেক পুরুষের সাথে পৃথক্ পৃথক্ সম্বন্ধ থাকায় একজনের জন্মে সকলের জন্ম হয় না বা একজনের মৃত্যুতে সকলের মৃত্যু হয় না বা একজনের দর্শনে/শ্রবণে/গমনে সকলের দর্শন/শ্রবণ/গমন হয় না। অতএব, সকল শরীরে একটি পুরুষ স্বীকার করা যায় না, তাতে অব্যবস্থা প্রকট হয়। সেকারণে পুরুষবহুত্ব স্বীকরণীয়।

অযুগপত্ প্রবৃত্তেঃ

দ্বিতীয় যুক্তি *অযুগপত্-প্রবৃত্তেঃ*। প্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রযত্ন বা ক্রিয়া। প্রযত্ন অন্তঃকরণের ধর্ম হলেও তা পুরুষে আরোপিত হয়। ভৃত্যের প্রশংসা-অপবাদ যেমন প্রভুতে আরোপিত হয় তেমনই যে অন্তঃকরণ যে পুরুষের জন্য নির্মিত সেই অন্তঃকরণস্থিত প্রযত্ন সেই পুরুষের উপর আরোপিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই পুরুষ যদি এক হয় তাহলে সকল অন্তঃকরণের সাথে যুগপৎ সম্বন্ধবশত একই কার্যে সকল অন্তঃকরণের প্রবৃত্তি হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না, তাই পুরুষবহুত্ব স্বীকার্য।

ত্রৈগুণ্যবিপর্যযাত্

তৃতীয় যুক্তি *ত্রৈগুণ্যবিপর্যযাদ্*। ত্রৈগুণ্য অর্থাৎ সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই তিন গুণ এবং বিপর্যয় অর্থাৎ ভেদ বা বৈচিত্র্য। গুণত্রয়ের বৈচিত্র্য ইহ জগতে উপলব্ধ হয়। কেউ সত্ত্বগুণাশ্রয়ী হয়ে থাকেন যেমন দেবতা, কেউ রজোগুণাশ্রয়ী হয়ে থাকেন যেমন মনুষ্য আবার কেউ তমোগুণাশ্রয়ী হয়ে থাকেন যেমন তির্যগ্‌যোনিবিশিষ্ট

প্রাণী। অতএব সকল শরীরে যদি এক আত্মার অবস্থান থাকত তাহলে দেবতা, মানুষ, পক্ষী এরূপ ভেদ ব্যবহার কীরূপে যুক্তিযুক্ত হয়? তাই, ত্রিবিধ গুণের বৈচিত্র্যের কারণেই পুরুষবহুত্ব স্বীকরণীয়।

বহুত্ববিশিষ্ট এই পুরুষ ব্যক্ত ও অব্যক্ত থেকে আলাদা হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই এতে ত্রিগুণত্বাদির বিপর্যাস লক্ষ্য করা যায়। এবং এই অত্রিগুণত্বাদির জন্য পুরুষে কয়েকটি ধর্ম প্রকট হয়। যথা– সাক্ষিত্ব, কৈবল্য, মাধ্যস্থ্য, দ্রষ্টৃত্ব ও অকর্তৃত্ব।[৬৪] ব্যক্ত ও অব্যক্ত যেখানে অচেতন বা জড়, পুরুষ সেখানে চেতন। এই চেতনত্ব থেকে পুরুষের সাক্ষিত্ব অনুমিত হয়। আবার ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়ই বিষয়। কিন্তু পুরুষ অবিষয়। আর এই অবিষয়ত্ব হেতু পুরুষের দ্রষ্টৃত্ব অনুমিত হয়। অন্যদিকে পুরুষ যেহেতু ত্রিগুণ হতে বিপরীত সেহেতু দুঃখ তার স্বাভাবিক ধর্ম নয়। তাই দুঃখের আত্যন্তিক অভাবরূপ কৈবল্য পুরুষের স্বতঃসিদ্ধ। একইভাবে ত্রিগুণ হতে বিপরীত হওয়ায় পুরুষের সুখের প্রতি অনুরাগ ও দুঃখের প্রতি বীতরাগ কোনওটিই স্বাভাবিক নয়। তাই পুরুষ মধ্যস্থ বা উদাসীন। এবং পুরুষ অপ্রসবধর্মী ও অপরিণামী। অপ্রসবধর্মিতার কারণে পুরুষের অকর্তৃত্বও সিদ্ধ হয়।

পুরুষ–ধর্ম

২.৪.১০. সৃষ্টিক্রম

সংযোগ বা সম্বন্ধের প্রসঙ্গ উঠলে এবং সেই সম্বন্ধ যদি প্রকৃতি ও পুরুষের মত দুটি পারস্পরিক ভিন্ন পদার্থের হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হয় এমন দুটি ভিন্ন পদার্থের পারস্পরিক সম্বন্ধ কীভাবে সম্ভব? উত্তরে বলা যায়, নিজ নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য এই দুই ভিন্ন পদার্থ একে অপরের সহকারিত্ব প্রাপ্ত হয় বা বলা ভালো একে অপরকে অপেক্ষা করে। প্রধানের প্রয়োজন ‘দর্শন’ এবং পুরুষের প্রয়োজন ‘কৈবল্য’–

পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তত্কৃতঃ সর্গঃ ।।[৬৫]

প্রকৃতি পুরুষকে অপেক্ষা করে কেন? সাংখ্যকারিকাকার জানাচ্ছেন–*পুরুষস্য দর্শনার্থম্*। অর্থাৎ পুরুষ কর্তৃক প্রকৃতির দর্শন হোক বা ভোগ হোক এই নিমিত্ত। বস্তুত ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হল ভোগ্যা। তাই ভোক্তার অনুপস্থিতিতে ভোগ্য বস্তুর সার্থকতা উপপাদন হয় না। এই জন্যই ভোগ্যা প্রকৃতি ভোক্তা পুরুষের অপেক্ষায় থাকে। অন্যদিকে, পুরুষ প্রকৃতিকে অপেক্ষা করে কেন? পুনরায় কারিকাকার বলছেন–*কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য*। অর্থাৎ কৈবল্য বা ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির নিমিত্ত। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হয় নিত্যমুক্ত স্বভাব পুরুষের আবার মুক্তি কেন? প্রকৃতপক্ষে পুরুষ সর্বদাই দুঃখশূন্য কিন্তু অবিবেকবশত (অভেদজ্ঞানবশত) প্রকৃতিগত দুঃখের সাথে তার আভিমানিক সম্বন্ধ হয়। ফলত আভিমানিক সম্বন্ধে পুরুষ অনাদিকাল হতে দুঃখত্রয় কবলিত।

অতএব প্রকৃতির যেমন পুরুষের অপেক্ষা হয়, পুরুষেরও তেমন প্রকৃতির অপেক্ষা হয়। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে উপকার্য–উপকারক ভাব বিদ্যমান। লৌকিক দৃষ্টান্ত প্রয়োগের দ্বারা এই উপকার্য–উপকারক ভাব বোধগম্য হচ্ছে– *পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগ...*। পঙ্গু অর্থাৎ চলচ্ছক্তিহীন এবং অন্ধ অর্থাৎ দর্শনশক্তিহীন। ব্যষ্টিগতভাবে নিজ নিজ ইষ্টসিদ্ধিতে তারা অক্ষম কিন্তু অন্ধ যদি পঙ্গুকে তার কাঁধে স্থান দেয় এবং পঙ্গু যদি অন্ধকে সঠিক দিগ্‌নির্দেশ করে তাহলে উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টায় সঠিক গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো সম্ভব। লক্ষণীয় এই যে অন্ধ সক্রিয় কিন্তু জ্ঞানহীন আর পঙ্গু নিষ্ক্রিয়

তথাপি চেতন। একইরকমভাবে প্রকৃতি সতত ক্রিয়াশীল হলেও অচেতন আর পুরুষ চেতন হলেও নিষ্ক্রিয়। ভোক্তা বা ভোগ্য একে অপরের সংযোগেই ব্যক্ত হয় নচেৎ হয় না। যেমন অগ্নির দহনক্ষমতা কাষ্ঠাদির সংযোগেই ব্যক্ত হয় কিংবা খাদ্য-পানীয় দ্রব্যের ক্ষুৎ-পিপাসা নিবৃত্তি ক্ষুধার্ত-পিপাসার্তের সন্নিধানেই প্রকট হয়। তাই প্রকৃতি পুরুষের যে উপকার্য-উপকারকভাব তা উভয়ের সংযোগেই সিদ্ধ হয়।

তাহলে একথা স্পষ্ট যে, প্রকৃতির ভোগের নিমিত্ত ও পুরুষের কৈবল্যের নিমিত্ত উভয়ের সংযোগ বা সম্বন্ধ। অর্থাৎ ঐ সংযোগ ভোগ ও কৈবল্যের হেতু। আবার প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে মহদাদিরও সৃষ্টি হয়- *তত্কৃতঃ সর্গঃ*। তাহলে আপত্তি এই যে মহদাদি সৃষ্টির প্রতিও কি প্রকৃতি-পুরুষ সংযোগই হেতু? উত্তর অবশ্যই সদর্থক কারণ প্রকৃতি-পুরুষ সংযোগে সৃষ্ট মহদাদির ভোগ ও অপবর্গ সম্ভব হয়। প্রকৃতির পরিণামবশত মহদাদি সৃষ্টি হলে তবেই ভোগ সম্ভব হয়। অতএব স্বীকার্য যে প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের ফলে মহদাদির সৃষ্টি হয় এবং সেই মহদাদিতে পুরুষের ভোগাপবর্গ সিদ্ধ হয়।

অতিসূক্ষ্ম প্রকৃতি হতে হঠাৎ একই সময়ে সকল পদার্থের সৃষ্টি হয় না, ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে প্রথম পদার্থ সৃষ্টি হওয়ার পর পুনরায় প্রকৃতি থেকে দ্বিতীয় পদার্থ সৃষ্টি হয় না, বস্তুত সৃষ্ট প্রথম পদার্থ থেকে দ্বিতীয় পদার্থ এবং দ্বিতীয় পদার্থ থেকে তৃতীয় পদার্থ উৎপন্ন হয়। যেমন বীজ থেকে অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে পত্র, পত্র থেকে শাখা এবং ক্রমে ধান উৎপন্ন হয় তেমনই প্রকৃতি থেকে প্রথম উৎপন্ন হয় মহৎ, মহৎ থেকে অহংকার, অহংকার থেকে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় এবং সর্বশেষে পঞ্চতন্মাত্র থেকে স্থূল পঞ্চমহাভূত।

প্রকৃতের্মহাংস্ততোঽহংকারস্তস্মাদ্ গণশ্চ ষোড়শকঃ ।
তস্মাদপি ষোড়শকাত্ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি ।।[৬৬]

একটি ছকের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে -

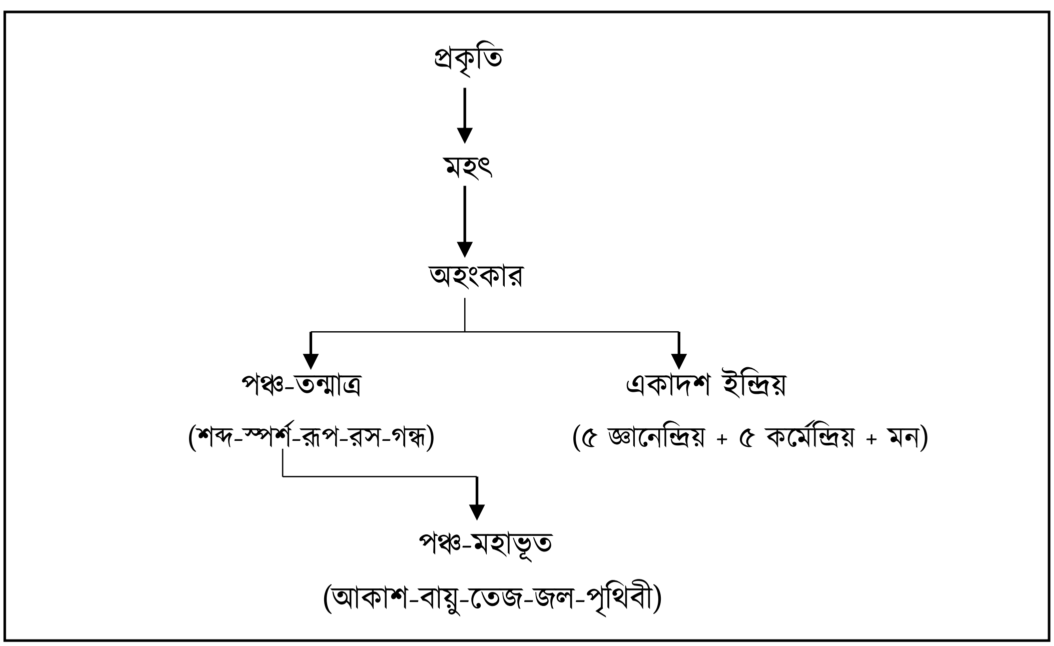

মহৎ/বুদ্ধি

তেইশটি ব্যক্তের মধ্যে মহৎ বা বুদ্ধি প্রথম। তাই সর্বাগ্রে মহৎ বা বুদ্ধির লক্ষণ ব্যক্ত হয়েছে *অধ্যবসায়ো বুদ্ধিঃ...* ।[৬৭] অর্থাৎ অধ্যবসায়ই হল বুদ্ধি। যদিও অধ্যবসায় হল ব্যাপার বা ক্রিয়া এবং বুদ্ধি হল ব্যাপারী বা ক্রিয়াবান, তথাপি ক্রিয়া-ক্রিয়াবানের অভেদপূর্বক (যেমন লোকব্যবহারে রিক্সাচালককে রিক্সা বলে আহ্বান করা হয়) অধ্যবসায়ই বুদ্ধির লক্ষণ। অধ্যবসায় শব্দের অর্থ নিশ্চয়। অতএব বস্তুর স্বরূপনিশ্চয়াত্মক যে তত্ত্ব, তাই হল বুদ্ধি। প্রশ্ন হয় কোন ক্রমে এই নিশ্চয় হয়ে থাকে? সমাধানে বলা যায়, প্রথমে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দাদি বিষয়ের গ্রহণ হয়। তারপর মনের নিকট তা সমর্পিত হলে 'এটি এই প্রকার' এইরূপে মননপূর্বক ব্যবহারকারীর বস্তুটির গ্রহণ বা বর্জন বা উপেক্ষাতে অভিমান হয়। এবং এরূপ অভিমানের পর 'এটি আমার কর্তব্য' এরূপ অধ্যবসায় বা নিশ্চয় হয়। সমগ্র জগদ্ব্যাপী সংঘটিত গ্রহণ-বর্জন-উপেক্ষার পশ্চাতে এই প্রক্রিয়া বিদ্যমান। তবে অধ্যবসায়ের অনন্তরই প্রকৃত অর্থে গ্রহণ-বর্জন-উপেক্ষা সম্পন্ন হয়। সুতরাং বুদ্ধি তৎকর্ত্রীস্বরূপা। এইরূপ বুদ্ধির দুটি ধর্ম। যথা- সাত্ত্বিক ও তামসিক। প্রকৃতপক্ষে, বিবেকজ্ঞানলাভে এদের উপযোগিতা।[৬৮] সাত্ত্বিক বুদ্ধিধর্মের উপাদান সত্ত্বগুণ এবং তামসিক বুদ্ধিধর্মের উপাদান তমোগুণ। স্বাভাবিকভাবেই তামসিক বুদ্ধিধর্ম অন্যটির বিপরীত। অর্থাৎ সাত্ত্বিক বুদ্ধিধর্মের চারটি রূপ- ধর্ম, জ্ঞান, বিরাগ ও ঐশ্বর্য। অন্যদিকে তামসিক বুদ্ধিধর্মের বিপরীত চারটি রূপ- অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য।[৬৯] বলা বাহুল্য, সত্ত্বগুণ ও তমোগুণ যেহেতু ক্রিয়াহীন তাই রজোগুণ ঐগুলির নিমিত্তকারণ হয়ে থাকে।

অহংকার

তেইশটি ব্যক্তের মধ্যে অহংকার দ্বিতীয়। অহংকারের লক্ষণ নিরূপণে বলা হয়েছে *অভিমানোঽহংকারঃ* । অর্থাৎ অভিমানই অহংকার। এবং বুদ্ধির লক্ষণের ন্যায় এক্ষেত্রেও ক্রিয়া-ক্রিয়াবানের অভেদপূর্বক অভিমানরূপ অসাধারণ ধর্মই অহংকারের লক্ষণরূপে গ্রাহ্য। অভিমান অর্থাৎ আমি বা আমার এই জাতীয় বৃত্তি। একটি বস্তুর স্বরূপনিশ্চয়ে যে প্রক্রিয়া, তাতে অধ্যবসায় এর অব্যবহিত পূর্বে এবং মনন এর অব্যবহিত পরে অভিমান সংঘটিত হয়। মননের পর বস্তুটিতে যখন 'আমি', 'আমার' এই জাতীয় অভিমান জন্মায়, সেই জ্ঞানবিশেষই অহংকার। এই অহংকার মহৎ বা বুদ্ধি অপেক্ষা স্থূলতর এবং দ্বিবিধ কার্যের উৎপাদক। যথা একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র।[৭০] এইরূপ অহংকারের সাত্ত্বিক ভাগ থেকে উৎপন্ন হয় ইন্দ্রিয়গুলি, কারণ এরা লঘু ও প্রকাশক। অন্যদিকে তামসিক ভাগ থেকে উৎপন্ন হয় তন্মাত্রসমূহ, কারণ এরা জড়। এবং এক্ষেত্রেও রজোগুণের স্বতন্ত্র কোনও কাজ না থাকলেও সত্ত্ব ও তমোগুণের ক্রিয়োৎপাদন তার অন্যতম কাজ।[৭১]

একাদশ ইন্দ্রিয়

সাত্ত্বিক অহংকার থেকে একাদশ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি। অর্থাৎ সাংখ্যমতে ইন্দ্রিয়সকল ভৌতিক নয়, আহংকারিক। একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে পাঁচটি বুদ্ধীন্দ্রিয় বা জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় ও মন। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় যথাক্রমে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক।[৭২] পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় যথাক্রমে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ।[৭৩] এবং এই উভয় প্রকার ইন্দ্রিয়ের কার্যের সহায়ক একাদশতম ইন্দ্রিয় হল মন যেটি বিশেষত সংকল্পাত্মক।[৭৪] এর মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির বৃত্তি শব্দাদি স্ব স্ব বিষয়ের আলোচন।[৭৫] অতএব চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বৃত্তি রূপের আলোচন, কর্ণেন্দ্রিয়ের বৃত্তি শব্দের আলোচন, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বৃত্তি গন্ধের আলোচন, রসনেন্দ্রিয়ের বৃত্তি রসের আলোচন ও ত্বগিন্দ্রিয়ের বৃত্তি স্পর্শের আলোচন। 'আলোচন' কথাটির অর্থ বিশেষপরিচয়বর্জিত সামান্যজ্ঞান। উদাহরণস্বরূপ, শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের সাহায্যে একটি শব্দ শ্রুত হল। অর্থাৎ শব্দের আলোচন বা সামান্যজ্ঞান হল মাত্র। ঐ শব্দটি কীসের শব্দ, সেই বিশেষজ্ঞান কিন্তু হয় না আলোচনের মাধ্যমে। সুতরাং নিজ নিজ বিষয়ের সামান্যজ্ঞানই জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির ব্যাপার বা বৃত্তি।

অন্যদিকে কর্মেন্দ্রিয়গুলির বৃত্তি পাঁচটি। বাগিন্দ্রিয়ের ব্যাপার বচন বা বর্ণোৎপত্তি-প্রযোজকতা। হস্তের ব্যাপার আদান বা গ্রহণ। পায়ের ব্যাপার বিহরণ বা গমন। পায়ু নামক ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার উৎসর্গ বা ত্যাগ। এবং উপস্থ নামক ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার আনন্দ।[৭৬] অন্তরিন্দ্রিয় মনের উল্লেখ প্রসঙ্গে অপর দুই আন্তর তত্ত্বের কথাও এসে যায়। যথা বুদ্ধি ও অহংকার। বস্তুত বুদ্ধি, অহংকার ও মন এই তিন আন্তর তত্ত্বের অসামান্য বৃত্তি যথাক্রমে অধ্যবসায়, অভিমান ও সংকল্প, যা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। অন্যদিকে উক্ত অন্তঃকরণত্রয়ের সামান্য বৃত্তি হল প্রাণ-অপান-ব্যান-সমান-উদান এই পঞ্চবায়ু। এই প্রাণাদি পঞ্চবায়ুকে 'জীবন' বলা হয় কারণ তার অনুপস্থিতিতে জীবিতের প্রতীতি হয় না। লক্ষণীয় যে, উক্ত পাঁচটি বুদ্ধীন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণত্রয়কে একত্রে ত্রয়োদশ করণ বলা হয়েছে।

পঞ্চ-তন্মাত্র

তন্মাত্র সংখ্যায় পাঁচটি। যথা শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ। এগুলি প্রকৃতপক্ষে অবিশেষ অর্থাৎ উপভোগযোগ্যহীন। *তন্মাত্রাণ্যবিশেষাঃ...*। অতএব যে শব্দ বিবৃত বা সংবৃত নয়, তাই শব্দতন্মাত্র। একইরকমভাবে যে স্পর্শ মৃদু বা কঠিন নয়, তাই স্পর্শতন্মাত্র, যে রূপ শুভ্র বা হরিত নয় তা রূপতন্মাত্র, যে রস মিষ্ট বা অম্ল নয় তা রসতন্মাত্র এবং যে গন্ধ সুগন্ধবিশিষ্ট নয় তা গন্ধতন্মাত্র। স্বাভাবিকভাবেই তন্মাত্রগুলি স্থূলদর্শীদের প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না, সূক্ষ্মদর্শীদের প্রত্যক্ষের বিষয় হয়ে থাকে।

পঞ্চ-ভূত

শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্র থেকে আকাশ-বায়ু-অগ্নি-জল-পৃথিবী এই পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হয়- ...*তেভ্যো ভূতানি পঞ্চ পঞ্চভ্যঃ*। এখন আপত্তি এই যে, এক একটি তন্মাত্র থেকে এক একটি ভূতের উৎপত্তি স্বীকার্য নাকি একটি তন্মাত্র থেকে ভূতের উৎপত্তিতে অন্যান্য তন্মাত্রের অনুপ্রবেশ স্বীকরণীয়? একমতে, আকাশ যেমনভাবে কেবল শব্দতন্মাত্র থেকে উৎপন্ন হয় তেমনই বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী যথাক্রমে স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধতন্মাত্র থেকে উৎপন্ন হয়। অন্যমতে, শব্দতন্মাত্র থেকে আকাশ, শব্দ ও স্পর্শতন্মাত্র থেকে বায়ু, শব্দ-স্পর্শ-রূপতন্মাত্র থেকে তেজ, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসতন্মাত্র থেকে জল এবং শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধতন্মাত্র থেকে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। উৎপত্তির উপায় নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও পঞ্চতন্মাত্র থেকে পঞ্চভূতের উৎপত্তি, এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

২.৪.১১. সূক্ষ্ম শরীর

অবয়ব

শরীর বলতে কেবল স্থূল শরীর নয়, তদতিরিক্ত সূক্ষ্ম শরীরও বোদ্ধব্য। মাতা থেকে লোম-লোহিত-মাংস ও পিতা থেকে স্নায়ু-অস্থি-মজ্জা মোট ছয়টি (৬) উপাদান নিয়ে যে ষাট্‌কৌশিক শরীর উৎপন্ন হয়, তাই স্থূল শরীর। এই শরীর অনিত্য। ফলে জীবের প্রতিটি জন্মেই তা পৃথক্ হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই প্রলয় পর্যন্ত স্থায়িত্ব লাভ করে না। অন্যদিকে সূক্ষ্মশরীর নিত্য এবং মহৎ থেকে পঞ্চতন্মাত্র পর্যন্ত অর্থাৎ মহৎ, অহংকার, মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র এই আঠারোটি (১৮) তত্ত্ব নিয়ে গঠিত।

এমন অষ্টাদশ অবয়ব বিশিষ্ট সূক্ষ্ম শরীরের ছয়টি (৬) বিশেষ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন গ্রন্থকার- *পূর্বোত্‌পন্নম্*, *অসক্তম্*, *নিয়তম্*, *নিরুপভোগম্*, *ভাবৈরধিবাসিতম্*, *লিঙ্গম্*।[৭৭] প্রথমত সূক্ষ্মশরীর পূর্বোত্‌পন্ন। অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বেই বা প্রারম্ভেই প্রকৃতি কর্তৃক নির্মিত হয়। এখন পুরুষ যেহেতু অসংখ্য তাই সূক্ষ্ম শরীরও অসংখ্য। কারণ প্রতিটি পুরুষের জন্য একটি করে সূক্ষ্মদেহ নির্মিত। দ্বিতীয়ত এইটি অসক্ত। অসক্ত কথার অর্থ অপ্রতিহত গতি। অতএব, সর্বত্রই সূক্ষ্মশরীরের প্রবেশ

অবাধ। সে কঠিন রন্ধ্রহীন প্রস্তরখণ্ড হোক বা অন্যকিছু। তৃতীয়ত এই সূক্ষ্মশরীর নিয়ত বা নিত্য। সামান্য স্থূল শরীর যেমন প্রলয় অবধি স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না, সূক্ষ্ম শরীর কিন্তু মহাপ্রলয় অবধি স্থায়িত্ব লাভ করে। চতুর্থত এই সূক্ষ্মশরীর নিরুপভোগ অর্থাৎ ভোগরহিত। ভোগের আয়তন রূপে ষাট্‌কৌশিক স্থূলশরীরই স্বীকার্য। সূক্ষ্মশরীর ভোগায়তন হতে পারে না। কারণ এই সূক্ষ্মশরীর সংসরণ করে প্রতিনিয়ত। অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব স্থূলশরীর ত্যাগ করে নূতন নূতন স্থূলশরীর গ্রহণ করে। পঞ্চমত ভাবের দ্বারা অধিবাসিত। ভাব বলতে বোঝায় ধর্ম–অধর্ম, জ্ঞান–অজ্ঞান, বৈরাগ্য–অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য–অনৈশ্বর্য এই আটটিকে। সাংখ্যমতে এগুলি বুদ্ধি বা মহতের ধর্ম। আবার সূক্ষ্মশরীরের উপাদানগুলির মধ্যে অন্যতম মহৎ বা বুদ্ধি। ফলত বুদ্ধির সাথে অন্বিত সূক্ষ্মশরীরেও ধর্ম–অধর্মাদি থাকে। এই ধর্ম–অধর্মাদি সূক্ষ্মশরীরের উপাদান স্বরূপ বুদ্ধিতে অবস্থান করেও অর্থাৎ সামান্য একাংশে থেকেও সম্পূর্ণ সূক্ষ্মশরীরকে অধিবাসিত করে। যেমনভাবে সুগন্ধি ফুল কাপড়ের এক প্রান্তে থাকলেও সম্পূর্ণ কাপড়টিকেই সুগন্ধিত করে তোলে। ষষ্ঠত এই সূক্ষ্মশরীর লিঙ্গস্বরূপ। মহাপ্রলয়ে লয়প্রাপ্ত হয় বলে এটি লিঙ্গ (লযং গচ্ছতীতি লিঙ্গম্)। যার উৎপত্তি হয় তার বিনাশও অবশ্যম্ভাবী এবং সূক্ষ্মশরীর যেহেতু পূর্বোৎপন্ন সেহেতু সূক্ষ্মশরীরও যে লয়প্রাপ্ত হয় সেকথা অবশ্যই স্বীকার্য।

বৈশিষ্ট্য

আঠারোটি (১৮) অবয়ব সহযোগে গঠিত সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গশরীরের বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে যথার্থরূপে। কিন্তু আপত্তির জায়গা সূক্ষ্মশরীরের অস্তিত্ব বা প্রয়োজনীয়তা নিয়ে। উক্ত আছে *প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য মন্দোঽপি ন প্রবর্ততে*। তাই প্রশ্ন হয় সূক্ষ্মশরীরের প্রয়োজনীয়তা কী? সাংখ্যকারিকাকার দুটি লৌকিক দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন, যেমন চিত্র বা ছবি একটি আশ্রয় (ক্যানভাস) ছাড়া অঙ্কিত হয় না অথবা স্থাণু (গাছ) না থাকলে তার ছায়া থাকতে পারে না; তেমনই নিরাশ্রয় লিঙ্গের আশ্রয় ছাড়া অবস্থিতি হয় না।[৭৮] আর এই আশ্রয় হল সূক্ষ্মশরীর। অবশ্য কারিকাকার শুধুমাত্র অনুমানের আশ্রয় নিলেও টীকাকার সূক্ষ্মশরীরের অস্তিত্বের সিদ্ধিতে শাস্ত্রপ্রমাণও নির্দেশ করেছেন। *বৈয়াসিক–মহাভারতের* বনপর্বে সাবিত্রী–সত্যবানের উপাখ্যানান্তরে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষের নির্দেশ আছে।[৭৯] *কঠোপনিষদে*ও অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষের উল্লেখ আছে।[৮০] আত্মা যেহেতু সর্বব্যাপী ও বিভু তাই তার নিষ্কর্ষণ সম্ভব নয়। সুতরাং যে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষের নিষ্কর্ষণের কথা বলা হচ্ছে তা সূক্ষ্মশরীরই। এই সূক্ষ্মশরীরের সংসরণ অর্থাৎ স্থূলশরীরের গ্রহণ–বর্জন পদ্ধতিটি কারিকাকারের দৃষ্টিতে অভিনেতার মত। অভিনেতা যেরূপ বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে প্রবেশ করে কখনও রাজা, কখনও প্রজা, কখনও সাধু, কখনও বা চোর রূপে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়, তেমনই সূক্ষ্মশরীর এক স্থূলদেহ ত্যাগ করে অপর এক স্থূলদেহ আশ্রয় করে।[৮১] ধর্ম–অধর্মাদি নিমিত্তের দ্বারা সূক্ষ্মশরীর দেবত্ব–দানবত্ব–মানবত্ব প্রভৃতি ধর্মবিশিষ্ট এক একটি স্থূলশরীর গ্রহণ বর্জন করে এবং সংসার রূপ মঞ্চে উপস্থিত হয়।

অস্তিত্ব

২.৪.১২. বুদ্ধিধর্ম

সূক্ষ্মশরীরের বর্ণনা প্রসঙ্গে ধর্ম–অধর্ম, জ্ঞান–অজ্ঞান, বৈরাগ্য–অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য–অনৈশ্বর্য এই আটটি ধর্মের উল্লেখ হয়েছে। এইগুলিকে 'ভাব' শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হয়েছে। উক্ত আটটি বুদ্ধির ধর্ম। বস্তুত একজন মুমুক্ষুর নিকট উপাদেয় ও ত্যজ্য বিষয়ের জ্ঞান অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই তন্নিমিত্ত বুদ্ধিধর্মগুলির স্বরূপ সর্বতোভাবে আলোচনীয়। তবে তারও আগে বুদ্ধির ধর্মগুলির ফল সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। উক্ত আট প্রকার বুদ্ধিধর্মের মধ্যে ধর্মের দ্বারা ঊর্ধ্বগমন, অধর্মের দ্বারা অধোগমন, জ্ঞানের দ্বারা অপবর্গ ও জ্ঞানবিপর্যয়ে বন্ধ হয়।[৮২] ঊর্ধ্বগমন অর্থাৎ স্বর্গাদিগমন বা উৎকৃষ্টজন্মলাভ অন্যদিকে

অধোগমন অর্থাৎ সুতলাদিদেশে গমন বা অপকৃষ্টজন্মলাভ। অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তি। এবং সেই বিষয়ে সাক্ষাৎ কারণ হয় জ্ঞান। বিবেকখ্যাতি বা প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক জ্ঞানই অপবর্গের সাধক। অন্যদিকে জ্ঞানবিপর্যয়ে অর্থাৎ অজ্ঞানের ফলে বন্ধ জন্মায়। অর্থাৎ অযথার্থ জ্ঞানের ফলে তাদের প্রাকৃতিক বা বৈকৃতিক বন্ধ জন্মায়। অবশিষ্ট বুদ্ধিচতুষ্টয়ের মধ্যে বৈরাগ্য থেকে প্রকৃতিলয়, অবৈরাগ্য থেকে সংসার, ঐশ্বর্য থেকে ইচ্ছার অপ্রতিহত অবস্থা ও অনৈশ্বর্য থেকে ইচ্ছার প্রতিহত অবস্থা হয়।[৮৩] প্রকৃতিলয় শব্দে প্রকৃতি অর্থে বুঝতে হবে মহৎ, অহংকার, ভূত ও ইন্দ্রিয়। এইগুলির একেকটিকে আত্মা মনে করে উপাসনা করলে সেই সেই বিষয়ে লয় হয়। যেমন বুদ্ধিলয়, অহংকারলয় ইত্যাদি। এইরূপে প্রকৃতি প্রভৃতিতে লয়ই প্রকৃতিলয়। বৈরাগ্য থেকে অর্থাৎ লৌকিক ও বৈদিক বিষয়ে অনাসক্তি থেকে উক্ত লয়ের সৃষ্টি হয়। অপরদিকে অবৈরাগ্য থেকে অর্থাৎ বিষয়ে আসক্তি থেকে সংসার হয়। ঐশ্বর্যের ফলে অর্থাৎ অণিমাদি ঐশ্বর্যের ফলে সকলপ্রকার ইচ্ছা অপ্রতিহত হয়, অপরদিকে অনৈশ্বর্যের ফলে ইচ্ছার বিঘাত বা প্রতিহত অবস্থা হয়।

২.৪.১৩. বুদ্ধির পরিণাম বা প্রত্যয়সর্গ

বুদ্ধির ধর্মের উল্লেখের পর এখন বুদ্ধির পরিণামের উল্লেখ করা হচ্ছে সেই ধর্ম গুলির গ্রহণ ও পরিত্যাগের সুবিধার্থে। 'প্রতীযতে নিশ্চীযতে অনেন' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'প্রত্যয়' কথাটির অর্থ বুদ্ধি। অপরদিকে 'সর্গ' কথাটির অর্থ সৃষ্টি বা পরিণাম। তাই প্রত্যয়সর্গ কথাটির অর্থ দাঁড়ায় বুদ্ধির পরিণাম। প্রাথমিকভাবে বুদ্ধির চারটি পরিণাম- বিপর্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি।[৮৪] বিপর্যয় অর্থাৎ অজ্ঞান বা অবিদ্যা। অজ্ঞান বলতে অবশ্যই জ্ঞানের অভাব নয়, জ্ঞানের বিপরীত এই অর্থ গ্রহণীয়। করণবৈকল্যই প্রকৃতপক্ষে অশক্তি। করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি এবং বৈকল্য অর্থাৎ দোষ। অতএব ইন্দ্রিয়দোষ ও বুদ্ধিদোষই অশক্তি। তুষ্টি হল অসদুপদেশে সন্তোষ। আর সিদ্ধি হল প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকসাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধির এই পরিণামগুলিও এক অর্থে বুদ্ধির ধর্মই। কেননা পূর্বোক্ত আটটি ধর্মের অন্তর্ভাব ঘটে উক্ত চারটি পরিণামে। বিপর্যয়ে অজ্ঞানের, অশক্তিতে অধর্ম, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্যের, তুষ্টিতে ধর্ম, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্যের এবং সিদ্ধিতে জ্ঞানের অন্তর্ভাব হয়। অতএব, একথা স্পষ্ট যে উক্ত পরিণামচতুষ্টয়ের মধ্যে বিপর্যয়, অশক্তি ও তুষ্টি এই তিনটি হেয় বা পরিত্যজ্য এবং সিদ্ধি একমাত্র উপাদেয় বা গ্রহণযোগ্য। উক্ত পরিণাম-চতুষ্টয়ে গুণত্রয়ের বৈষম্যহেতু পঞ্চাশ প্রকার (৫০) ভেদ হয়। এই ভেদগুলি কীরকম? বিপর্যয় পাঁচ প্রকার, অশক্তি আঠাশ প্রকার, তুষ্টি নয় (৯) প্রকার ও সিদ্ধি আট প্রকার।[৮৫]

২.৪.১৪. ভূতসর্গ বা তন্মাত্রসর্গ

সাংখ্য-মতানুসারে সৃষ্টি পুরুষার্থা অর্থাৎ পুরুষের প্রয়োজনে। আর পুরুষের প্রয়োজন হল ভোগ ও অপবর্গ। এখন এই উভয় প্রকার পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য প্রকৃতি উভয় প্রকার সৃষ্টি করে থাকে। যথা- ভোগের নিমিত্ত ভূতসর্গ বা তন্মাত্রসর্গ এবং অপবর্গের নিমিত্ত প্রত্যয়সর্গ। যদিও এই উভয় প্রকার সর্গ স্বীকারে আপত্তির জায়গা হচ্ছে- যেকোনও একপ্রকার সর্গের দ্বারাই পুরুষার্থের উপপত্তি হয় না, কারণ প্রত্যয়সর্গ ব্যতীত তন্মাত্রসর্গ হয় না আবার তন্মাত্রসর্গ ব্যতীত প্রত্যয়সর্গ হয় না। ভোগ প্রসঙ্গে এই কথাটি জানা দরকার যে, ভোগ্য-বিষয়, ভোগের অধিকরণ এবং ভোগের সাধন এই তিন প্রযোজক ব্যতিরেকে ভোগ সম্পূর্ণ হয় না। যেমন চন্দন-বনিতাদি ভোগ্যবিষয়, শয্যা আসনাদি ভোগের অধিকরণ এবং পান অনুলেপন প্রভৃতি ভোগের সাধন, তেমনই পুরুষের প্রয়োজনে শব্দ-স্পর্শাদি ভোগ্য বিষয়, সূক্ষ্মশরীর ও স্থূলশরীর ভোগের

অধিকরণ এবং বাহ্য ও অন্তঃকরণ ভোগের সাধন। এগুলির মধ্যে ভোগের সাধন প্রত্যয়সর্গ থেকে এবং ভোগের বিষয় ও অধিকরণ তন্মাত্রসর্গ থেকে সৃষ্ট। সুতরাং, পুরুষার্থের জন্য উভয় প্রকার সর্গের আবশ্যকতা স্বীকার্য। সংক্ষেপে তন্মাত্রসর্গ বা ভূতসর্গ চতুর্দশ প্রকার। যেখানে দেবসর্গ আট প্রকার, তির্যগ্‌যোনিসর্গ পাঁচ প্রকার এবং মনুষ্যসর্গ একপ্রকার।[৮৬] আট প্রকার দেবসর্গ যথা ব্রাহ্মঃ, প্রাজাপত্যঃ, ঐন্দ্রঃ, পৈত্রঃ, গান্ধর্বঃ, যাক্ষঃ, রাক্ষসঃ, পৈশাচঃ। পাঁচ প্রকার তির্যগযোনিসর্গ যথা পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীসৃপ, ও স্থাবর। লক্ষ্য করার বিষয়, ভূতসর্গের এই বিভাগ সংক্ষিপ্তভাবে প্রদর্শিত তাই এস্থলে ন্যূনতার অবকাশ নেই।

২.৪.১৫. সর্গের দুঃখময়তা

অপবর্গের পূর্বপ্রসঙ্গরূপে ভোগের কথা অস্বীকারের প্রশ্নই ওঠে না। তবে একথাও ঠিক যে এই সুবিশাল পৃথিবীর ভোগ্যবস্তুতে বৈরাগ্য জন্মালেই অপবর্গের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। আবার ভোগ্যবস্তুতে বৈরাগ্য বা বিতৃষ্ণা তখনই জন্মায়, যখন পুরুষ সেই বিষয়-বস্তুতে দুঃখ পায়। সেই কারণেই সর্গের দুঃখময়তা অর্থাৎ সৃষ্ট সমস্তপদার্থের দুঃখময়তা প্রদর্শন প্রয়োজন।

শরীর ধারণকারীর অন্যান্য দুঃখের সম্ভাবনা-অসম্ভাবনার জায়গা থাকলেও জরা ও মরণজনিত দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। শরীর মানেই তা কালে জরাগ্রস্থ হয়। কালে কালে জীর্ণ শরীর মরণের পথে উত্তীর্ণ হয়; কাজেই জরা-মরণ জনিত দুঃখ পুরুষমাত্রেই ভোগ করে।[৮৭] জরার প্রকোপে শরীরের চর্ম শিথিল হয়, পক্ককেশ প্রকট হয়, দন্তরাজি বিলুপ্ত হয়, স্মৃতি ক্রমশ বিস্মৃতিতে তলিয়ে যায়। বলবান ব্যক্তিও জরাস্পর্শে হীনবল হয়ে অবস্থান করে। এমনকি দেবভূমিও জরাব্যাধির করালমূর্তি হতে উপেক্ষিত নয়। তাই জরা প্রকৃত অর্থেই দুঃখময়। আবার মরণজনিত দুঃখও শরীরীর নিকট অবশ্যম্ভাবী কারণ মরণকালে শারীরিক সমস্ত ক্রিয়া তার স্বাভাবিকতা হারায়। ইন্দ্রিয়সমূহ, অন্যান্য প্রত্যঙ্গসমূহ সকলের বিচ্যুতি ঘটে। বায়ু, পিত্ত ও কফের বৈষম্যে শরীরে মহাবিপত্তি দৃষ্ট হয়। সুতরাং শরীরীর নিকট মরণদুঃখ অতীব ভয়ংকর এবং দেব, দানব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী এমনকি ক্ষুদ্র কীটাদি পর্যন্ত জরা-মরণজনিত দুঃখ ভোগ করে। প্রসঙ্গত জন্মজনিত দুঃখের কথাও উল্লেখ্য। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় গর্ভস্থ শিশু ও তার ধারণকারীকে অবর্ণনীয় দুঃখের সম্মুখীন হতে হয়। তবে জরা ও মরণজনিত দুঃখ অতিতীব্র ও অতিব্যাপক। অবশ্য অনাদিকাল হতে পুরুষকে সন্তাপিত করে আসা এই দুঃখের নিবৃত্তির পথ আছে। লিঙ্গশরীরের নিবৃত্তিতে দুঃখের অন্ত হয়। যতদিন পর্যন্ত লিঙ্গশরীর নিবৃত্ত না হয়, ততদিন পর্যন্ত পুরুষ দুঃখভোগ করে। আর লিঙ্গশরীরের নিবৃত্তি কীভাবে সম্ভব? বিবেকজ্ঞানের উদয়ে অবিবেক নষ্ট হলেই লিঙ্গশরীরের আত্যন্তিক লয় সম্ভব। সুতরাং, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ভোগ্যবস্তুসকল অর্থাৎ এই সমগ্র সৃষ্টি প্রকৃতপক্ষে দুঃখময়। আর সৃষ্টির বা সর্গের এই দুঃখময়তা জেনেই পুরুষ ভোগ্যবিষয়ে বিরক্ত হবেন।

২.৪.১৬. প্রকৃতি ও সৃষ্টি

'আরভ্যতে' এইরূপ ব্যুৎপত্তি স্বীকার করলে 'আরম্ভ' শব্দটির অর্থ হয় যেটি আরব্ধ হয় অর্থাৎ সৃষ্টি। ভূত-ভৌতিক এই সুবিশাল সৃষ্টির উৎপত্তি কোথা থেকে? - তা নিয়ে বাদ-বিবাদের অন্ত নেই। 'নানা মুনির নানা মতে'র সমাবেশ চিন্তন প্রক্রিয়ায় রসদের জোগান দিয়েছে আর নির্যাসরূপে নির্গত হয়েছে 'যত মত তত পথ'। অবশ্য সাংখ্যের দৃষ্টি এই বিষয়ে

একেবারে সোজাসাপটা। তাঁরা বলেন, মহৎতত্ত্ব হতে পঞ্চভূত পর্যন্ত এই সৃষ্টিকার্য 'প্রকৃতিকৃত' অর্থাৎ প্রকৃতির দ্বারাই সৃষ্ট।[৮৮] প্রকৃতিকৃত শব্দটির 'প্রকৃত্যা এব কৃত' এরূপ ব্যুৎপত্তির মধ্যে দিয়ে 'এব' এই অবধারণার্থক অব্যয়টির দ্বারা সৃষ্টিবিষয়ে অন্যান্য বাদীমতগুলির (যথা, *নেশ্বরেণ, ন ব্রহ্মোপাদানং, নাপ্যকারণং*) খণ্ডন হয় এরূপ টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের অভিমত।[৮৯]

সৃষ্টিবিষয়ে প্রথম আপত্তি ঈশ্বর এই সৃষ্টির কারণ। অবশ্য উপাদানরূপে ঈশ্বর কারণ হন না, নিমিত্তরূপে বা কর্তৃরূপেই কারণ হন। প্রকৃতি যেহেতু জড় বা অচেতন তাই একজন চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত সৃষ্টিকার্যে সক্ষম হবে কীভাবে?

ঈশ্বর কারণ নন

যেমন, যন্ত্র যদি যন্ত্রীর অধিষ্ঠানে থাকে তাহলেই কার্যে সক্ষম হয় তেমনই ঈশ্বরে অধিষ্ঠিত প্রকৃতি সৃষ্টিকার্যে সক্ষম হয়। এরূপ আপত্তির নিরসনে বলতে হয় ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্বে যাঁরা স্বপক্ষ রাখেন (পাতঞ্জল সম্প্রদায়) তাঁদের মতেই আবার ঈশ্বর সর্বদা ব্যাপারহীন। তাই ব্যাপারহীন কীভাবে অধিষ্ঠাতা হতে পারেন? সুতরাং স্বীকার করতেই হয় নির্ব্যাপার ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্বের প্রসঙ্গ অযৌক্তিক।

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, 'ব্রহ্ম' এই সৃষ্টির উপাদান কারণ। ব্রহ্মবাদিগণ (অদ্বৈত বেদান্ত সম্প্রদায়) কূটস্থ বা অপরিণামী ব্রহ্মকেই সৃষ্টিকার্যে উপাদানরূপে স্বীকার করেন। যদিও আপত্তির নিরসনে বলতে হয়, যা অপরিণামী তা উপাদান কারণ

ব্রহ্ম কারণ নন

হয় কীভাবে? কেননা মৃত্তিকা-সুবর্ণাদি পরিণামী বলেই ঘট-মুকুট প্রভৃতির উপাদান কারণ হয়। তাছাড়াও উপাদান কারণের গুণ কার্যে সঞ্চারিত হয়। যথা তন্তু শ্বেত হলে তন্নির্মিত বস্ত্র শ্বেতই হয়। স্বাভাবিকভাবেই, ব্রহ্ম যা বস্তুত চৈতন্যস্বরূপ, তা থেকে মহদাদিভূতসকল নির্মিত হলে সকল পদার্থই চেতনরূপে প্রতীত হত। অথচ এগুলি যে জড়পদার্থ তাতে সংশয়ের অবকাশ নেই। তাই উপাদানকারণরূপে ব্রহ্মকে বলা যুক্তিযুক্ত হয় না।

তৃতীয় আপত্তি এই যে, অনেকে মনে করেন সৃষ্ট এই চরাচর অকারণক বা যাদৃচ্ছিক। তাদের মতে সৃষ্ট এই সুবিশাল জগৎ কোনও কারণ ছাড়াই সৃষ্ট হয়েছে। কার্যকারণভাব সম্পর্কে উদাসীন এই মতবাদের খণ্ডনে বলতে হয় কোনওরকম

প্রকৃতিই কারণ

কারণ ছাড়াই সৃষ্ট পদার্থের উৎপত্তি স্বীকার করলে সেগুলির অত্যন্ত-ভাব কিংবা অত্যন্ত-অভাব হতে পারে। কেননা এরূপ নিয়ম আছে *যত্র যত্র অকারণত্বং তত্র তত্র নিত্যত্বালীকত্বান্যতরত্বম্*। ফলে কারণ স্বীকার না করলে সৃষ্ট পদার্থগুলির 'অত্যন্ত-ভাব' অর্থাৎ সর্বদা উপস্থিতি কিংবা 'অত্যন্ত-অভাব' অর্থাৎ সর্বদা অনুপস্থিতি হতে পারে। যেমন আকাশ ও আকাশকুসুম কোনওটিরই কারণ নেই (ন্যায়মতে) ফলত পূর্বেরটি সর্বদা বর্তমান এবং পরেরটি কোনও কালেই বর্তমান নয়। সুতরাং এরূপ সিদ্ধান্তই সমীচীন যে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি পরিণামশীলা হয়েই স্বাধীনভাবে সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন করে থাকে।

অবশ্য প্রকৃতির এই সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্তি স্বার্থে নয়, পরার্থে। প্রত্যেক পুরুষের মুক্তির নিমিত্ত প্রকৃতির এই প্রবৃত্তি।[৯০] আপত্তি হতে পারে, সাধারণত যার প্রয়োজন তাকেই সেই কার্যে প্রবৃত্ত হতে দেখা যায়। যেমন রামের অন্যত্র যাবার থাকলে রামই

প্রকৃতি পরার্থা

সেখানে গমন করে, শ্যাম গমন করে না। তাই মুক্তির প্রয়োজন যখন পুরুষের তখন প্রকৃতির প্রবৃত্তি হতে যাবে কেন? আপত্তির নিরসনে বলতে হয়, এই সৃষ্টি পরপ্রয়োজনসাধক হলেও সেটি স্বার্থবৎ। অর্থাৎ প্রযত্ন বা চেষ্টাটি সমান। লৌকিক দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপন করা যেতে পারে সূর্যের প্রকাশন, মেঘের বর্ষণ, নদীর প্রবহণ ইত্যাদিতে সূর্য-মেঘ-নদীর ঐসকল কার্য কিন্তু পরপ্রয়োজনেই, স্বপ্রয়োজনে নয়। অথচ প্রযত্নটি সমান। তাই প্রকৃতিও পুরুষের প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজনরূপে গণ্য করে এবং সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হয়। অনেকে এরূপ

আপত্তি করে থাকেন যে চেতন পুরুষের নিমিত্ত অচেতন প্রকৃতির প্রবৃত্তি যুক্তিযুক্ত হয় না। তাদের মতে অচেতনটিকে একটি চেতনের আশ্রয়েই প্রবৃত্তিমান হতে হয়। যদিও এই আপত্তি নস্যাৎ করে কারিকাকার প্রদত্ত দৃষ্টান্তটি উল্লেখ করতে হয়। *বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য/পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য*।[৯১] একথা প্রসিদ্ধ যে বৎসের বৃদ্ধি বা পুষ্টির জন্য গাভীর শরীরে দুগ্ধের উৎপত্তি হয় এবং স্তনের মাধ্যমে তা ক্ষরিত হয়ে থাকে। এখানে অচেতন দুগ্ধের স্বতঃপ্রবৃত্তি হয়ে থাকে বৎসবিবৃদ্ধির জন্য। অতএব অচেতন প্রবৃত্তিমান হয় না একথা দৃষ্টবিরুদ্ধ। সুতরাং অচেতন দুগ্ধের প্রবৃত্তি যেমন বৎসের নিমিত্ত অর্থাৎ পরপ্রয়োজনেই তার প্রবৃত্তি সেইরূপ অচেতন প্রকৃতিও পুরুষের মুক্তির নিমিত্ত প্রবৃত্ত হয়। তবে এই পরপ্রয়োজন স্বপ্রয়োজনের সমান।

পরার্থে প্রকৃতির এই প্রবৃত্তি অবগত হলেও আপত্তির জায়গা এই যে প্রকৃতির প্রবৃত্তি অব্যাহত থাকলে তো সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদের কারণে পুরুষের দুঃখও অব্যাহত থাকবে। তাই প্রকৃতির নিবৃত্তির কারণ কী? সাংখ্যকারিকাকার দৃষ্টান্ত

প্রকৃতির নিবৃত্তি

দিয়েছেন নর্তকী ও রঙ্গমঞ্চস্থ সভ্যগণের– *রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ততে নর্তকী যথা নৃত্যাৎ/পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য বিনিবর্ততে প্রকৃতিঃ*।[৯২] নর্তকী যেমন মঞ্চস্থ সভ্যগণদের নৃত্যপ্রদর্শন করে এবং তারপর তা হতে নিবৃত্ত হয়, তেমনই প্রকৃতিও প্রবৃত্তিকালে স্বস্বরূপ উন্মোচিত করে এবং কার্য সমাধানে সৃষ্টিকার্য হতে নিবৃত্ত হয়। এই স্বস্বরূপ উন্মোচন কীরূপ? প্রবৃত্তিকালে প্রকৃতি পুরুষ হতে নিজেকে ভিন্নরূপে প্রকাশিত করে না; তবে পুরুষ যখন শব্দস্পর্শাদিরূপা প্রকৃতি হতে নিজেকে ভিন্নরূপে বুঝতে পারে তখন প্রকৃতির নিবৃত্তি হয়।

২.৪.১৭. বন্ধন বা মুক্তি– প্রকৃতির অথবা পুরুষের?

সাংখ্যমতে পুরুষ সদামুক্ত। এটি পুরুষের কোনও অবস্থান্তর নয় বরং পুরুষের স্বভাব। এমনকি প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে দেখা যায় সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণের সাথে পুরুষের কোনও সম্বন্ধ নেই। অর্থাৎ পুরুষ অপরিণামী। ফলত বন্ধন, মোচন ইত্যাদি পরিণাম পুরুষে সম্ভাবিত হতে পারে না– *তস্মান্ন বধ্যতেঽদ্ধা নাপি মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ*।[৯৩] তাহলে বন্ধন কার? বন্ধন হল প্রকৃতির। নানাপুরুষাশ্রিতা প্রকৃতিই বদ্ধ হয়, সংসরণ করে ও মুক্ত হয়– *সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ*।[৯৪] স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হয় প্রকৃতির বন্ধন, সংসরণ ও মুক্তি কীরূপে ঘটে? পূর্বে ধর্ম, অধর্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, অনৈশ্বর্য এই আটপ্রকার বুদ্ধিধর্মের উল্লেখ হয়েছে। এগুলির মধ্যে ধর্ম, অধর্ম, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, অনৈশ্বর্য উক্ত সাতটি ধর্মের দ্বারা প্রকৃতি নিজেকে নিজে বদ্ধ করে আবার জ্ঞান রূপ একটিমাত্র ধর্মের দ্বারা নিজেকে মুক্ত করে।[৯৫] সুতরাং তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে পুরুষের বন্ধন-মুক্তি কিছু নেই, এই সকল বস্তুত প্রকৃতির ব্যাপার।

২.৪.১৮. কৈবল্য

সাংখ্যশাস্ত্র প্রতিপাদিত তত্ত্ব ইতিমধ্যে বিবৃত। প্রকৃতি-পুরুষের ভেদ বা প্রকৃতি-পুরুষ বিবেকই সাংখ্যশাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য।

তত্ত্বাভ্যাস

তবে কি ঐ তত্ত্বের জ্ঞানই পরমপুরুষার্থ লাভ? উত্তরে বলতে হয় ‘না’। তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাসের দ্বারা ‘ন অস্মি’, ‘ন মে’, ‘ন অহম্’ এই জাতীয় ‘বিশুদ্ধ কেবল জ্ঞান’ উৎপন্ন হয়। শুধু তাই নয়, ঐ অভ্যাসও নিরন্তর, দীর্ঘকাল সাদরে হওয়া বাঞ্ছনীয় কারণ যে বিষয়ে সাদরে নিরন্তর, দীর্ঘকাল অভ্যাস করা হয় সেই বিষয়ের সাক্ষাৎকার হয়ে থাকে।[৯৬] সুতরাং প্রতিপাদিত তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাসেই তাৎপর্য। কিন্তু এই তত্ত্বাভ্যাসের ফল কী?

এই তত্ত্বাভ্যাসের ফলে সমস্তপ্রকার অবিশুদ্ধি বর্জিত 'ন অস্মি', 'ন মে', 'ন অহম্' এই জাতীয় বিশুদ্ধ কেবল জ্ঞান উৎপন্ন হয়। 'ন অস্মি' এর দ্বারা আত্মাতে ক্রিয়াসামান্যের নিষেধ দ্যোতিত হয়। ফলত নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার আত্মার 'ন মে' এর দ্বারা ভোগেচ্ছার নিষেধ এবং 'ন অহম্' এর দ্বারা কর্তৃত্বও প্রত্যাখ্যাত হয়। সুতরাং, তত্ত্বাভ্যাসের ফলে জাত এরূপ বিশুদ্ধ, কেবল বিবেকজ্ঞানই মোক্ষজনক।

তত্ত্বজ্ঞান বা তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের দ্বারা অবিবেক নষ্ট হয়। অতএব, বিবেকখ্যাতির দ্বারা যখন অবিদ্যা বা অবিবেক নষ্ট হয় তখন পুরুষ প্রকৃতি হতে নিজেকে এবং নিজ হতে প্রকৃতিকে ভিন্নরূপে দেখে। অর্থাৎ মুক্তি লাভ করে। এখন মুক্তিলাভে যেহেতু অবিদ্যাদির বিনাশ হয় সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই দেহাদিরও প্রসঙ্গ থাকে না। অথচ 'দৃষ্টা ময়া'... ইত্যাদি কারিকা[৯৭] থেকে স্পষ্ট হয় তত্ত্বসাক্ষাৎকারের পর পুরুষ উদাসীন হয়ে প্রকৃতিকে দর্শন করে। দর্শন ইন্দ্রিয়বৃত্তি আর ইন্দ্রিয়বৃত্তি দেহসাপেক্ষ। তাই প্রশ্ন হয় তত্ত্বজ্ঞানের পরেও দেহাদির প্রসঙ্গ কেন? উত্তরে বলতে হয়, তত্ত্বজ্ঞানের পরেই পুরুষ মুক্ত হয় না। এই মুক্তির প্রতিবন্ধক 'কর্ম' এবং সেই কর্মগুলি ক্ষয় না হওয়া অবধি অর্থাৎ সকল কর্মের নাশ না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি হয় না। বস্তুত সঞ্চিত, ক্রিয়মাণ ও প্রারব্ধ- এই তিন প্রকার কর্মের মধ্যে, অনাদিকাল হতে যা কৃত হয়েছে তা সঞ্চিত কর্ম, বর্তমানে যে কর্ম অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা ক্রিয়মাণ কর্ম ও যেসব কর্মের ফলভোগের জন্য এই দেহের সৃষ্টি হয়েছে সেইসব কর্ম প্রারব্ধ কর্ম। এগুলির মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে সঞ্চিত কর্মগুলি দগ্ধ হয় এবং ক্রিয়মাণ কর্মগুলি অনুষ্ঠিতই হয় না। অন্যদিকে প্রারব্ধ কর্মের আশয় চলতে থাকে। এখানে আপত্তির জায়গা এই যে কর্মের নাশ না হওয়া পর্যন্ত যদি মুক্তির প্রসঙ্গ উপস্থিত না হয়, তাহলে 'তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মুক্তি' প্রকৃতপক্ষে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কারণ কর্মের আশয় অনন্ত। ফলে কর্মের নাশও অনন্তকালব্যাপী। এরূপ আপত্তির সমাধানে বলা যায়, কর্মাশয় অনাদিসঞ্চিত একথা সর্বৈব সত্য। তবে তত্ত্বজ্ঞানের এমনই অমোঘপ্রভাব যে বীজ যেমন অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হলে অঙ্কুরোদ্গমে সক্ষম হয় না, তেমনই তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা দগ্ধ কর্ম ফলোৎপাদনে সমর্থ হয় না। অর্থাৎ কর্ম সাধারণত ফলোৎপাদন-শক্তিযুক্ত হলেও তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যাদির উচ্ছেদ হওয়ায় ঐ কর্ম আর কোনওদিনই ফলোৎপাদনে সক্ষম হয় না। অবশ্য প্রারব্ধ কর্মের আশয় চলতে থাকে বলে তত্ত্বজ্ঞানের অব্যবহিত পরেই মোক্ষলাভ হয় না। সংস্কার অবশিষ্ট থাকায় তত্ত্বজ্ঞানী শরীরধারণ করে কিছুদিন থাকেন। ঘট নির্মাণে ব্যবহৃত চক্র যেমন কার্যসিদ্ধির পরেও বেগবশত আরও কিছুক্ষণ ঘুরতে থাকে তেমনই তত্ত্বজ্ঞানীর শরীরও প্রারব্ধভোগের জন্য কিছুকাল অবস্থান করে। এইরূপ অবস্থা জীবন্মুক্ত। সাংখ্যকারিকাকার বলেছেন-

জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি

সম্যগ্‌জ্ঞানাধিগমাদ্ ধর্মাদীনামকারণপ্রাপ্তৌ।
তিষ্ঠতি সংস্কারবশাত্ চক্রভ্রমিবদ্‌ধৃতশরীরঃ।। [৯৮]

তাহলে যতদিন দেহ ততদিন প্রকৃত মুক্তি নয়। সংস্কারবশত দেহের বিনাশ না হলে পুরুষ যতই মুক্ত হোক সেই মুক্তিকে প্রকৃত মুক্তি বলা যায় না। টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র প্রশ্ন তুলেছেন, 'কদাঽস্য মোক্ষো ভবিষ্যতি?' অর্থাৎ প্রকৃত মুক্তি কখন হয়? সাংখ্যকারিকাকার নির্দেশ দিয়েছেন-

প্রাপ্তে শরীরভেদে চরিতার্থত্বাত্ প্রধানবিনিবৃত্তৌ
ঐকান্তিকমাত্যন্তিকমুভযং কৈবল্যমাপ্নোতি।।[৯৯]

অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্মের সংস্কারজন্য শরীর অবশিষ্ট থাকে। এই শরীরের প্রয়োজনীয়তা ভোগ এর চরিতার্থতা। সুতরাং ভোগ সমাপ্ত হয়ে গেলে শরীরের প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ায় শরীর বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অবশিষ্ট ভোগের নিবৃত্তি হয়ে গেলে এবং সকল প্রকার প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ায় প্রকৃতির আর প্রবৃত্তির প্রশ্ন ওঠে না। ফলত, পুরুষ সকল প্রকার দুঃখ হতে ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক মুক্তি লাভ করে।

২.৫. প্রচার-প্রসার ও অস্তিত্বের সংকট

ভারতীয় দর্শন-পরম্পরার একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য এই যে সবকটি সম্প্রদায় নিজেদের শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে এক একটি মহীরুহে পরিণত হয়েছে। এই ধারায় সাংখ্য সেই অর্থে মহীরুহ না হলেও দীর্ঘকালব্যাপী সর্বাধিক প্রচারিত ও প্রসারিত দর্শন, সেকথা দৃঢ়ভাবে বলা যায়। সাংখ্য যেহেতু দার্শনিক চিন্তায় প্রথম পদক্ষেপস্বরূপ, সেহেতু পরবর্তী সকল দর্শন সম্প্রদায় প্রয়োজনে নিজ নিজ যুক্তিশেলের লক্ষ্যবস্তুরূপে সাংখ্যকে স্বীকার করেছেন। এর থেকে অনুমান করা যায় সাংখ্যের মত একসময় এতই প্রসিদ্ধ ছিল যে চিন্তাবিদেরা স্বমত প্রতিস্থাপনের পূর্বে সাংখ্যমত খন্ডন করতে হয়েছে।
সাংখ্যের তত্ত্ব অতীব উপাদেয় ও সহজবোধ্য, যেকারণে মাঠরবৃত্তিতে ঘোষণা করা হয়েছে স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা প্রবাহের মধ্যে থেকেও সাংখ্যমতের উপলব্ধি সম্ভব এবং সেই উপলব্ধি থেকে মুক্তিলাভও সম্ভব-

হস পিব লল খাদ মোদ নিত্যং ভুঙ্‌ক্ষ্ব চ ভোগান্ যথাভিকামম্।
যদি বিদিতং তে কপিলমতং তত্‌প্রাপ্স্যসি মোক্ষসৌখ্যমচিরেণ।।[১০০]

সাংখ্যের তত্ত্ব জনসমাজে এতটাই স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য ছিল যে কবিরাও তাদের কাব্যবর্ণনায় উপমারূপে অবলীলাক্রমে মহৎ ও অব্যক্তের প্রসঙ্গ উপস্থিত করেছেন। মহাকবি কালিদাসের বয়ানে-

পযোধরৈঃ পুণ্যজনাঙ্গনানাং নির্বিষ্ট হেমাম্বুজরেণু যস্যাঃ
ব্রাহ্মং সরঃ কারণমাপ্তবাচো বুদ্ধেরিবাব্যক্তমুদাহরন্তি।[১০১]

কিংবা

দ্রবঃ সংঘাতকঠিনঃ স্থূলঃ সূক্ষ্মো লঘুর্গুরুঃ
ব্যক্তো ব্যক্তেতরশ্চাসি প্রাকাম্যং তে বিভূতিষু।[১০২]

মহাভারত, গীতা সর্বত্র সাংখ্যের এবং সাংখ্যপ্রণেতা মহর্ষি কপিলের যেভাবে উল্লেখ দেখা যায়, তাতে স্পষ্টই অনুমান হয় সাংখ্যের প্রচার ও প্রসার এককালীন ব্যাপকপরিধি জুড়ে হয়েছিল। বৌদ্ধদর্শন বিশেষজ্ঞ তথা অস্ট্রিয়ান অধ্যাপক Erich Frauwallner এর সাথে সহমত পোষণ করার লোভ সংবরণ না করে বলা যায়, সাংখ্য সম্প্রদায় ভারতীয় দর্শন পরম্পরায় সর্বাধিক প্রাচীন এবং সাংখ্যের দার্শনিক ভাবনা থেকেই বৌদ্ধ প্রমেয়তত্ত্ব, বৈশেষিক পরমাণুতত্ত্ব ও ন্যায় প্রমাণতত্ত্ব মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত। যদিও এরূপ মন্তব্য অতিরঞ্জনের সামিল।[১০৩] তবে শ্রীমদ্ অনির্বাণ মুক্তকণ্ঠেই ঘোষণা করেছেন যে বৌদ্ধভাবনার গোড়াতে সাংখ্যের প্রেরণাই সর্বাধিক- "বৌদ্ধভাবনার মূলে আছে সাংখ্যের প্রেরণা... সাংখ্যমত মূলত অবৈদিক হলেও অনার্য নয়। আর্যভাবনার দুটি মূল ধারা- একটি ঋষিপ্রবর্তিত, আরেকটি মুনিপ্রবর্তিত। কপিল মুনিধারার প্রবর্তক, তিনি সিদ্ধ, তাঁর দর্শন সাংখ্যদর্শন। বৃহদারণ্যকোপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ডটি খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায়, যাজ্ঞবল্ক্যের

অক্ষরব্রহ্মবাদে এই সাংখ্যভাবনা কতখানি অনুপ্রবিষ্ট। মুনিধর্ম এবং প্রব্রজ্যা দুইই তাঁর অঙ্গীকৃত; সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব তাঁর ব্রহ্মতত্ত্বের অঙ্গীভূত; সাংখ্যযোগের নাড়ীবিজ্ঞান তাঁর জানা; প্রত্যক্-দৃষ্টিতে তাঁর অক্ষর-ব্রহ্মবাদ এবং সাংখ্যের কৈবল্যবাদ একই মৌন-অনুভবের দুটি দিক”।[১০৪]

সব শেষের পর যেমন শুরু থাকে তেমনই সব শুরুরও শেষ থাকে। বহুল প্রচারিত সাংখ্যও কালে কালে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে মূলধারা হতে সরে আসতে থাকে। ব্রহ্মসূত্রপ্রণেতা বাদরায়ণ ব্যাস স্বমত স্থাপনে সাংখ্যের যুক্তি খন্ডনের আশ্রয় নিলেন এবং উক্ত সূত্রের ভাষ্যকার শংকরাচার্য তৎপ্রণীত ভাষ্যে ‘প্রধানমল্লনির্বহণ ন্যায়ে’ সাংখ্যের যুক্তিকে পরাস্ত করলেন। আশাবাদীর দৃষ্টিকোণ থেকে একথা বলা যেতে পারে যে সাংখ্যদর্শনের বক্তব্য জনমানসে এতটাই ব্যাপ্ত ছিল যে প্রতিবাদীর নিকট প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল সাংখ্যই। আবার একথাও ঠিক যে এরূপ ক্রমাগত আক্রমণে সাংখ্যের বিস্তৃত জমি ধীরে ধীরে তার উর্বরতা হারিয়ে ফসলহীন ভূমিতে পরিণত হওয়ায়, সাংখ্যের অস্তিত্বে সংকটের এক গভীর প্রশ্নচিহ্ন রেখে দিয়েছিল।

২.৬. উপসংহার

দার্শনিক চিন্তাভাবনার গোড়াপত্তনের কথা বললে অবশ্যই উপনিষদের প্রসঙ্গই প্রথম আপতিত হয়, তবে যুক্তিনির্ভর আলোচনার দিক থেকে সাংখ্যই একপ্রকার প্রথম পদক্ষেপ। পরবর্তী অন্বীক্ষায় তার অবদান সুদূরপ্রসারী। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ জুড়ে সাংখ্যের কীর্তির মতো অন্য কোনও দর্শনের বা শাস্ত্রের নেই। তাঁর কথায়, *... ভারতবর্ষে সাংখ্য যে কীর্তি করিয়াছে, তাহা অন্য দর্শন দূরে থাকুক, অন্য কোন শাস্ত্রের দ্বারা হইয়াছে কি না, সন্দেহ*।[১০৫] ষোড়শ শতাব্দীর সাংখ্যাচার্য বিজ্ঞানভিক্ষু এই মোক্ষশাস্ত্র সাংখ্যকে চিকিৎসাশাস্ত্রের সাথে তুলনা করেছেন। তাঁর মতে চিকিৎসাশাস্ত্রে যেমন রোগ-আরোগ্য-রোগনিদান-ভৈষজ্য এই চতুর্ব্যূহের আলোচনা তেমনই সাংখ্যশাস্ত্রে হেয়-হান-হেয়হেতু-হানোপায় এই চারটির প্রতিপাদন হয়েছে। ত্রিবিধ দুঃখই সেখানে হেয়, দুঃখত্রয়ের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই হান, প্রকৃতি-পুরুষ সংযোগজাত অবিবেকই হেয়হেতু এবং প্রকৃতি-পুরুষ বিবেকখ্যাতি বা ভেদজ্ঞানই হানোপায়।[১০৬] তাই সাংখ্য ভারতীয় দর্শনের কেবল একটি শাখা মাত্র- এরূপ বললে যথার্থ বিচার হয় না। বরং একথা বললে হয়তো অত্যুক্তি হয় না যে সাংখ্যই ভারতের দর্শন। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের ভাষায়- *Sāṁkhya is not one of the systems of Indian Philosophy. Sāṁkhya is the philosophy of India!*[১০৭] সুতরাং ভারতীয় দর্শনের পাঠে ও আলোচনে উৎসাহীর নিকট সাংখ্য অবশ্য-পাঠ্য।

@@@@@

উল্লেখপঞ্জি

[১] *পাণিনীয় ধাতুপাঠ*, ১০৩০

[২] Swami Prajnanananda, *Schools of Indian Philosophical thought*, Intro, p.1

[৩] ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *সাংখ্যদর্শন*, পৃ. ১৯

[৪] *শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্*, শাংকরভাষ্য (৫/২) (কপিলম্। বাসুদেবস্যাবতারভূতং সগরপুত্রাণাং দগ্ধারং ন তু সাংখ্যপ্রণেতা কপিলঃ)

[৫] পরমর্ষির্ভগবান্...বিশ্বাগ্রজঃ কপিলমুনিঃ [যদুপতি ত্রিপাঠি (সম্পা.), *যুক্তিদীপিকা*, পৃ. ৩৮৯]

[৬] ঈশ্বরকৃষ্ণ, *সাংখ্যকারিকা*, কারিকা ৭০, ৭১

[৭] *পাণিণীয় ধাতুপাঠ*, ১১৩২

[৮] জীবানন্দ বিদ্যাসাগর (সম্পা.), *মত্স্য পুরাণম্*, ৩/২৯

[৯] *বৈয়াসিক-মহাভারত* (বিশ্ববাণী সং), শান্তিপর্ব ২৯৮/৪২-৪৩, পৃ. ৩১৫৭

[১০] *তদেব*, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, ভারতকৌমুদী টীকা, পৃ. ৩১৫৮

[১১] A B Keith, *Samkhya System*, p-58 (Its special aim is the investigation and setting forth of the number of principles involved and their evolution from the absolute.)

[১২] যদুপতি ত্রিপাঠি (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, ভূমিকা, পৃ. ৪

[১৩] বিপদভঞ্জন পাল (সম্পা.), *সাংখ্যকারিকা*, প্রাক্কথন, পৃ. খ

[১৪] গুরুনাথ বিদ্যানিধি (সম্পা.), *অমরকোষ*, পৃ. ৫৫

[১৫] Wāsudev Laxman Shāstrī (ed.), *Śrīmadbhagavadgītā* with commentaries, p. 96

[১৬] Madanmohan Agrawal (ed.), *Śrīmadbhagavadgītā* with Madhusudana Sarasvatī's commentary, p. 152

[১৭] যদুপতি ত্রিপাঠি (সম্পা), *প্রাগুক্ত*, ভূমিকা, পৃ. ৪

[১৮] Damodar Lal Goswami (ed.), *Ṣaḍdarśanasamuccaya* of Haribhadrasuri (with the Commentary of Maṇibhadrasuri), p. 28

[১৯] P B Chakraborty, *Origin and development of Sankhya system of thought*, p. 3 ('Sankhya'(সাংখ্য) which posses for a philosophical system is derived from 'Sankhya' (সংখ্যা) that means knowledge, contemplation, examination, discussion, investigation, discrimination etcetera.)

[২০] শাস্ত্রৈকদেশসংবদ্ধং শাস্ত্রকার্যান্তরে স্থিতম্/ আহুঃ প্রকরণং নাম গ্রন্থভেদং বিপশ্চিতঃ। [বিপদভঞ্জন পাল (সম্পা.), *বেদান্তসার*, পৃ. ২৪]

[২১] ঈশ্বরকৃষ্ণ, *প্রাগুক্ত*, কারিকা ৭২

[২২] সেযং ষষ্টিপদার্থা কথিতেতি সকলশাস্ত্রার্থকথনান্নেদং প্রকরণমপি তু শাস্ত্রমেবেদমিতি সিদ্ধম্ [নারায়ণ গোস্বামী (সম্পা.), *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*, পৃ. ৩৬৭]

[২৩] সূত্রপ্রমাণাবযোবপদপত্তিরনূন্যনতা সংশযনির্ণযোক্তি/ উদ্দেশনির্দেশমনুক্রমশ্চ সংজ্ঞোপদেশাবিহ তন্ত্রসম্পত্ [যদুপতি ত্রিপাঠি (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫]

[২৪] অথ মতম্ সকলপদার্থসংগ্রহাত্তন্ত্রান্তরাণ্যেতানি এবমিহাপি সকলপদার্থসংগ্রহাত্তন্ত্রান্তরত্বমভ্যুপগন্তব্যম্। তস্মাদুক্তমেতত্তন্ত্রমিদম্। [*তদেব*, পৃ. ১৫]

[২৫] বিনা বিষযসম্বন্ধৌ তথৈবার্থাধিকারিণৌ/ অব্যাখ্যেযো ভবেদ্ গ্রন্থঃ স্যাদ্ গ্রন্থে তচ্চতুষ্টযম্ [পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু (সম্পা.), *সাংখ্যকারিকা*, মন্তব্য, পৃ. ৩]

[২৬] কুমারিল ভট্ট, *শ্লোকবার্তিক*, ১.১.১৭

[২৭] পুরুষমনুৰধ্নাতি স্বজ্ঞানেন প্রেরযতি ইত্যনুবন্ধঃ [K S Aiyer (Ed.), *Vedāntasāra* (with the commentary *Bālabodhinī* of Āpodeva), p. 2]

[২৮] তত্রানুবন্ধো নাম অধিকারিবিষযসংবন্ধপ্রযোজনানি [বিপদভঞ্জন পাল(সম্পা), *বেদান্তসারঃ*, পৃ. ২৪]

[২৯] ইহ খলু প্রতিপিত্সিতমর্থং প্রতিপাদযন্ প্রতিপাদযিতাবধেযবচনো ভবতি প্রেক্ষাবতাম্... [নারায়ণ গোস্বামী (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫]

[৩০] শারীরং বাতপিত্তশ্লেষ্মণাং বৈষম্যনিমিত্তম্। মানসং কামক্রোধলোভমোহভযের্ষ্যাবিষাদবিষযবিশেষাদর্শননিবন্ধম্। (*তদেব*, পৃ. ১০)

[৩১] তত্রাধিভৌতিকং মানুষপশুমৃগপক্ষিসরীসৃপস্থাবরনিমিত্তম্ (*তদেব*, পৃ. ১১)

[৩২] আধিদৈবিকং তু যক্ষরাক্ষসবিনাযকগ্রহাদ্যাবেশনিবন্ধনম্ (তত্রৈব)

[৩৩] শারীরদুঃখপ্রতীকারাযেষত্করা ভিষজাং বরৈরুপদিষ্টাঃ। মানসস্যাপি সন্তাপস্য প্রতীকারায মনোজ্ঞ-স্ত্রী-পান-ভোজন-বিলেপন-বস্ত্রালংকারাদিবিষযসম্প্রাপ্তিরুপাযঃ সুকরঃ (*তদেব*, পৃ. ১৬)

[৩৪] এবমাধিভৌতিকস্যাপি দুঃখস্য নীতিশাস্ত্রাভ্যাসকুশলতানিরত্যযস্থানাধ্যাসনাদিঃ প্রতীকারহেতুরীষত্করঃ (তত্রৈব)

[৩৫] আধিদৈবিকস্যাপি দুঃখস্য মণিমন্ত্রৌষধাদ্যুপযোগঃ সুকরঃ প্রতীকারোপায ইতি (তত্রৈব)

[৩৬] দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষযাতিশযযুক্তঃ (ঈশ্বরকৃষ্ণ, *প্রাগুক্ত*, কারিকা ২)

[৩৭] অবিশুদ্ধিঃ সোমাদিযাগস্য পশু ৰীজাদিবধসাধনতা। যথাহ স্ম ভগবান্ পঞ্চশিখাচার্যঃ স্বল্পঃ সংকরঃ সপরিহারঃ সপ্রত্যবমর্ষ ইতি। [নারায়ণ গোস্বামী (সম্পা.) *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪]

[৩৮] তদ্বিপরীতঃ শ্রেযান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাত্ (ঈশ্বরকৃষ্ণ, *প্রাগুক্ত*, কারিকা ২)

[৩৯] তদনযো প্রশস্যযোর্মধ্যে সত্ত্বপুরুষান্যতাপ্রত্যযঃ শ্রেযান্ [নারায়ণ গোস্বামী (সম্পা.) *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩]

[৪০] শ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরাণেভ্যো ব্যক্তাদীন্ বিবেকেন শ্রুত্বা শাস্ত্রযুক্ত্যা চ ব্যবস্থাপ্য দীর্ঘকালাদরনৈরন্তর্যসত্কারাসেবিতাদ্ ভাবনামযাদ্ বিজ্ঞানমিতি (*তদেব*, পৃ. ৩৫)

[৪১] Damodar Lal Goswami (ed), *Op.cit.*, p. 28

[৪২] ঈশ্বরকৃষ্ণ, *প্রাগুক্ত*, কারিকা ৩

[৪৩] অসন্দিগ্ধাবিপরীতানধিগতবিষয়া চিত্তবৃত্তিঃ...প্রমাণমিতি [নারায়ণ গোস্বামী (সম্পা.) *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০]

[৪৪] দৃষ্টমনুমানমাপ্তবচনং চ সর্বপ্রমাণসিদ্ধত্বাত্/ত্রিবিধং প্রমাণমিষ্টং প্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাদ্ধি (ঈশ্বরকৃষ্ণ, *প্রাগুক্ত*, কারিকা ৪)

[৪৫] অনুমানবিশেষান্ তন্ত্রান্তরলক্ষিতান্ অভিমতান্ স্মারয়তি, ত্রিবিধমনুমানমাখ্যাতমিতি [নারায়ণ গোস্বামী (সম্পা.) *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩]

[৪৬] শ্রুতিঃ বাক্যজনিতং বাক্যার্থজ্ঞানম্ (*তদেব*, পৃ. ৫৯)

[৪৭] অতিদূরাত্ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্মনোঽনবস্থানাত্/ সৌক্ষ্ম্যাদ্ব্যবধানাদ্ অভিভবাত্ সমানাভিহারাচ্চ (ঈশ্বরকৃষ্ণ, *প্রাগুক্ত*, কারিকা ৭)

[৪৮] মহদাদি তচ্চ কার্যং প্রকৃতিসরূপং বিরূপং চ (*তদেব*, কারিকা ৮)

[৪৯] অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাত্ সর্বসম্ভবাভাবাত্/ শক্তস্য শক্যকরণাত্ কারণাভাবাচ্চ সত্ কার্যম্ (*তদেব*, কারিকা ৯)

[৫০] সতোঽভিব্যক্তিরেবাবশিষ্যতে [নারায়ণ গোস্বামী (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪]

[৫১] এতদুক্তং ভবতি কার্যেণ কারণং কার্যস্য জনকং সংবন্ধস্য কার্যস্যাসতো ন সম্ভবতি তস্মাত্ সদিতি (*তদেব, পৃ*. ৯৬)

[৫২] অসত্ত্বে নাহস্তি সংবন্ধঃ কারণৈঃ সত্ত্বসঙ্গিভিঃ/অসংবন্ধস্য চোত্পত্তিমিচ্ছতো ন ব্যবস্থিতিঃ (তত্রৈব)

[৫৩] হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গম্/ সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং বিপরীতমব্যক্তম্ (ঈশ্বরকৃষ্ণ, *প্রাগুক্ত*, কারিকা ১০)

[৫৪] ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্মি/ ব্যক্তং তথা প্রধানং... (*তদেব*, কারিকা ১১)

[৫৫] অথবা সম্ভূয়কারিতাত্রাঽবিবেকিতা [নারায়ণ গোস্বামী (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯]

[৫৬] ভেদানাং পরিমাণাত্ সমন্বয়াচ্ছক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ/ কারণকার্যবিভাগাদবিভাগাদ্বৈশ্বরূপস্য (ঈশ্বরকৃষ্ণ, *প্রাগুক্ত*, কারিকা ১৫)

[৫৭] পরিণামস্বভাবা হি গুণা নাপরিণম্য ক্ষণমবতিষ্ঠন্তে [নারায়ণ গোস্বামী (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৪]

[৫৮] ঈশ্বরকৃষ্ণ, *প্রাগুক্ত*, কারিকা ১২

[৫৯] বাহ্য ও আধ্যাত্মিকভেদে তুষ্টি দুই প্রকার। যারা অব্যক্ত, মহৎ, অহংকার, ইন্দ্রিয় ও ভূতসমূহকে আত্মা মনে করেন এবং ঐগুলিরই উপাসনা করেন তারা বাহ্য তৌষ্টিক। পক্ষান্তরে, অব্যক্তাদি অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন যারা তারা হলেন আধ্যাত্মিক তৌষ্টিক। অতএব পূর্বপক্ষীরূপে এখানে বাহ্য তৌষ্টিকরাই গ্রাহ্য।

[৬০] সংঘাতপরার্থত্বাত্ ত্রিগুণাদিবিপর্যয়াদধিষ্ঠানাত্/ পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাত্ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ (ঈশ্বরকৃষ্ণ, *প্রাগুক্ত*, কারিকা ১৭)

[৬১] সুখদুঃখমোহাত্মকতয়াঽব্যক্তাদয়ঃ সর্বে সংঘাতাঃ [নারায়ণ গোস্বামী (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৭০]

[৬২] কৈবল্যমাত্যন্তিকদুঃখত্রয়প্রশমলক্ষণং... (*তদেব*, পৃ. ১৭৯)

[৬৩] জননমরণকরণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপত্প্রবৃত্তেশ্চ/ পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্যয়াচ্চৈব (ঈশ্বরকৃষ্ণ, *প্রাগুক্ত*, কারিকা ১৮)

[৬৪] ...সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্য পুরুষস্য/ কৈবল্যং মাধ্যস্থ্যং দ্রষ্টৃত্বমকর্তৃভাবশ্চ (*তদেব*, কারিকা ১৯)

[৬৫] *তদেব*, কারিকা ২১

[৬৬] *তদেব*, কারিকা ২২

[৬৭] *তদেব*, কারিকা ২৩

[৬৮] বিবেকজ্ঞানোপযোগিনস্তস্য ধর্মান্ সাত্ত্বিকতামসানাহ [নারায়ণ গোস্বামী (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১০]

[৬৯] ...ধর্মো জ্ঞানং বিরাগ ঐশ্বর্যম্/ সাত্ত্বিকমেতদ্রূপং তামসমস্মাদ্বিপর্যস্তম্ (ঈশ্বরকৃষ্ণ, *প্রাগুক্ত*, কারিকা ২৩)

[৭০] ...তস্মাদ্বিবিধঃ প্রবর্ততে সর্গঃ/ একাদশকশ্চ গণস্তন্মাত্রপঞ্চকশ্চৈব (*তদেব*, কারিকা ২৪)

[৭১] সাত্ত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ততে বৈকৃতাদহংকারাত্/ ভূতাদেস্তন্মাত্রঃ স তামসঃ তৈজসাদুভযম্ (তত্রৈব)

[৭২] বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চক্ষুঃশোত্রঘ্রাণরসনত্বগাখ্যানি (*তদেব*, কারিকা ২৬)

[৭৩] বাক্পাণিপাদপাযুপস্থানি কর্মেন্দ্রিয়াণ্যাহঃ (তত্রৈব)

[৭৪] উভযাত্মকমত্র মনঃ সংকল্পমিন্দ্রিয়ং চ সাধর্ম্যাত্ (*তদেব*, কারিকা ২৭)

[৭৫] শব্দাদিষু পঞ্চানামালোচনমাত্রমিষ্যতে বৃত্তিঃ (*তদেব*, কারিকা ২৮)

[৭৬] বচনাদানবিহরণোত্সর্গানন্দাশ্চ পঞ্চানাম্ (তত্রৈব)

[৭৭] পূর্বোত্পন্নমসক্তং নিযতং মহদাদিসূক্ষ্মপর্যন্তম্/ সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্ (*তদেব*, কারিকা ৪০)

[৭৮] চিত্রং যথাশ্রযমৃতে স্থান্বাদিভ্যো বিনা যথেচ্ছাযা/ তদ্বদ্বিনা বিশেষৈর্ন তিষ্ঠতি নিরাশ্রযং লিঙ্গম্ (*তদেব*, কারিকা ৪১)

[৭৯] ততঃ সত্যবতঃ কাযাত্ পাশবদ্ধং বশং গতম্/ অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ বলাদ্যমঃ (*বৈয়াসিক-মহাভারত* (বিশ্ববাণী সং), বনপর্ব ১৫২/১৫, পৃ. ২৪৩৪)

[৮০] অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদযে সংনিবিষ্টঃ/ তং স্বাচ্ছরীরাত্ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্যেণ (কঠ উপনিষদ, ২/৩/১৭)

[৮১] ...নটবদ্ব্যবতিষ্ঠতে লিঙ্গম্ (ঈশ্বরকৃষ্ণ, *প্রাগুক্ত*, কারিকা ৪২)

[৮২] ধর্মেণ গমনমূর্ধ্বং গমনমধস্তাদ্ভবত্যধর্মেণ/ জ্ঞানেন চাপবর্গো বিপর্যযাদিষ্যতে বন্ধঃ (*তদেব*, কারিকা ৪৪)

[৮৩] বৈরাগ্যাত্ প্রকৃতিলযঃ সংসারো ভবতি রাজসাদ্রাগাত্/ ঐশ্বর্যাদবিঘাতো বিপর্যযাত্তদ্বিপর্যাসঃ (*তদেব*, কারিকা ৪৫)

[৮৪] এষ প্রত্যযসর্গো বিপর্যযাশক্তিতুষ্টিসিদ্ধাখ্যঃ (*তদেব*, কারিকা ৪৬)

[৮৫] পঞ্চ বিপর্যযভেদা ভবন্ত্যশক্তিশ্চ করণবৈকল্যাত্। অষ্টাবিংশতিভেদা তুষ্টির্নবধাঽষ্টধা সিদ্ধিঃ।। (*তদেব*, কারিকা ৪৭)

[৮৬] অষ্টবিকল্পো দৈবস্তৈর্যগ্যোনশ্চ পঞ্চধা ভবতি/ মানুষকশ্চৈকবিধঃ সমাসতো ভৌতিক সর্গঃ (*তদেব*, কারিকা ৫৩)

[৮৭] তত্র জরামরণকৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ (*তদেব*, কারিকা ৫৫)

[৮৮] ইত্যেষ প্রকৃতিকৃতো মহদাদিবিশেষভূতপর্যন্তঃ (*তদেব*, কারিকা ৫৬)

[৮৯] মহদাদি ভূতান্তঃ প্রকৃত্যৈব কৃতো নেশ্বরেণ ন ব্রহ্মোপাদানঃ নাপ্যকারণঃ... [নারায়ণ গোস্বামী (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৯]

[৯০] প্রতিপুরুষবিমোক্ষার্থং স্বার্থ ইব পরার্থ আরম্ভঃ (ঈশ্বরকৃষ্ণ, *প্রাগুক্ত*, কারিকা ৫৬)

[৯১] *তদেব*, কারিকা ৫৭

[৯২] *তদেব*, কারিকা ৫৯

[৯৩] *তদেব*, কারিকা ৬২

[৯৪] তত্রৈব

[৯৫] রূপৈঃ সপ্তভিরেব তু বধ্নাত্যাত্মানমাত্মনা প্রকৃতিঃ/ সৈব চ পুরুষার্থং প্রতি বিমোচযত্যেকরূপেণ (*তদেব,* কারিকা ৬৩)

[৯৬] তত্ত্ববিষযজ্ঞানাভ্যাসাদ্ আদর-নৈরন্তর্য-দীর্ঘকালসেবিতাত্ সত্ত্বপুরুষান্যতাসাক্ষাত্কারি জ্ঞানমুত্পদ্যতে যদ্বিষযশ্চাভ্যাসস্তদ্বিষযকমেব সাক্ষাত্কারমুপজনযতি, তত্ত্ববিষযশ্চাভ্যাস ইতি তত্ত্বসাক্ষাত্কারং জনযতি। [নারায়ণ গোস্বামী (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৮]

[৯৭] দৃষ্টা মযেত্যুপেক্ষক একো দৃষ্টাহমিত্যুপরমত্যন্যা/সতি সংযোগেহপি তযোঃ প্রযোজনং নাস্তি সর্গস্য (ঈশ্বরকৃষ্ণ, *প্রাগুক্ত*, কারিকা ৬৬)

[৯৮] *তদেব,* কারিকা ৬৭

[৯৯] *তদেব,* কারিকা ৬৮

[১০০] মাঠরবৃত্তি

[১০১] কালিদাস, *রঘুবংশম্,* ১৩/৬০

[১০২] কালিদাস, *কুমারসম্ভবম্,* ২/১১

[১০৩] It is tempting to suggest with Frauwallner that this Sāṁkhya Philosophical tradition is the oldest of the technical schools of Indian Philosophy (Hindu, Buddhist or Jain) and that Buddhist Ontology, Vaiśṣika atomism and Nyāya epistemology may all have arisen out of an earlier Sāṁkhya philosophical environment but this is perhaps to claim too much. (Encyclopedia of Indian Philosophies, Vol. IV, Ed. Larson & Bhattacharya, p. 11)

[১০৪] অনির্বাণ, *বেদ মীমাংসা*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৯০

[১০৫] বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ সংস্করণ), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২২১

[১০৬] তদিদং মোক্ষশাস্ত্রং চিকিত্সাশাস্ত্রবচ্চতুর্ব্যূহম্। যথা হি রোগ আরোগ্যং ভৈষজ্যমিতি চত্বারো ব্যূহাঃ সমূহাশ্চিকিত্সাশাস্ত্রস্য প্রতিপাদ্যাস্তথৈব হেযং হানং হেযহেতুঃ হানোপাযশ্চেতি চত্বারো ব্যূহা মোক্ষশাস্ত্রস্য প্রতিপাদ্যা ভবন্তি মুমুক্ষুর্ভিজিজ্ঞাসিতত্বাত্। তত্র ত্রিবিধং দুঃখং হেযম্ তদত্যন্তনিবৃত্তির্হানম্ প্রকৃতিপুরুষসংযোগদ্বারা চাবিবেকো হেযহেতুঃ বিবেকখ্যাতিস্তু হানোপায ইতি। [রামশংকর ভট্টাচার্য (সম্পা.) *সাংখ্য দর্শন* (বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত ভাষ্য-সমেতম্), পৃ. ৮]

[১০৭] Encyclopedia of Indian Philosophies, Vol. IV, Ed. Larson & Bhattacharya, Preface, p. xi

ж ж ж ж ж

তৃতীয় অধ্যায়

"যাহা প্রাচীন, তাহাই যে উপধর্মকলঙ্কিত বা সর্বজনপরিজ্ঞাত, এমন মনে করিবেন না। বিবেচক দেখিবেন, সাংখ্যদর্শনে একটু সারও আছে। অসার বৃক্ষে এমন স্থায়ী ফল ফলিবে কেন?"

– বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ সংস্করণ), দ্বিতীয় খন্ড, *সাংখ্যদর্শন*

বঙ্কিম–ভাবনায় সাংখ্যদর্শন

"স্পষ্টাক্ষরে বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীতে যে সকল দর্শনশাস্ত্র অবতীর্ণ হইয়াছে, সাংখ্যের ন্যায় কেহ বহু ফলোৎপাদক হয় নাই।"

– বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ সংস্করণ), দ্বিতীয় খন্ড, *সাংখ্যদর্শন*

৩.০. ভূমিকা

সাহিত্যে হোক, শিল্পে হোক, বা সংস্কৃতিতে; নবজাগরণ প্রকৃতপক্ষে চিন্তার। বস্তুত চিন্তাধারার পরিবর্তনই ঐ ঐ ক্ষেত্রগুলিতে নতুনতার জোয়ার নিয়ে আসে। যা দীর্ঘকাল আবৃত হয়ে আছে পুরানো পলেস্তারার আস্তরণে, সেই খোলনলচে পাল্টে নতুন বুনোটে আঁটোসাঁটো করে রাখতে সাহায্য করে। এই পুণ্য বঙ্গভূমিতেও সাহিত্যে, শিল্পে তথা সংস্কৃতিতে নবজাগরণের জোয়ার দু কূল প্লাবিত করে প্রত্যেকটি স্তরের উষর মৃত্তিকায় উর্বর পলির সঞ্চার করেছিল। আর এক একজন বঙ্গরতন, কখনও সাহিত্যিকরূপে, কখনও বা সমাজসংস্কারক রূপে, কখনও বা ব্যক্তি হিসেবে, সেই মৃত্তিকায় নিজ নিজ মতাদর্শের জোগান দিয়ে জনকল্যাণের ফসল ফলিয়েছেন। যার পরিণতিরূপে সমাজ ও সাহিত্য সুদীর্ঘকাল জুড়ে বেঁচে থাকার ও এগিয়ে যাওয়ার রসদ পেয়েছে। বঙ্গজননীর ক্রোড় আলো করে জন্মানো এই মহাপুরুষদের মধ্যে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন অন্যতম, যিনি পরবর্তীকালের সমাজ ও জনজীবনের চিন্তাস্রোতকে ব্যাপকভাবে ত্বরান্বিত করেছিলেন।

৩.১. ব্যক্তিজীবন ও কর্মজীবন

১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জুন অবিভক্ত বাংলার চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত কাঁটালপাড়ায় এই মহান ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মাতা দুর্গাসুন্দরী দেবী। তাঁর অন্যান্য ভ্রাতা-ভগিনী গুলির মধ্যে ছিলেন শ্যামাচরণ, নন্দরাণী, সঞ্জীবচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র। শৈশব থেকেই ক্ষুরধার বুদ্ধির অধিকারী বালক বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুরে ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে ছয় বৎসর বয়সে সেখানকার ইংরাজি স্কুলে ভর্তি হন। সেই সময়ে 'সখা' নামে এক মাসিক পত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের শৈশবজীবনের একটি মজার ঘটনা পাওয়া যায়- "ইঁহার পিতা যখন মেদিনীপুরের ডেপুটি ছিলেন, সেই সময় ইঁহাকে সেখানকার ইংরাজি স্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। সেখানকার শিক্ষকেরা ইঁহাকে স্কুলে পাইয়া কৌতুক দেখিতে লাগিলেন। বালককে পুরা এক বৎসর এক শ্রেণীতে রাখিতে হয় না। প্রতি ছয় মাস অন্তর এক এক ক্লাশ উপরে উঠাইয়া দিতে হয়, তবুও বালক যে ক্লাশেই উঠে, সেই ক্লাশেই সবার উপর হয়"।[১]

ঘটনাটি মজার হলেও তার ব্যাপ্তি বড়ই গভীর কারণ এই বিবরণ সেই মহান জীবনীর সূচনা পর্বের একটি দিগ্-নির্দেশক মাত্র। সেই যাত্রা পরবর্তীতে এক অসীমে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার এই পর্যায় সম্পন্ন করে ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি হুগলি কলেজের বিদ্যালয় বিভাগে প্রবেশ করেন। পরে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে ঐ কলেজেরই কলেজ বিভাগে ভর্তি হন। যদিও ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে আইন পড়ার জন্য তিনি হুগলি কলেজ হতে প্রেসিডেন্সি কলেজে আসেন। এরপর কলেজ জীবনের প্রথাগত শিক্ষা শেষ হলে তিনি বেশ কিছু কাল শ্রীরাম শিরোমণির নিকট সংস্কৃত সাহিত্যের পাঠ গ্রহণ করেন বলে জানা যায়।

১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসের দিকে শুরু হয় তাঁর কর্মজীবন। তৎকালীন লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নরের আদেশে যশোরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টররূপে তিনি নিযুক্ত হন। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় এই সংবাদটি প্রকাশিত হতেও দেখা যায়- "অবগত হইল উক্ত বহুগুণযুক্ত মহাশয়কে বেঙ্গল গবর্নমেন্ট হইতে যশোহর জিলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে অভিষিক্ত করণের অনুমতি হইয়াছে, বঙ্কিমবাবু অতিশয় সদ্বিদ্বান, সুবীর, বিচার কার্যে যে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা প্রকাশ পাইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, আমরা বঙ্কিমবাবুকে বিশিষ্টরূপে অবগত আছি, গবর্নমেন্ট বঙ্কিমবাবুকে ডেপুটি

ম্যাজিস্ট্রেট পদাভিষিক্ত করাতে অতিশয় সুবিবেচনার কার্য করিয়াছেন, এই প্রকার ব্যবহার দ্বারাই যথার্থ পক্ষে গুণের গৌরব প্রকাশ পায়”।[২]

এরপর কর্মস্থলের বেশ কয়েকবার স্থানান্তর ঘটে তাঁর জীবনে। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে অবিভক্ত মেদিনীপুরের নেগুয়াঁতে (কাঁথি মহকুমা), আবার ঐবছরই নভেম্বর মাসে খুলনা জেলায়, পরে ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে বারুইপুরে ও ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের দিকে প্রথমে আলিপুর ও পরে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে বদলি হয়ে আসেন। তবে তাঁর কর্মব্যস্ত জীবনের প্রকৃত অর্থেই সূচনা হয় 'বঙ্গদর্শন যুগ' হতে অর্থাৎ ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে কারণ এই সময় থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের সুযোগ্য পরিচালনায় সাহিত্য পত্রিকা 'বঙ্গদর্শনে'র মাসিক প্রকাশ হতে থাকে। মাঝখানে একবছর (১৮৭৯খ্রিস্টাব্দ) বাদ দিলে, একেবারে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ অবধি বঙ্গদর্শনের প্রায় দশবছর ব্যাপী প্রচার ও প্রসার বিদ্যমান ছিল। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে বঙ্গদর্শনের দীর্ঘ পরিক্রমার অবসান হলে ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দ অবধি 'নবজীবন' ও 'প্রচার' নামক দুই মাসিক পত্রিকায় তাঁর কর্মব্যস্ততা বজায় থাকে।

অতঃপর শরীর ও স্বাস্থ্যের অবনতির কারণে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ তিনি কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর সরকারের তরফে ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে 'রায় বাহাদুর' ও ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে 'সি আই এ' অর্থাৎ 'কম্প্যানিয়ন অফ দি ইন্ডিয়ান এম্পায়ার' উপাধিতে ভূষিত হন। জীবন সায়াহ্নে এসে এই সম্মান প্রাপ্তি ঘটেছিল তাঁর। অবশ্য ক্রমে ক্রমে তাঁর স্বাস্থ্যের ভগ্নদশা প্রকট হয়। ঐবছরই এপ্রিল মাসের দিকে শারীরিক অবস্থার ক্রমাবনতি হতে হতে ৮ই এপ্রিল ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

৩.২. রচনাসম্ভার

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী থেকে যে ভাষার ফুলবন সৃষ্ট হয়েছিল, সেই ফুলবনের একএকটি ফুলস্বরূপ তৎপ্রণীত উপন্যাস ও প্রবন্ধপুস্তক গুলি। বাংলা গদ্যসাহিত্যকে তার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে তিনি এক দীর্ঘ সৌষ্ঠব দান করেছিলেন। স্বভাবকবি গোবিন্দ চন্দ্র দাস তাঁর রচিত শোকগাথায় যথার্থই বলেছিলেন–

প্রতিভার দীপ্তরবি বাঙ্গালীর মহাকবি
কেন অস্ত যাও আজ অগস্ত্য–গমনে।
ঢালিয়া আঁধার ঘন ভাষা–ফুলবনে?

বিশেষত গদ্য রচনাগুলিকেই নির্দেশ করে তাঁর রচনাসম্ভারে উপন্যাস ও প্রবন্ধ গ্রন্থগুলির কথা উল্লেখ করতে হয়। উপন্যাস গুলির মধ্যে উল্লেখ্য– 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫), 'কপালকুন্ডলা' (১৮৬৬), 'মৃণালিনী' (১৮৬৯), 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩), 'ইন্দিরা' (১৮৭৩), 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪), 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫), 'রাধারাণী' (১৮৭৭), 'রজনী' (১৮৭৭), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮), 'রাজসিংহ' (১৮৯৩), 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) , 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪), 'সীতারাম' (১৮৮৭)। অপরদিকে, প্রবন্ধ গ্রন্থগুলির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখ্য– 'লোকরহস্য' (১৮৭৪), 'কমলাকান্ত'(১৮৭৫–১৮৮৫) [কমলাকান্তের দপ্তর, কমলাকান্তের পত্র, কমলাকান্তের জোবানবন্দী], 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' (১৮৮৪), 'বিজ্ঞানরহস্য' (১৮৭৫), 'বিবিধ প্রবন্ধ' [প্রথম ভাগ (১৮৮৭) ও দ্বিতীয় ভাগ (১৮৯২)], 'সাম্য' (১৮৭৯), 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৯২), 'ধর্মতত্ত্ব' (১৮৮৮), 'শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা' (১৯০২), 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম' (১৯৩৮)।

এগুলি ছাড়াও বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকা (যেমন, দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলীর ভূমিকা), পত্রাবলী (মূলত কালীপ্রসন্ন ঘোষ, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, গিরিজাপ্রসন্ন রায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়-কে লিখিত), সহজ রচনা শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক, বিবিধ গদ্য বা কবিতাপুস্তক তিনি রচনা করেছিলেন।

৩.৩. প্রবন্ধসাহিত্য ও বঙ্কিমচন্দ্র

প্রবন্ধ কাকে বলে? এই প্রশ্নের কোনও চটজলদি উত্তর দেওয়া কঠিন ব্যাপার কারণ কাব্য, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি সাহিত্যরূপগুলির যেমন একটি নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট লক্ষণ আছে, প্রবন্ধের সেইরূপ সুস্পষ্ট লক্ষণ নির্দেশ করা যায় না। একেবারে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরলে প্র–√বন্ধ্ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন প্রবন্ধ শব্দে বোঝায় প্রকৃষ্ট বন্ধন বা সংযোগ। কিন্তু এই বন্ধন কার? বন্ধন তো গদ্য–পদ্য উভয়প্রকার রচনারই মূল। তাহলে কি ছন্দের বন্ধনে বা সর্গ অধ্যায়াদির বন্ধনে বা বিষয়বস্তুর বন্ধনে বা বর্ণনার পারম্পর্য বন্ধনে ইত্যাদি বিবিধ বন্ধনে সুসংবদ্ধ রচনাই প্রবন্ধ?

অনেকে মনে করেন, একটি বিষয় যখন স্বল্পকথায় যুক্তিশৃঙ্খলভাবে প্রকাশিত হয়ে বক্তব্যকে পেশ করে, তখন তাকে বলে প্রবন্ধ।[৩] আবার অনেকে এরূপ ধারণা পোষণ করেন, "সাধারণতঃ কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া লেখক যখন কোনো ভাব বা বিষয় যুক্তিযুক্ত ও সংযতভাবে বা পরিপাটিরূপে গ্রন্থন করেন এবং প্রধানতঃ সরস গদ্যরীতিতে ও দীর্ঘ বা অনতিদীর্ঘ পরিসরে তাহার প্রকাশভঙ্গি নিয়মিত করেন তখনই তাহাকে প্রবন্ধ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে"।[৪]

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা হতে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ অবধি এক দীর্ঘ সময় জুড়ে বিস্তৃত হয়ে যোগ্য স্থান লাভ করেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে বিষয় ও ভাবশৃঙ্খল গদ্যরচনার সূত্রপাত হলেও 'প্রস্তাব' শব্দের ব্যবহারই তৎকালে রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীরা করেছেন। পরবর্তীকালে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম এই 'প্রবন্ধ' শব্দটির উল্লেখ করেন এবং আরও পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রের বহুল প্রয়োগে প্রবন্ধ শব্দটি সাবলীলতা অর্জন করে। অবশ্য বাংলা গদ্যের বিকাশে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালিপ্রসন্ন সিংহের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা সাহিত্যে রামমোহন রায় হলেন প্রথম লেখক, যিনি আধুনিক গদ্যরচনায় নিবিষ্ট ছিলেন। তাঁর সেই মননশীল রচনায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যোগ করলেন শৃঙ্খলা, পরিণতিবোধ ও অবিচ্ছিন্ন ধ্বনিপ্রবাহ। প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালিপ্রসন্ন সিংহ অবশ্য লোকজীবনের কথ্য ভাষাকে সাহিত্যের ভাষার রূপ দিয়েছিলেন। তবে বিদ্যাসাগর ও তৎপরবর্তী গদ্যরচনাভঙ্গীর সর্বোৎকৃষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায়।

একেবারে প্রাথমিক স্তরে, প্রবন্ধকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে– বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধ ও ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। ব্যক্তিগত প্রবন্ধে আত্মগত দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যক্তিহৃদয়েরই প্রাধান্য। অপরদিকে বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধে বিষয়বস্তুর প্রাধান্যই মুখ্য। এই বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধগুলিকে আবার আপাতভাবে চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে– বিবৃতিমূলক (যেমন ঐতিহাসিক বা সাময়িক ঘটনাশ্রিত), বর্ণনামূলক (যেমন রাষ্ট্র, সমাজ বা বিজ্ঞানাশ্রিত), তত্ত্বমূলক (যেমন ধর্ম, দর্শনাশ্রিত) ও ব্যাখ্যামূলক (যেমন শিক্ষা, সাহিত্যাশ্রিত)। এখন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধগ্রন্থগুলির দিকে নজর দেওয়া যাক– 'লোকরহস্য', 'বিজ্ঞান-রহস্য', 'কমলাকান্ত' (কমলাকান্তের দপ্তর, কমলাকান্তের পত্র, কমলাকান্তের জোবানবন্দী), 'বিবিধ সমালোচনা', 'সাম্য', 'প্রবন্ধ-পুস্তক', 'কৃষ্ণচরিত্র', 'বিবিধ-প্রবন্ধ ১', 'ধর্মতত্ত্ব', 'বিবিধ-প্রবন্ধ ২', 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত'। এগুলির প্রকাশকাল ১৮৭৪ থেকে ১৮৮৮ সালের মধ্যে। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থগুলির বেশিরভাগ বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধ।

মোটামুটিভাবে আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে চারটি পর্বে ভাগ করা যায়– রামমোহন পর্ব, অক্ষয়–ঈশ্বর পর্ব, বঙ্কিম পর্ব ও রবীন্দ্র পর্ব। এর মধ্যে বঙ্কিম পর্বটিই এখানে আলোচনীয় কারণ সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় সবদিক থেকেই এই পর্বটি অধিকতর দীপ্তিময়। সুগভীর পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণ বিচার–বিশ্লেষণ, মননশীলতার পরাকাষ্ঠা প্রতিভাসিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধগুলিতে এবং এর প্রভাব স্পষ্ট ঐ পর্বের বঙ্কিম পরবর্তী প্রাবন্ধিকদের রচনাতেও। যুগধর্মের প্রভাবে তাঁর প্রবন্ধগত বক্তব্য একদিকে যেমন অভিনব ভাব ও ভঙ্গিমার প্রকাশক, তেমনই তা সঞ্জীবনীসুধা স্বরূপ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চেতনাকে এক নতুন কলেবরে পরিবেশন করে জাতিকে অদম্য জীবনীশক্তি ও আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে তাঁর রচনা। আরও স্পষ্ট করে বললে, পাশ্চাত্যের জীবনবাদ ও প্রাচ্যের অধ্যাত্মবাদ বঙ্কিম–প্রবন্ধে এক সমন্বয়ের সূত্রে আবদ্ধ হয়ে প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্রকে আলাদামাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে।

৩.৪. বঙ্কিম–দৃষ্টিকোণে 'সাংখ্যদর্শন'

ভারতীয় আস্তিকদর্শন পরম্পরার একেবারে প্রথম প্রচেষ্টাস্বরূপ যে সাংখ্যমত বা সাংখ্যদর্শন, সেই সাংখ্যের উপর সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন। এর প্রমাণ 'সাংখ্যদর্শন' প্রবন্ধ। যদিও প্রবন্ধের উপক্রমণিকায় প্রাবন্ধিকের এতাদৃশ মনোযোগ কিঞ্চিৎ অভিযোগের সুরেই– "এদেশীয় প্রাচীন দর্শন সকলের মধ্যে বঙ্গদেশে ন্যায়ের প্রাধান্য। দেশীয় পন্ডিতেরা সচরাচর সাংখ্যের প্রতি তাদৃশ মনোযোগ করেন না"।[৫] প্রাবন্ধিকের অভিযোগ অমূলক নয়। সাংখ্যের প্রধানসারির ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে বঙ্গদেশীয় পন্ডিত খুঁজে পাওয়া সত্যিই দুষ্কর। তবুও অন্যান্য দর্শন–পরম্পরার মত সাংখ্য তার প্রাচীনত্বের শিরোপা নিয়ে বিদ্যমান। এই প্রাচীনতা সাংখ্যের অসারতা নয়, সুবিস্তৃত দর্শনারণ্যে প্রোথিত বনস্পতির পরিচায়ক। প্রাবন্ধিক যথার্থই বলেছেন– "যাহা প্রাচীন, তাহাই যে উপধর্মকলঙ্কিত বা সর্বজনপরিজ্ঞাত, এমন মনে করিবেন না। বিবেচক দেখিবেন, সাংখ্যদর্শনে একটু সারও আছে। অসার বৃক্ষে এমন স্থায়ী ফল ফলিবে কেন"?[৬] যাইহোক, প্রাবন্ধিকের এই উদ্যোগ স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্য পরিসরে বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে।

৩.৪.১. ভারতবর্ষে সাংখ্যের গতিপথ

নানা বেশ, নানা ভাষা, নানা জাতি, নানা পরিধানের সমাবেশস্থল এই ভারতভূমিতে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐকতানের খোঁজ চলতেই থাকবে কিন্তু বর্তমান সমাজের পূর্বকালীয় গতির পরিচয় পেতে হলে এবং সেই সমাজের সামাজিকদের চরিত্রের অনুসন্ধান করতে হলে সাংখ্যদর্শন সম্যক্‌রূপে বুঝতে হবে কারণ সাংখ্য প্রদর্শিত পথেই সেই স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল। দুঃখময় এই সংসারে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিতেই মুক্তি সম্ভব– সাংখ্যের এই বাণী যেদিন প্রচারিত হয়েছিল, সেদিনই বৈরাগ্যের প্রাবল্য লোকপ্রবাহে দুকূল ছাপিয়ে গিয়েছিল। শুনতে পাই না 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়', বরং দেখতে পাই ব্যাপক 'বৈরাগ্যপ্রাবল্য'। প্রাবন্ধিকের মতে সেই বৈরাগ্যপ্রাবল্যই বর্তমান ভারতীয় সমাজ বা আরও স্পষ্ট করে বললে হিন্দুসমাজ।

প্রাবন্ধিকের ধারণা, হিন্দুসমাজের চরিত্র বোঝাতে যে 'কার্য্যপরতন্ত্রতা' ও 'অদৃষ্টবাদিত্বে'র কথা বলা হয়, সেই দুটিই সাংখ্যপ্রদর্শিত বৈরাগ্যপ্রাবল্যের সাধারণতা ও ভিন্নমূর্তি মাত্র– "যে কার্য্যপরতন্ত্রতার অভাব আমাদিগের প্রধান লক্ষণ বলিয়া বিদেশীয়েরা নির্দেশ করেন, তাহা সেই বৈরাগ্যের সাধারণতা মাত্র। যে অদৃষ্টবাদিত্ব আমাদিগের দ্বিতীয় প্রধান লক্ষণ, তাহা সাংখ্যজাত বৈরাগ্যের ভিন্ন মূর্তি মাত্র"।[৭] বস্তুত বৈরাগ্যপ্রাবল্য যেমন কর্মে উদাসীনতার কথা বলে তেমনই নিষ্কাম কর্মের

দিকেও ইঙ্গিত করে। তাই সমাজের 'কার্য্যপরতন্ত্রতা'ই সাংখ্য প্রদর্শিত বৈরাগ্যের সাধারণতা, এই সিদ্ধান্ত পুনরালোচনীয়। অন্যদিকে আরও গুরুতর অভিযোগ এই যে বৈরাগ্যসাধারণতা ও অদৃষ্টবাদিত্ব এই দেশে সমাজোন্নতিতে প্রধান প্রতিবন্ধক।

সমাজ ও চরিত্রের পটপরিবর্তন

প্রাবন্ধিকের শ্লেষ– "এই বৈরাগ্যসাধারণতা এবং অদৃষ্টবাদিত্বের কৃপাতেই ভারতবর্ষীয়দিগের অসীম বাহুবল সত্ত্বেও আর্য্যভূমি মুসলমান পদানত হইয়াছিল। সেই জন্য অদ্যাপি ভারতবর্ষ পরাধীন। সেই জন্যই বহুকাল হইতে এ দেশে সমাজোন্নতি মন্দ হইয়া শেষে অবরুদ্ধ হইয়াছিল"।[৮] কিন্তু একথা সত্য যে চলমান এই সংসারে প্রত্যেকেই দুঃখের অধীন। সেই দুঃখ হতে সর্বপ্রকার নিবৃত্তিতেই নিজেকে জানার ও চেনার পথ। তাৎপর্যপূর্ণভাবে সংসারের এই দুঃখময়তার কথা সাংখ্যের কল্যাণেই ভারতীয় সমাজে সুবিদিত– "সংসার যে দুঃখময়, দুঃখ নিবারণমাত্র আমাদিগের পুরুষার্থ, একথা যেমন হিন্দুজাতির হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে, এমন বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন জাতির মধ্যে হয় নাই। তাহার বীজ সাংখ্যদর্শনে"।[৯]

ভারতবর্ষের তান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের ধারা যে পরিমাণ অগ্রসর হয়েছে, সেই গতিপথের মূলে সাংখ্যের প্রকৃতি–পুরুষ। আজ শক্তির আরাধনা থেকে শুরু করে দেশব্যাপী যে তন্ত্রসাধনার বিস্তার, তার মূলে কিন্তু সাংখ্য। প্রাবন্ধিক তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সাথে এই বিস্তৃতির কথা প্রকাশ করেছেন– "সেই তন্ত্রের কৃপায় বিক্রমপুরে বসিয়া নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ঠাকুর অপরিমিত মদিরা উদরস্থ করিয়া, ধর্মাচরণ করিলাম বলিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতেছেন। সেই তন্ত্রের প্রভাবে প্রায় শত যোজন দূরে ভারতবর্ষের

তন্ত্রের সাংখ্যমূলকত্ব

পশ্চিমাংশে কাণফোঁড়া যোগী উলঙ্গ হইয়া কদর্য্য উৎসব করিতেছে। সেই তন্ত্রের প্রসাদে আমরা দুর্গোৎসব করিয়া এই বাঙ্গালা দেশের ছয় কোটি লোক জীবন সার্থক করিতেছি"।[১০] এই প্রভাব কতখানি ভালো বা খারাপ সে বিচারের জায়গা অন্যত্র কিন্তু প্রভাবের মাত্রা যে অনেকখানি সেবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তন্ত্র যে সৃষ্টিতত্ত্বের কথা বলে সেখানে পুরুষ ও প্রকৃতি নিয়েই সৃষ্টি এবং সেই সৃষ্টিলীলাতে সর্বব্যাপীরূপে নিত্য, অচল, স্থাণু, সনাতন পুরুষ বিরাজমান। সেই পুরুষ শুধুমাত্র বিরাজমান, তাঁর চতুর্দিকে বেষ্টন করে প্রকৃতি সৃষ্টির লীলাখেলা করছেন। *শ্রীশ্রীচণ্ডী*তে বলা হয়েছে– *বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে/ তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোহস্য জগন্ময়ে*।[১১] তন্ত্রে প্রকৃতির দুটি ভাগ স্বীকার করা হয়েছে– মূলা প্রকৃতি ও সৃষ্টি প্রকৃতি। মূলা প্রকৃতি অব্যক্তা এবং তার থেকেই সৃষ্টি প্রকৃতি প্রকাশিত। তন্ত্রের এই সৃষ্টিতত্ত্ব অনেকখানি সাংখ্যানুসারী।[১২] দেহবাদ তন্ত্রে গভীরভাবে প্রোথিত, সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।[১৩] তবে তন্ত্রের শিব–শক্তি তত্ত্ব সাংখ্যের প্রকৃতি–পুরুষ তত্ত্ব দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। তন্ত্রের সাধকগণ মনে করেন শক্তি ছাড়া শিব হলেন শব আর শক্তি শূন্য শিব হতেই পারে না। স্বাভাবিকভাবেই প্রাবন্ধিক তন্ত্রের এই সাংখ্যমূলকত্বের পক্ষে যুক্তি রেখেছেন, "যখন গ্রামে গ্রামে, নগরে মাঠে জঙ্গলে শিবালয়, কালীর মন্দির দেখি, আমাদের সাংখ্য মনে পড়ে; যখন দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী পূজার বাদ্য শুনি, আমাদের সাংখ্যদর্শন মনে পড়ে"।[১৪]

বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন, যা এককালে ভারত ও ভারতের বাইরে বহুধা বিস্তৃত হয়েছিল, সেই বৌদ্ধধর্মের আদি সাংখ্যদর্শনে নিহিত। বৌদ্ধ একাধারে নাস্তিক, নিরীশ্বরবাদী ও নির্বাণের ধ্বজাধারী। আর এই তিনটিরই মূল সাংখ্যদর্শনে। সাংখ্যদর্শন বেদের অবজ্ঞা প্রকাশ্যে করেনি ঠিকই তবে বৈদিক আড়ম্বরতার আড়ালে পরিশেষে বেদের মূলোচ্ছেদ সম্পন্ন হয়েছে। প্রাবন্ধিক সচেতনভাবে অন্যত্র দেখিয়েছেন, "There is no question that the Sāṁkhya upholds the authority of the Vedas. It is frequently cited as conclusively settling disputed points… The authority of the

Vedas is unhesitatingly appealed to whenever an opponent has to be silenced, or a favourite dogma to be established; and when texts are convenient for the purpose. When Vedic texts tell on the other side, they are explained away"।[১৫] অন্যদিকে সাংখ্যের মুক্তি ও বৌদ্ধের নির্বাণ প্রকৃতপক্ষে দুঃখত্রয় থেকে সর্বাত্মক নিবৃত্তিমাত্র। যদিও এই জাতীয় সদৃশতা থেকে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের বীজের খোঁজ সাংখ্যে এবং একইভাবে সাংখ্যের গোড়ার খোঁজ বৌদ্ধদর্শনে করা চলে কি না সেই প্রশ্ন প্রাবন্ধিকের মনেই উপস্থিত হয়েছে– "We have

বৌদ্ধধর্মের সাংখ্যমূলকত্ব

said what we had to say regarding the existence of similarity between Buddhism and the Sāṁkhya philosophy. We regret our limits do not permit us to proceed to the examination of the question, whether the existence of this similarity between the two doctrines leads to the inference that Buddhism borrowed its philosophy from Kapila, or to the inference that Kapila based his philosophy on Buddhism. The discussion must be left for another occasion"।[১৬] তবে খুব নিরাপদ ভাবে একথা স্বীকার করা চলে যে, বিশ্বব্যাপী বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসার এবং সমষ্টির নিকট সেই ধর্মের প্রভাবে যদি শাক্যসিংহ বা বুদ্ধের নাম স্মরণ করতে হয়, তাহলে দার্শনিক যুক্তির আদি প্রণেতা কপিলের নামও সেই সাথে স্মরণীয়। প্রাবন্ধিক যুক্তি রেখেছেন– "যত লোক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, তত সংখ্যক কোন ধর্মাবলম্বী লোক পৃথিবীতে নাই। সংখ্যা সম্বন্ধে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা তৎপরবর্তী। সুতরাং যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ মনুষ্যমধ্যে কে সর্বাপেক্ষা অধিক লোকের উপর প্রভুত্ব করিয়াছেন, তখন আমরা প্রথমে শাক্যসিংহের, তৎপরে খ্রীষ্টের নাম করিব। কিন্তু শাক্যসিংহের সঙ্গে সঙ্গে কপিলেরও নাম করিতে হইবে"।[১৭] এখানে শাক্যসিংহের নাম বা খ্রিস্টের নাম বা কপিলের নাম স্মরণে কোনও আপত্তির জায়গা নেই তবে পৃথিবীতে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মানুষ সর্বাধিক এবং খ্রিস্টধর্মাবলম্বী মানুষ তার পরবর্তী– প্রাবন্ধিকের এই তথ্যের তথ্যসূত্র তথ্যবিচারের দাবি রাখে। উনবিংশ শতক হতে আজ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী খ্রিস্টধর্মাবলম্বী মানুষেরাই সংখ্যায় অধিক।[১৮] এমনকি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মানুষদের সংখ্যা শতাংশের বিচারে অনেকটাই পিছনে।[১৯]

৩.৪.২. প্রসঙ্গ: দুঃখপ্রাধান্য

চলমান এই সংসার সুখের অথবা দুঃখের তা নিয়ে বাদ-বিতণ্ডার অন্ত নেই। এক এক পক্ষ এক এক দৃষ্টিকোণ থেকে সংসারের সুখময়তা বা দুঃখময়তা পর্যালোচনা করেছেন। প্রাবন্ধিকও সর্বাগ্রে সংসারে সুখের প্রাধান্য বেশি বা দুঃখের, সেই নির্ধারণে সচেষ্ট হয়েছেন।

ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে চার্বাক সুখসর্বস্ববাদী। তাঁদের মতে সুখের জন্যই এই সংসার সৃষ্ট হয়েছে। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গের মধ্যে অর্থ ও কাম মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে তাদের অভিমত। সেই কারণেই সুখে বেঁচে থাকার জন্য ঋণ করে ঘি খাওয়ার কিংবা যথেচ্ছ পরদার গমনের পরামর্শ দিতেও চার্বাকদের কুণ্ঠাবোধ হয়নি–

যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদ্ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।।
স্বদারপরদারেষু যথেচ্ছং বিহরেৎ সদা।
গুরুশিষ্যপ্রণালীং চ ত্যজেৎ স্বহিতমাচরন্।।[২০]

এই সুবিশাল সৃষ্টিতে স্রষ্টার কত বৈচিত্র্যই উপলব্ধ; সেই সব তো প্রকারান্তরে জীবের কল্যাণ কামনাতেই। সেই সকল বৈচিত্র্যকে এক ছাতার তলায় নিয়ে এলেও 'সংসার সুখের' একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় কি? চার্বাক ব্যতিরেকে প্রায় সবকটি দর্শন মনে করেন সংসারে দুঃখেরই প্রাধান্য। 'সাংখ্যদর্শন' অবশ্য তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে কারণ সংসারের দুঃখময়তা ও ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির মধ্যে দিয়ে মুক্তির কথা তাঁরাই প্রথম উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন।

প্রাবন্ধিক সুখ-দুঃখের এই অস্থিরতার যথাযথ বিচারে সচেষ্ট হয়ে যুক্তি-প্রতিযুক্তির সাথে সাথে অনেকগুলি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে এককোটিতে সিদ্ধান্তের চেষ্টা করেছেন। যেমন, যারা সুখসর্বস্ববাদী তারা বলতে পারেন স্রষ্টার কৃত নিয়মের পালনে দুঃখের কোনও অবকাশ থাকে না। নিয়মের লঙ্ঘনেই দুঃখের প্রবৃত্তি। যদিও প্রতিযুক্তিরূপে বলা যায়, এমন নিয়মের যৌক্তিকতা কোথায় যে নিয়ম অতি সহজেই লঙ্ঘন করা যায়। দৃষ্টান্তরূপে বলা যেতে পারে-

দৃষ্টান্ত ১: মাদকের সেবন মানুষের শরীরের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়ানক। একথা আপামর জনগণের নিকট সুবিদিত। অথচ পরিহাসের কথা এই যে, মাদক সেবনের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহের অন্ত নেই। এমনকি এই দ্রব্য সেবনের আয়াস ও প্রয়াস অত্যন্ত সুলভ। তাহলে দেখা গেল, মাদক সেবন ক্ষতিকর এইরূপ নিয়ম থাকলেও তা অতি অনায়াসেই লঙ্ঘনীয়। এবং তারই ফলস্বরূপ দুঃখের প্রবৃত্তি।

আরও প্রতিযুক্তিরূপে বলা যায়, কিছু নিয়মের লঙ্ঘন এতই সহজ যে নিয়মের লঙ্ঘন কালে উপলব্ধিই হয় না। অর্থাৎ নিয়মটি লঙ্ঘন হবার সময় লঙ্ঘনকারী বুঝতেই পারলেন না যে নিয়মের লঙ্ঘন হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ-

দৃষ্টান্ত ২: কার্বনিক অ্যাসিড- একটি রাসায়নিক যৌগ, যা কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও জলের মিশ্রণে তৈরি হয়। এর স্থিতিকাল খুবই অল্প সময়ের জন্য। ফলে যখন শরীরের মধ্যে এই যৌগটির অবস্থান হয় তখন সেই অর্থে উপলব্ধিই হয় না। তবে দীর্ঘকালীন মেয়াদে এই যৌগটি রক্তে অম্লত্বের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় যা শরীরের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে।

দৃষ্টান্ত ৩: বসন্ত রোগের জীবাণু বাতাসের মধ্যে দিয়ে ছড়ায়। ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে দিয়ে যখন তা মানবদেহে প্রবেশ করে তখন প্রাথমিক স্তরে তার উপলব্ধিই হয় না। পরে ভয়াবহ আকার নিলে সে এক কষ্টযন্ত্রণার সম্মুখীন হতে হয়।

আরও প্রতিযুক্তি এই যে, বেশ কিছু ক্ষেত্রে যে নিয়মটি লঙ্ঘন করার কারণে ব্যক্তি দুঃখপ্রাপ্ত হল, সেই নিয়মটিই অজ্ঞাত থেকে যায়। দৃষ্টান্তরূপে বলা যায়-

দৃষ্টান্ত ৪: পন্ডিত পিতার সন্তান গন্ডমূর্খ। এখন যদি দেখা যায় ঐ মূর্খতা শিক্ষার জন্য নয় বরং জন্ম থেকেই অধিকৃত তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হয় কোন নিয়মটি লঙ্ঘনের জন্য পিতার বা পুত্রের ঐরূপ দশা? উত্তর পাওয়া কঠিন কেননা সত্যই নিয়মটি জ্ঞানের বাইরে।

আবার এমন ক্ষেত্রও দেখা যায় যেখানে একজন নিয়ম রক্ষার চেষ্টায় ব্যাপৃত তথাপি অপরজন দুঃখের ভোগ করছে। অর্থাৎ নিয়মের রক্ষাতেও দুঃখ হতে নিষ্কৃতি নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ-

দৃষ্টান্ত ৫: যুদ্ধক্ষেত্রে দুই অভিন্নহৃদয় বন্ধুর একজন প্রাণত্যাগ করল। সে তার নিয়ম রক্ষা করল ঠিকই কিন্তু অপর বন্ধু নিজবন্ধুর প্রাণবিয়োগে ব্যাপক দুঃখভোগ করল।

দৃষ্টান্ত ৬: পূর্বপুরুষের কেউ কঠিন ব্যাধির কবলে পড়েছিলেন অনিয়মের কারণে, এখন বর্তমান প্রজন্মের ব্যক্তি কোনওরূপ নিয়মের উল্লঙ্ঘন না করেও ব্যাপক পীড়ার বশীভূত হতে পারেন।

এবং শেষ কথা এই যে স্বাভাবিক নিয়মানুসরণেও দুঃখের সম্ভাবনা থেকে নিষ্কৃতি নেই। অর্থাৎ চারপাশের স্বাভাবিক যে নিয়মকানুন সেই নিয়মের স্বাভাবিক যাত্রাতেও বিপত্তির হাত থেকে অব্যাহতি নেই। দৃষ্টান্তরূপে বলা যায়–

দৃষ্টান্ত ৭: জনসংখ্যার বৃদ্ধি বিষয়ে Thomas Malthus এর খুব প্রসিদ্ধ মত এই যে "By nature human food increases in a slow arithmetical ratio; man himself increases in a quick geometrical ratio unless want and vice stop him. The increase in numbers is necessarily limited by the means of subsistence Population invariably increases when the means of subsistence increase, unless prevented by powerful and obvious checks".[২১] অথচ একথা সহজেই বোধ্য যে, মানুষ তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা করতে থাকলেই লোকসংখ্যাবৃদ্ধি এক ভয়ানক জায়গায় পৌছে মহৎ অনিষ্টের কারণ হতে পারে।

অতএব, দৃষ্টান্ত ও প্রতিযুক্তিগুলি বিচার করলে স্পষ্ট হয় জগতে দুঃখের প্রাধান্যই বেশি। সুখের অস্তিত্ব নেই এমন না, তবে দার্শনিকরা তা দুঃখপক্ষেই নিক্ষেপ করেন।

৩.৪.৩. প্রসঙ্গ: দুঃখনিবৃত্তি

সংসার এতাদৃশ দুঃখময়। দুঃখের এই বহমানতা থেকে আত্যন্তিক নিবৃত্তিতেই পরমপুরুষার্থ লাভ। প্রাবন্ধিক সাংখ্যসূত্রোদ্ধার করেছেন *অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ* (*প্রবচনসূত্র* ১/১)।[২২] কিন্তু প্রশ্ন হয়, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বা দুঃখ নিবারণ কাকে বলে? সাধারণভাবে দেখা যায় জীব দুঃখের কবলে পড়লে সেই দুঃখ হতে উদ্ধারের চেষ্টা করে। বস্তুত জীবমাত্রেরই তা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। যেমন– খিদেতে কষ্ট পেলে ব্যক্তি খাবারের দ্বারা তার নিবৃত্তির চেষ্টা করে। পুত্র বা পত্নী বিয়োগজাত শোকের কষ্ট অন্যবিষয়ে মনোনিবেশের দ্বারা উপশমের প্রয়াস করে। যদিও এই উপায়গুলি বড়ই ক্ষণিক। কারণ ক্ষুধার প্রবৃত্তি পুনরায় হবে এবং অন্য বিষয় হতে মনের স্থানান্তর ঘটলেই পুনরায় শোক জন্মাবে। আবার, বেশ কিছু স্থলে অবস্থা আরও জটিল। যেমন কোনও ব্যক্তির হাত পা যদি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে সেই শোক দীর্ঘকালীন কেননা হাত-পা দেহের সাথে পূর্ববৎ যুক্ত করা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং ক্ষণিক উপায়গুলি কখনই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিতে সক্ষম নয়।

প্রতিযুক্তিরূপে এস্থলে লৌকিক দৃষ্টান্তের উপস্থাপনা করে বলা যেতে পারে, আগুন নেভানোর জন্য সাধারণত জল দেওয়া হয়। তাই জলকে অগ্নি-নির্বাপকও বলা হয়ে থাকে। তবে ঐ নিভে যাওয়া আগুন পুনরায় জ্বলে উঠতে পারে বলে জলকে 'অগ্নি-নির্বাপক' বলা যাবে না এমন তো হয় না। সেরকমই ক্ষণিক উপায়গুলির দ্বারা জীবের দুঃখের পূর্ণরূপে নিবৃত্তি হয় না। তাহলে কি ঐ ক্ষণিক উপায় গুলিকে দুঃখ নিবর্তক বলা যাবে না? এরকম হলে জীব দেহের সম্পূর্ণ নাশই একমাত্র উপায়।

যদিও দেহধ্বংসেই সকল আপত্তির নিরসন হয় না। ভারতীয় দর্শন-পরম্পরা জন্মান্তর স্বীকার করে এবং জন্ম ও মৃত্যুজনিত দুঃখও যে সমান, সেকথা চিন্তা করে দেহধ্বংসকে দুঃখনিবারণের উপায় রূপে স্থির করা চলে না– *সমানং জরামরণাদিজং দুঃখম্* (*প্রবচনসূত্র* ৩/৫৩)।[২৩] তাহলে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির উপায় কী? 'অপবর্গ' বা 'মোক্ষ'ই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি।

‘অপবর্গ’ ইত্যাদি প্রাচীন ও কঠিন শব্দে প্রবেশের পূর্বে প্রাবন্ধিক পাঠককে সুকৌশলে কয়েকটি বিষয় উপোদ্‌ঘাতরূপে অবগত করিয়েছেন।

জগৎ দুঃখময় একথা দৃষ্টান্ত সহকারে প্রতিপন্ন করা হয়েছে (পূর্বে দ্রষ্টব্য ৩.৪.২)। আবার একথাও স্বীকার করা হয়েছে যে অল্পবিস্তর সুখও এখানে উপলব্ধ। যাইহোক দুঃখভোগ বা সুখভোগ, ভোগকর্তার নিকট তা প্রতিভাত হয় আমি সুখী বা আমি দুঃখী রূপে। কিন্তু এই সুখ বা দুঃখের ভোগ আসলে কার?

যে ব্যক্তি বা জীব সুখ বা দুঃখের ভোগ করছেন তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট দেহটিই আমাদের জ্ঞানগোচর হয়। তাহলে প্রাথমিকভাবে এরূপ ধারণা হওয়াই সঙ্গত যে, সুখ-দুঃখের ভোগ দেহেরই হয়। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ঐ ব্যক্তি বা জীবের নাশে দেহটি অবশিষ্ট থাকে অথচ সেখানে সুখ বা দুঃখভোগের কোনও লক্ষণ থাকে না। এমনকি ঐ ব্যক্তি বা জীব খুব দুঃখিত বা আনন্দিত হলেও দেহে তার কোনও বিকার দেখা যায় না। অতএব দুঃখ বা সুখের ভোগকর্তা এই দেহ নয়। ভোগকর্তা স্বতন্ত্র, যিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর তথা অনুমেয়। সুখ-দুঃখাদির সেই ভোগকর্তা হলেন আত্মা।

প্রাবন্ধিক এইস্থলে কিঞ্চিৎ বৈজ্ঞানিক আলোচনার অবতারণার সুযোগ করে দিয়েছেন। মনস্তত্ত্ববিদ মনে করেন, সুখ দুঃখ মানসিক বিকার স্বরূপ এবং সেইগুলি মস্তিষ্কের ক্রিয়া। জীববিজ্ঞানের ভাষায় এ হল স্নায়বিক সমন্বয় বা স্নায়ুতন্ত্রের কাজ। *The New Encyclopaedia Britannica* তে খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করা হয়েছে– “As life on Earth evolved and the environment became more complex, the survival of organisms upon how well they could respond to changes in their surroundings. One factor necessary for survival was a speedy reaction or response. Since communication from one cell to another by chemical means was too slow to be adequate for survival, a system evolved that allowed for faster reaction. That system was the nervous system”।[২৪] আর কীভাবে এই স্নায়ুতন্ত্র বা Nervous System কাজ করে? স্নায়ুতন্ত্রের স্নায়ুকোশ বা Neurone সম্মীলিতভাবে স্নায়ু বা Nerve গঠন করে। Sensory Neurone পরিবেশ থেকে গৃহীত উদ্দীপনা বা Stimulus-কে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে (কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড নিয়ে গঠিত) নিয়ে যায়। এবার কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে response উদ্দীপক অঙ্গে প্রেরিত হয়। এর ফলে উদ্দীপিত অঙ্গটি উদ্দীপিত হলে সেটি সাড়া দেয়। এইভাবে স্নায়বিক কাজ সম্পন্ন হয় মনুষ্যদেহে। তাই যেকোনও স্নায়বিক ক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বিশেষত মস্তিষ্কের ভূমিকা অনেকখানি। অতএব দুঃখ বা বেদনা যাইহোক না কেন, বিজ্ঞান অনুসারে তা মস্তিষ্কের ক্রিয়ামাত্র।[২৫]

যাইহোক সাংখ্যদর্শনে পূর্বোক্ত আত্মাকেই পুরুষতত্ত্বরূপে এবং পুরুষ ব্যতিরেকে অবশিষ্ট জগৎকে প্রকৃতিতত্ত্ব বলে সূচিত করা হয়েছে। বস্তুত যা কিছু দুঃখ সেই সবই প্রকৃতিঘটিত অর্থাৎ যেকোনও দুঃখই হোক না কেন, তার মূল কিন্তু বাহ্য পদার্থ। যেমন একজনের বাক্যে অন্য একজন অপমানিত হল। এখানে যিনি দুঃখ পেলেন তিনি মানসিক দুঃখ পেলেন, সন্দেহ নেই; কিন্তু যার দ্বারা দুঃখ পেলেন অর্থাৎ যে বাক্যের দ্বারা দুঃখ পেলেন, সেই বাক্য প্রাকৃতিক পদার্থ। তাহলে সবরকম দুঃখের মূলেই সেই প্রকৃতি। স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞাসা হয় প্রকৃতিঘটিত এই দুঃখ পুরুষে বর্তে কেন? পুরুষ তো স্বতন্ত্র তথা কোনওভাবেই সংসর্গ বিশিষ্ট নয়–*অসঙ্গোঽয়ং পুরুষ ইতি* (*প্রবচনসূত্র* ১/১৫)।[২৬] তাছাড়া দুই ভিন্ন স্থানে বাসকারী দুজন ব্যক্তির মধ্যে যেমন ব্যবধান থাকে তেমনই বাহ্য ও আন্তরিকের মধ্যেও পরস্পর সংলগ্নতা থাকে না। তাহলে এইরূপ প্রকৃতিঘটিত দুঃখ পুরুষে বর্তে কেন?

সাংখ্যের পথ আশ্রয় করেই প্রাবন্ধিক সমাধান করেছেন। বস্তুত প্রকৃতির সাথে পুরুষের সংযোগের কারণেই পুরুষে প্রকৃতিঘটিত দুঃখ বর্তায়। কিন্তু জিজ্ঞাসা হয় বাহ্য ও আন্তরিকে দেশ ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও এই সংযোগ কীভাবে সম্ভব? প্রাবন্ধিক সাংখ্যের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে জানাচ্ছেন, যেমন স্বচ্ছ কাঁচের নিকট জবাফুল রাখলে ঐ কাঁচ ও জবাফুলের মধ্যে ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও কাঁচ জবাফুলের বর্ণ ধারণ করে কেবল সংযোগবশত; তেমনই প্রকৃতির সাথে সান্নিধ্য বা সংযোগের কারণেই পুরুষে দুঃখ।

অবশ্য প্রাবন্ধিকের দৃষ্টিতে এই তত্ত্ব যেন অনেকখানি শর্তাধীন– "সাংখ্যের মত এই। যদি আত্মা শরীর হইতে পৃথক্ হয়, যদি আত্মাই সুখ-দুঃখভোগী হয়, যদি আত্মা দেহনাশের পরেও থাকে, যদি দেহ হইতে বিযুক্ত আত্মার সুখ-দুঃখাদি ভোগের সম্ভাবনা থাকে, তবে সাংখ্যদর্শনের এ সকল কথা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এই 'যদি'গুলিন অনেক"।[২৭] কেননা 'পজিটিভিস্ট' বা প্রত্যক্ষবাদীর দৃষ্টিকোণ থেকে এই 'যদি'গুলির প্রত্যেকটির প্রতিপ্রশ্ন উপস্থাপন করা যায়। প্রথমত, আত্মা শরীর থেকে পৃথক একথা কীভাবে জানা যাচ্ছে? মনস্তত্ত্ববিদেরা তো আত্মাকে শরীরের অংশবিশেষ বলে থাকেন। দ্বিতীয়ত, আত্মাই সুখ-দুঃখের ভোগকর্তা; প্রকৃতি কোনওভাবেই ভোগকর্ত্রী নয়, একথার নিশ্চয়তা কোথায়? তৃতীয়ত, দেহনাশের পর আত্মার অস্তিত্বে সর্বজনগ্রাহ্য প্রমাণ কোথায়? চতুর্থত, দেহধ্বংসের পর যদিও বা আত্মা স্বীকার করা হয়, সেই আত্মার জরা-মরণাদি দুঃখের সম্ভাবনা আছে এর কোনও প্রমাণ আছে কি?

প্রাবন্ধিক উক্ত প্রশ্নগুলির বিচার-বিমর্শের চেষ্টা করেননি, বলা ভাল প্রয়োজন মনে করেননি। তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি, 'এ সকল মত যে (সাংখ্যের মত), এ কালে গ্রাহ্য হইবে, এমত বিবেচনায় আমরা সাংখ্যদর্শন বুঝাইতে প্রবৃত্ত হয় নাই। কিন্তু এখন যাহা অগ্রাহ্য, দুই সহস্র বৎসর পূর্বে তাহা আশ্চর্য্য আবিষ্ক্রিয়া'।[২৮]

তাই উপোদ্ঘাত পর্ব শেষ করে তিনি সাংখ্যপ্রদর্শিত পথেই অপবর্গ ও তার প্রাপ্তির উপায় নির্দেশ করেছেন। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগই যে পুরুষে দুঃখ বর্তানোর কারণ, সেকথা পূর্বে প্রতিপন্ন হয়েছে। ঐ সংযোগের উচ্ছেদই অপবর্গ বা মোক্ষ। তবে ঐ সংযোগের উচ্ছেদ সম্ভব কি? উত্তর হচ্ছে সম্ভব, কারণ প্রকৃতি-পুরুষের ঐ সংযোগ কোনও নিত্য সংযোগ নয়। আর কীভাবে ঐ উচ্ছেদ সম্ভব? 'বিবেক' এর দ্বারা। বিবেক অর্থাৎ জ্ঞান। প্রকৃতি-পুরুষ সম্বন্ধীয় ভেদজ্ঞানের দ্বারাই অপবর্গ বা মুক্তিলাভ সম্ভব।

প্রাবন্ধিক যদিও সর্বান্তঃকরণে 'জ্ঞানেই মুক্তি' একথা স্বীকার করে নিতে পারলেন না। তাঁর তির্যক মন্তব্যে চোখ রাখলেই আঁচ পাওয়া যায়, "পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল কথা 'জ্ঞানেই শক্তি' (knowledge is power); হিন্দুসভ্যতার মূল কথা 'জ্ঞানেই মুক্তি'। দুই জাতি দুইটি পৃথক্ উদ্দেশ্যানুসন্ধানে এক পথেই যাত্রা করিলেন। পাশ্চাত্যেরা শক্তি পাইয়াছেন– আমরা কি মুক্তি পাইয়াছি? বস্তুত এক যাত্রার পৃথক্ ফল হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই"।[২৯] শক্তি ও মুক্তির এই দ্বন্দ্বে প্রাবন্ধিক কিঞ্চিৎ শক্তির পক্ষপাত অবলম্বন করে পুনরায় শ্লেষাত্মক মন্তব্য করলেন– "ইউরোপীয়রা শক্তি-অনুসারী, ইহাই তাঁহাদিগের উন্নতির মূল। আমরা শক্তির প্রতি যত্নহীন, ইহাই আমাদিগের অবনতির মূল। ইউরোপীয়দিগের উদ্দেশ্য ঐহিক; তাঁহারা ইহকালে জয়ী। আমাদিগের উদ্দেশ্য পারত্রিক– তাই ইহকালে আমরা জয়ী হইলাম না। পরকালে হইব কিনা তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে"।[৩০]

অবশ্য সাংখ্যের উদ্ভবের প্রেক্ষাপট প্রাবন্ধিকের দৃষ্টিতে কর্ম থেকে জ্ঞানের পথে উত্তরণ। প্রাচীন বৈদিক ক্রিয়াকলাপ, যা ছিল মূলত প্রাকৃতিক শক্তিগুলির স্তুতি; সেই মহাপ্রবল, প্রলয়ঙ্কর, অতিবিনাশী শক্তিগুলির স্তুতির জন্য ঋষিরা নির্বাচন করলেন ইন্দ্র, অগ্নি, মরুৎ, বরুণ প্রভৃতি অবয়বের। দেখা দিল যাগযজ্ঞের প্রবলতা। ঐহিক ও পারত্রিক সুখলাভের আশায় মানুষ যজ্ঞীয় ক্রিয়াকলাপেই মনোনিবেশ করল। দিনে দিনে ক্রিয়ার দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হওয়ায় এবং যজ্ঞীয় ক্রিয়াকলাপেই মুক্তি এই ধারণা প্রোথিত হওয়ায় বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের নির্ভরতা বৃদ্ধি পেতে থাকল। অন্যদিকে অভাব হল জ্ঞানের আলোচনার– "বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ, আরণ্যক এবং সূত্রগ্রন্থসকল কেবল ক্রিয়াকলাপের কথায় পরিপূর্ণ। যে কিছু প্রকৃত জ্ঞানের চর্চা হইত, তাহা কেবল বেদের আনুষঙ্গিক বলিয়াই। সে সকল শাস্ত্র বেদাঙ্গ বলিয়া খ্যাত হইল। জ্ঞান এইরূপে ক্রিয়ার দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হওয়াতে তাহার উন্নতি হইল না। কর্মজন্য মোক্ষ, এই বিশ্বাস ভারতভূমে অপ্রতিহত থাকাতেই এরূপ ঘটিয়াছিল। প্রকৃত জ্ঞানের আলোচনার অভাবে বেদভক্তি আরও প্রবলা হইল। মনুষ্যচিত্তের স্বাধীনতা একেবারে লুপ্ত হইতে লাগিল। মনুষ্য বিবেকশূন্য মন্ত্রমুগ্ধ শৃঙ্খলাবদ্ধ পশুবৎ হইয়া উঠিল"।[৩১] বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগ নিঃসন্দেহে যজ্ঞীয় ক্রিয়াকলাপে নিবিষ্ট, কিন্তু আরণ্যক বিশেষত উপনিষদ্ তো একেবারে জ্ঞানমার্গের পরাকাষ্ঠা। তথাপি প্রাবন্ধিকের এই সাধারণীকরণ (Generalization) প্রশ্নের দাবি রাখে। যাইহোক, এমতাবস্থায় প্রয়োজন ছিল এরূপ কর্মপীড়া থেকে অব্যাহতির। সাংখ্যকার সেই খোঁজ নিয়ে উপস্থিত হলেন কর্মপীড়িত ভারতবাসীর নিকট। ঐহিক ও পারত্রিকের উর্ধ্বে পরম পুরুষার্থের খোঁজে মনোনিবেশ করতে তিনি শোনালেন জ্ঞানেই মুক্তির পথ– "সাংখ্যকার বলিলেন কর্ম অর্থাৎ হোম যাগাদির অনুষ্ঠান পুরুষার্থ নহে। জ্ঞানই পুরুষার্থ। জ্ঞানই মুক্তি। কর্মপীড়িত ভারতবর্ষ সেকথা শুনিল"।[৩২]

৩.৪.৪. প্রসঙ্গ: সৃষ্টি

সৃষ্টিতত্ত্ব ভারতীয় দর্শন পরম্পরায় অত্যন্ত সমাদরের সাথে আলোচিত। জগৎ–সংসার অনাদিকাল থেকে অবস্থান করছে নাকি নির্দিষ্ট ক্রিয়া–প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট হয়েছে, তা নিয়ে আস্তিক ও নাস্তিক উভয় সম্প্রদায়ই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সেই প্রশ্নের সমাধানও তাঁরা রেখেছেন সকলের সামনে। প্রাবন্ধিক এই স্থলে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের প্রসঙ্গ উপস্থিত করেছেন। পাশ্চাত্য দার্শনিকরা সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে কোনও দৃষ্টিকোণের অপেক্ষা করেন না কারণ তাদের নিকট ঐ তত্ত্ব নিরূপণীয় নয়, এরূপ প্রাবন্ধিকের অভিমত– "অতি প্রাচীন কাল হইতে দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য, জগতের আদি কি, তাহা নিরূপিত হয়। আধুনিক ইউরোপীয় দার্শনিকেরা সে তত্ত্ব নিরূপণীয় নহে বলিয়া এক প্রকার ত্যাগ করিয়াছেন"।[৩৩] আর এদেশীয় দার্শনিকদের মতামত প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক কেবল ন্যায়মতের উল্লেখ করলেও, প্রসঙ্গক্রমে আমরা আস্তিক ও নাস্তিক মতগুলির দিকেও একটু নজর দিতে পারি কারণ প্রাবন্ধিকও নাস্তিকদের মতামতকে তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দেননি একেবারে– "... নাস্তিক বলিলেই মূঢ় বুঝায় না। তাঁহারা বিচারের দ্বারা আপন পক্ষ সমর্থন করিতে চেষ্টা করেন"।[৩৪]

জগৎ সৃষ্ট অথবা নিত্য?

নাস্তিকদের মধ্যে জড়বাদী চার্বাকদের দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা যাক। তাদের মতে দৃশ্যমান এই জগৎ পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই চতুর্ভূতের সংযোগেই সৃষ্ট।[৩৫] এমনকি বস্তুর উৎপত্তির নেপথ্যে কোনও কারণ স্বীকারের যৌক্তিকতা নেই। জগতের সকল কার্যবস্তুই অকস্মাৎ উৎপাদিত বলে তাদের ধারণা। অপর এক নাস্তিক জৈনসম্প্রদায়ের মতে, এই জগৎ এক আঙ্গিকে নিত্য আবার অন্য আঙ্গিকে অনিত্যও। জগৎ প্রকৃতপক্ষে বিবিধ দ্রব্যের সমষ্টি। আর দ্রব্য মাত্রই উৎপত্তি–স্থির–বিনাশশীল।[৩৬] অতএব দ্রব্যাত্মক জগৎও পরিবর্তনশীল। এবং লক্ষণীয় এই যে জগতের স্রষ্টারূপে কোনও সর্বজ্ঞ ঈশ্বরকে তারাও স্বীকৃতি দিতে নারাজ। অন্যদিকে আস্তিক

পরম্পরায়, নৈয়ায়িকরা জগৎকে কার্যবস্তু বলে মনে করেন। এবং তাদের মতে কার্য যেহেতু কারণাত্মক তাই জগতের উপাদানকারণরূপে পরমাণু ও নিমিত্তকারণরূপে ঈশ্বর স্বীকরণীয়। বৈশেষিক সম্প্রদায়ও এই ধারার অনুসরণকারী। তাদের মতেও জগতের যাবতীয় অনিত্য ও যৌগিক বস্তুর সৃষ্টি পরমাণু থেকে। বেদান্তীরা সত্তাত্রৈবিধ্যের স্বীকৃতি দিয়ে ব্যাবহারিক সত্তাতে জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন এবং পারমার্থিক সত্তায় ঐ জগৎকে মিথ্যা বলতে দ্বিধা করেননি। সুতরাং, সম্প্রদায় ভেদে দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা স্পষ্ট। কে সঠিক? কে ভুল? এই বিবাদের জায়গা অন্যত্র। তবে মতের এই ভিন্নতা এক সৃষ্টির বহুধা রূপের পরিচয় দেয়।

এবার প্রাবন্ধিকের কথায় আসা যাক। জগতের নিয়ন্তা, কর্তা রূপে ঈশ্বরের স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতিতে যে মতের ভিন্নতা, সেই বিষয়ে কোনওরকম বিতর্কে না গিয়ে তিনি নিরপেক্ষতার জয়গান গেয়েছেন– "একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব একটি পৃথক তত্ত্ব, সৃষ্টি প্রক্রিয়া আর একটি পৃথক তত্ত্ব। ঈশ্বরবাদীও বলিতে পারেন যে 'আমি ঈশ্বর মানি, কিন্তু সৃষ্টিক্রিয়া মানি না। ঈশ্বর জগতের নিয়ন্তা, তাঁহার কৃত নিয়ম দেখিতেছি, নিয়মাতিরিক্ত সৃষ্টির কথা আমি বলিতে পারি না'। এক্ষণকার কোন কোন খৃষ্টীয়ান এই মতাবলম্বী। ইহার মধ্যে কোন্ মত অযথার্থ, কোন্ মত যথার্থ, তাহা আমরা কিছুই বলিতেছি না। যাঁহার যাহা বিশ্বাস, তদ্বিরুদ্ধ আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই"।[৩৭]

অতএব বিবাদ-বিসংবাদ এড়িয়ে প্রাবন্ধিক সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্বের বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। পরিদৃশ্যমান এই জগৎ প্রকৃতপক্ষে সৃষ্ট বা বলা ভালো প্রাকৃতিক ক্রিয়ামাত্র। জগৎ উৎপত্তির এই আদিম-কারণ রূপে সাংখ্যকার স্বীকার করেন মূল-প্রকৃতিকে। কারণ-পরম্পরার অনুসন্ধানে ব্যাপ্ত হলে একস্থলে সেই কারণ-পরম্পরার অন্ত হয়। জগৎ উৎপত্তির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। প্রাবন্ধিক একটি সরল দৃষ্টান্তের উপস্থাপন করেছেন– "আমি যে ফলটি ভোজন করিতেছি, ইহা অমুক বৃক্ষে জন্মিয়াছে; সেই বৃক্ষ একটি বীজে জন্মিয়াছে; সেই বীজ অন্য বৃক্ষের ফলে জন্মিয়াছিল; সেই বৃক্ষও আর একটি বীজে জন্মিয়াছিল। এইরূপে অনন্তানুসন্ধান করিলেও অবশ্য একটি আদিম বীজ মানিতে হইবে। এইরূপ জগতে যাহা আদিম বীজ, যেখানে কারণানুসন্ধান বন্ধ হইবে, সাংখ্যকার সেই আদিম কারণকে মূল প্রকৃতি বলেন"।[৩৮]

সৃষ্টিপ্রক্রিয়া

আদি কারণ মূল-প্রকৃতি হতে জগৎ সংসারের এই রূপাবয়বাদি প্রাপ্তি এবং পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের মধ্যে সকল জাগতিক পদার্থের অন্তর্ভুক্তি। প্রাবন্ধিক এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব সম্পর্কে অধিক বিস্তারের চেষ্টা করেননি কারণ তাঁর স্পষ্ট মত– "এ তত্ত্বের আর বিস্তারের আবশ্যক নাই। একালে ইহা বড় সঙ্গত বা অর্থযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না"।[৩৯] তবে স্থূলভূত হতে প্রকৃতি পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে তত্ত্বগুলির অস্তিত্ব স্বীকারে প্রাবন্ধিকের বক্তব্য অত্যন্ত সাবলীল– "স্থূলভূত হইতে পঞ্চ তন্মাত্রের জ্ঞান। আমরা শুনিতে পাই এ জন্য শব্দ আছে। আমরা দেখিতে পাই এ জন্য দৃশ্য অর্থাৎ রূপ আছে, ইত্যাদি। অতএব শব্দস্পর্শাদির অস্তিত্ব নিশ্চিত, কিন্তু শব্দ আমি শুনি, রূপ আমি দেখি। তবে আমিও আছি। অতএব তন্মাত্র হইতে অহঙ্কারের অস্তিত্ব অনুভূত হইল। আমি আছি কেন বলি? আমার মনে (consciousness) ইহা উদয় হইয়াছে, সেই জন্য। তবে মনও আছে (Cogito ergo Sum)। অতএব অহঙ্কার হইতে মনের অস্তিত্ব স্থিরীকৃত হইল। মনের সুখ-দুঃখ আছে। সুখ-দুঃখের কারণ আছে। অতএব মূল কারণ প্রকৃতি আছে"।[৪০] লক্ষণীয় যে প্রাবন্ধিক উক্ত আলোচনাবসরে ফরাসি দার্শনিক রেনে দেকার্তের (René Descartes) বিখ্যাত নীতি *Cogito ergo Sum* এর উল্লেখ করেছেন যার অর্থ, 'আমি চিন্তা করি, সুতরাং, আমি আছি'। সকল চিন্তার ধারক ও বাহক স্বরূপ এই আমি বা অহং এর অস্তিত্ব সংশয়াতীত। এখানে গুরুত্বের

জায়গা এই যে কেবলমাত্র চেতনার দ্বারাই আমার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, চেতনা ব্যতীত অন্য কোনও বাহ্যিক ক্রিয়া আমার অস্তিত্বকে প্রমাণ করে না।

৩.৪.৫. প্রসঙ্গ: ঈশ্বর

সাংখ্য সেশ্বর না নিরীশ্বর এ নিয়ে বিবাদের অন্ত নেই। একদল মনে করেন সাংখ্যে ঈশ্বর স্বীকার করা হয়েছে, আবার অন্যদল মনে করেন সাংখ্যে ঈশ্বর স্বীকার করা হয়নি। কিন্তু প্রশ্ন হয়, আদি প্রবক্তারূপে যেখানে মহর্ষি কপিল সুপ্রসিদ্ধ, সেখানে কাপিলমত গ্রহণেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, বিবাদের প্রয়োজনীয়তা কী? বস্তুত মহর্ষি কপিলের সুচিন্তিত মতামত লিপিবদ্ধ আকারে অদ্যাবধি অপ্রাপ্ত। ফলত পরম্পরার পরবর্তী ধারক-বাহক তথা অন্যান্য ব্যাখ্যাতারা নিজ নিজ ব্যাখ্যা বুদ্ধির অবসরে কাপিলমতকে বিশ্লেষণ করে সেশ্বরতা বা নিরীশ্বরতার আশ্রয় নিয়েছেন। অন্য আর একটি প্রশ্ন এই যে, সবকটি দর্শনপরম্পরার মুখ্য লক্ষ্য মুক্তির খোঁজ। সেখানে সেশ্বরবাদ বা নিরীশ্বরবাদ অবতারণার যৌক্তিকতা কোথায়? সচরাচর দর্শনশাস্ত্রে নিরীশ্বরবাদীরা বহুস্থলে নিন্দিত। ঈশ্বর স্বীকারের বা অস্বীকারের সাথে সেই মূল লক্ষ্যের সরাসরি যোগ বা বিয়োগ নেই। তথাপি তাবড় প্রথিতযশা দার্শনিক, যাদের মত অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে গৃহীত ও আদৃত হয়েছে তাদের সকলেই ঈশ্বর স্বীকার করেন। বিচার করলে দেখা যাবে মহর্ষি কপিলের মত অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সমাদরের সাথেই গৃহীত হয়েছে সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। অথচ মহর্ষি কপিল তো নিরীশ্বরবাদীরূপেই প্রসিদ্ধ। তাই সাংখ্যে সেশ্বরতার নাকি নিরীশ্বরতার প্রাধান্য সেই ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসা থেকেই যায়।

সাংখ্য সেশ্বর বা নিরীশ্বর?

প্রাবন্ধিকের বক্তব্যে যাবার পূর্বে এখানে পূর্বালোচনার (পূর্বে ২.৪.১৬ দ্রষ্টব্য) সংক্ষিপ্তবৃত্তির (Recap) অবতারণা করা চলে আলোচনার সুবিধার্থে। আমাদের কাছে সাংখ্যমতের বা কাপিলমতের সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ও প্রাপ্ত গ্রন্থরূপে শ্রীমদ্ ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত সাংখ্যকারিকাকে অনুসরণ করলে সাংখ্যশাস্ত্রকে নিঃসংশয়ে নিরীশ্বর সাংখ্য বলতে হয়।

এখন লক্ষণীয়, সেশ্বরবাদীরা কোথায় ঈশ্বর স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করেছেন। প্রথমত, এই জগৎ একটি কার্যবস্তু আর জগৎ যেখানে কার্যবস্তু সেখানে তার নির্মাণের জন্য একজন কর্তা স্বীকার করতে হয়। এই কর্তারূপে ঈশ্বরকেই স্বীকার করতে হয়। দ্বিতীয়ত, যে মোক্ষের জন্য দর্শনশাস্ত্রগুলির এত যুক্তিজাল, এত বাগাড়ম্বর সেই মোক্ষলাভেও ঈশ্বরের অনুগ্রহ উপযোগী।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হয়, উক্ত দুই ক্ষেত্রে নিরীশ্বরবাদীরা ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন কি? সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বরূপ কাঠামোর দৃষ্টিতে বিচার করলে কার্যসম্পাদনে প্রকৃতির স্বতঃপ্রবৃত্তি হয়। পুরুষের ভোগ সাধনের জন্যই সৃষ্টি আর এই সৃষ্টিকার্যে প্রকৃতির স্বয়ং প্রবৃত্তি। যেমন বৎস বা বাছুরের নিমিত্ত গাভীতে দুগ্ধের স্বয়ং প্রবৃত্তি হয়। প্রকৃতি স্বভাবতই সৃজনশীল। অতএব, সাংখ্যের দৃষ্টিতে সৃষ্টিকার্যের জন্য ঈশ্বর স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা নেই। অন্যদিকে মোক্ষলাভেও ঈশ্বরানুগ্রহের কোনও আবশ্যকতা নেই কারণ তত্ত্বজ্ঞানের ফলে জাত বৈরাগ্য ও তৎপরবর্তী যোগাভ্যাসের দ্বারাই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়। অবিদ্যার বিনাশে ভোগজাত সংস্কার বিনষ্ট হওয়ায় পুনরায় শরীর ধারণের সম্ভাবনা থাকে না। তখন পুরুষ মুক্তি লাভ করে। অতএব সাংখ্যকারিকার দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী।

এবার প্রাবন্ধিকের বক্তব্যে মনোনিবেশ করা চলে। সাংখ্য সেশ্বর অথবা নিরীশ্বর এই দ্বন্দ্বে সেশ্বরপক্ষে অন্তত চারজনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা হলেন ডাক্তার, মক্ষমূলর (Maxmüller), আচার্য উদয়ন ও আচার্য বিজ্ঞানভিক্ষু।

ডাক্তার বলতে কাকে বোঝাতে চেয়েছেন তা প্রবন্ধে স্পষ্ট নয়। তবে অনুমান করা চলে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কথা প্রাবন্ধিক বলতে চেয়েছেন। তার কারণ দুটি। প্রথমত, সেই সময় ভারতবিদ্যা চর্চায় তিনি ছিলেন পথপ্রদর্শক স্বরূপ। দ্বিতীয়ত,

সেশ্বরপক্ষ

পতঞ্জলি বিরচিত যোগসূত্রের উপর তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থে ঈশ্বর সম্পর্কে আলোচনা দৃষ্ট হয়। যোগদর্শনে *ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ* (*যোগসূত্র* ১/২৪) ইত্যাদি সূত্রের ব্যাখ্যায় তিনি ঈশ্বর প্রসঙ্গে আলোচনাবসরে উল্লেখ করেছেন, কপিল মতাবলম্বীরা ঈশ্বর স্বীকার করেন না। তবে পরে এই বলে সংযোজন করেছেন যে, কপিল মতাবলম্বীদের মধ্যে অনেকে *ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা* (৩/৫৭) এই কপিল সূত্র অবলম্বনে ঈশ্বর স্বীকারের পক্ষে দাবি রাখেন– "I should add here that some Kapilas do not wish openly to admit their atheism and appeal for support from the aphorism in which Kapila says "the existence of such a Lord is settled point", (3/57), meaning by 'such' an emergent Lord who has been absorbed into nature and who is in no sense the governor of creation"।[৪১]

যোগ দর্শনের আলোচনায় Maxmüller ঈশ্বরের প্রসঙ্গে বলেছেন, মহর্ষি কপিল তীব্রভাবে ঈশ্বরের অনস্তিত্বে নিজের পক্ষ রাখেননি, বরং বিষয়টি আলোচনার নিমিত্তই তিনি সম্মুখে উপস্থিত করেছেন– "And here it is important again to observe that Kapila does not make a point of vehemently denying the existence of an Īsvara, but seems likewise to have been brought to discuss the subject…"।[৪২]

অন্যদিকে নৈয়ায়িকপ্রবর আচার্য উদয়ন *ন্যায়কুসুমাঞ্জলিতে* এই সংসারে ঈশ্বরের অস্তিত্বে কোনও সন্দেহের অবকাশ রাখতেই নিষেধ করেছেন এবং উক্ত আলোচনাবসরে উপাস্য–উপাসক বর্ণনায় সাংখ্যমতাবলম্বীদের 'আদিবিদ্বানে'র উপাসক বলে চিহ্নিত করেছেন– "…আদিবিদ্বান্ সিদ্ধ ইতি কাপিলাঃ"।[৪৩]

আচার্য বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত *সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য* উদ্ধার করলে বোঝা যাবে ঈশ্বর স্বীকারে তাঁর প্রথম যুক্তি নিরীশ্বর শাস্ত্রের নিন্দা ও সেশ্বর শাস্ত্রের প্রশংসা– *অসত্যমপ্রতিষ্ঠংতে জগদাহরনীশ্বরম্ ইত্যাদি শাস্ত্রৈর্নিরীশ্বরবাদস্য নিন্দিতত্বাত্*। দর্শনের প্রশংসিত শাস্ত্রগুলির প্রায় সবকটিতেই ঈশ্বর স্বীকৃত। সাংখ্যশাস্ত্রও সর্বজনবিদিত ও সর্বশ্রুত। তাই সাংখ্যও নিরীশ্বরবাদী হতে পারে না। এবং দ্বিতীয় যুক্তি এই যে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিতে প্রয়োজন বৈরাগ্যের। এদিকে নিত্যৈশ্বর্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব জেনে ভোগাসক্ত মানুষ এই বৈরাগ্য হতে বিচ্যুত হতে পারেন। তাই বৈরাগ্যের পথ থেকে মানুষ যাতে বিচ্যুত না হয়, সেই উদ্দেশ্যে সাধারণভাবে নিত্যৈশ্বর্যশালী ঈশ্বর নেই একথা বলা হয়েছে মাত্র– *অস্মিন্নেব শাস্ত্রে ব্যাবহারিকস্যৈবেশ্বর–প্রতিষেধস্যৈশ্বর্যবৈরাগ্যাদ্যর্থমনুবাদত্বৌচিত্যাত্। যদি হি লোকায়তিকমতানুসারেণ নিত্যৈশ্বর্যং ন প্রতিষিধ্যেত, তদা পরিপূর্ণ–নিত্যনির্দোষৈশ্বর্যদর্শনেন তত্র চিত্তাবেশতো বিবেকাভ্যাসপ্রতিবন্ধঃ স্যাদিতি সাংখ্যাচার্য্যাণামাশয়ঃ*।[৪৪] প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের নিরাকরণ সাংখ্যের উদ্দেশ্য নয়।

তবে প্রাবন্ধিকের নিজের মত কিন্তু নিরীশ্বরবাদের পক্ষেই। যাইহোক, প্রথমেই বুঝে নেওয়া প্রয়োজন যে একটি বস্তুর নাস্তিত্ব কখন স্থাপিত হয়? যদি সেই বস্তুটির অস্তিত্বের প্রমাণ না থাকে কিংবা যদি বস্তুটির অনস্তিত্বের প্রমাণ থাকে। তাহলে একটি বস্তু বা বিষয় নেই– একথা তখনই সিদ্ধ হবে যখন সেই বস্তুটির থাকার কোনও প্রমাণ থাকবে না কিংবা বস্তুটির না থাকারও

নিরীশ্বরপক্ষ

প্রমাণ থাকবে। দৃষ্টান্তরূপে বলা যায়, লালবর্ণের কাক আছে এর কোনও প্রমাণ নেই তাই লালবর্ণের নাস্তিত্ব স্থাপিত হয়। আবার 'গোলাকার চতুষ্কোণ' বিশিষ্ট একটি বস্তু আছে এর যেমন কোনও প্রমাণ নেই তেমনই এরকম বস্তু থাকতে পারে না সেই প্রমাণও দেওয়া যায়। কেননা যে বস্তু গোলাকার তা চতুষ্কোণ হতে পারে না। এই ভিত্তিতে ঈশ্বরের নাস্তিত্ব সিদ্ধিতেও দুটি দিক উপস্থিত হল। একদল মনে করলেন ঈশ্বর নেই তার কারণ ঈশ্বরের অস্তিত্বে কোনও প্রমাণ নেই। আর একদল মনে করলেন ঈশ্বর নেই কারণ ঈশ্বরের অস্তিত্বে যেমন প্রমাণ নেই তেমনই তাঁর অনস্তিত্বে প্রমাণ আছে। তাহলে প্রশ্ন হয়, সাংখ্যে কোন্ দিকটি অবলম্বন করা হয়েছে নিরীশ্বরতার পক্ষ স্থাপনাতে?

প্রাবন্ধিকের মতে সাংখ্যে এই দুটি দিক থেকেই ঈশ্বরের নাস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রমাণের অভাব দেখানো হচ্ছে। *ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ* (*প্রবচনসূত্র* ১/৯২)[৪৫] ইত্যাদি সাংখ্যসূত্রোদ্ধার করলে বোঝা যায় ঈশ্বর অসিদ্ধ। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হয় অসিদ্ধ কেন? সাংখ্যসূত্রেই বলা হচ্ছে *প্রমাণাভাবান্ন তত্সিদ্ধিঃ* (*প্রবচনসূত্র* ৫/১০)।[৪৬] অর্থাৎ প্রমাণের অভাবেই তাঁর অসিদ্ধি। বস্তুত সাংখ্যদর্শনে তিনটি প্রমাণের কথা স্বীকার করা হয়েছে– প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ।

ঈশ্বর-অস্তিত্বে প্রমাণাভাব

এর মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরসিদ্ধির কোনও প্রশ্নই আসে না। অন্যদিকে অনুমান তখনই সম্ভব যখন দুটি বস্তুর মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ থাকে। প্রাবন্ধিক এক সহজ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, "যদি তোমায় জিজ্ঞেস করি তোমার প্রপিতামহের প্রপিতামহের কয়টি হাত ছিল তুমি বলিবে দুইটি। তুমি তাঁহাকে কখন দেখ নাই তবে কি প্রকারে জানিলে তাঁহার দুইটি হাত ছিল? বলিবে মানুষমাত্রেরই দুই হাত, এই জন্য। অর্থাৎ মানুষত্বের সহিত দ্বিভুজতার নিত্য সম্বন্ধ আছে এই জন্য"।[৪৭] তাহলে দুটি বস্তুর মধ্যে থাকা নিত্য সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তিই অনুমানের একমাত্র কারণ। যেমনভাবে অগ্নির সাথে ধূমের নিত্য সম্বন্ধ আছে বলে পর্বতে ধূম দেখে অগ্নির অনুমান করা যায় তেমনভাবে ঈশ্বরের সাথে ইহজগতের কোনও বস্তুর নিত্য সম্বন্ধ নেই, যা থেকে ঈশ্বরের অনুমান করা চলে। অতএব অনুমানের দ্বারাও ঈশ্বর সিদ্ধির প্রশ্ন নেই। আর রইল শব্দ প্রমাণ। আপ্তবাক্যকে শব্দ বলা হয়। আপ্তবাক্য এক অর্থে বেদবাক্য। কিন্তু সাংখ্যকার মনে করেন বেদে যে ঈশ্বরের উল্লেখ তা হয় কোনও মুক্তাত্মার প্রশংসা কিংবা কোনও সিদ্ধের উপাসনা–*মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা, উপাসা সিদ্ধস্য বা* (*প্রবচনসূত্র* ১/৯৫)।[৪৮] এইভাবে সাংখ্যসমর্থকরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রমাণের অভাব স্পষ্ট করেছেন।

প্রাবন্ধিকের মতে সাংখ্যকার শুধুমাত্র ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাবেই ক্ষান্ত হননি, তাঁর অনস্তিত্বেরও প্রমাণ দিয়েছেন।

ঈশ্বর-অনস্তিত্বে প্রমাণ

ঈশ্বরের লক্ষণ এই যে, তিনি মূলত সৃষ্টিকর্তা ও পাপ-পুণ্যের ফলদাতাস্বরূপ। কিন্তু এইখানে আপত্তি হয়, ঈশ্বর মুক্তস্বভাব নাকি বদ্ধস্বভাব? বদ্ধস্বভাব হতে পারেন না, কারণ তাতে স্বাতন্ত্র্য থাকে না। স্বাতন্ত্র্য না থাকলে সকলের নিয়ন্তা বা সকলের কর্তা ইত্যাদি হবেন কী প্রকারে? আর মুক্তস্বভাবও বলা যাবে না, কারণ যিনি মুক্ত তার কোনও প্রবৃত্তি হয় না। প্রাবন্ধিক সূত্রোদ্ধার করেছেন, *মুক্তবদ্ধযোরন্যতরাভাবান্ন তত্সিদ্ধিঃ* (*প্রবচনসূত্র* ১/৯৩)।[৪৯] অন্যদিকে ফলনিষ্পত্তির ব্যাপারে এইকথা যে, ঈশ্বর নিশ্চয়ই

কর্মানুযায়ী ফলের বিধান করেন। এখন পুণ্যকর্মে শুভফল ও পাপকর্মে অশুভফল প্রদান প্রত্যাশিত আর যদি তা না হয়, তাহলে সুবিচার হয় না। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কর্মই প্রকৃতপক্ষে ফলনিষ্পত্তির হেতু। তাহলে প্রশ্ন হয় যে, ফলনিষ্পত্তির জন্য কর্মের উপর আবার ঈশ্বর স্বীকারের যৌক্তিকতা কোথায়?

অতএব সাংখ্য নিরীশ্বরবাদে দ্বিতীয় মার্গের ধারক ও বাহক কারণ তারা মনে করেন, ঈশ্বরের অস্তিত্বে যেমন প্রমাণ নেই তেমনই তাঁর অনস্তিত্বে প্রমাণ আছে।

৩.৪.৬. প্রসঙ্গ: বেদ

অচলা বেদভক্তি ভারতবর্ষের শাস্ত্র-পরম্পরায় এক অভিনব বিষয়। বেদের প্রামাণ্য-অপ্রামাণ্য, নিত্যত্ব-অনিত্যত্ব, পৌরুষেয়ত্ব-অপৌরুষেয়ত্ব ইত্যাদি তত্ত্বের বিচারে সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা শাস্ত্রপারদর্শীদের মধ্যে খুব একটা দেখা যায় না। বরং মতানৈক্য বিবিধ মতের জন্ম দিয়েছে। সেই মতগুলি যে শুধুমাত্র কথার কথা এমনটা মনে করার কোনও কারণ নেই যেহেতু যুক্তিবলে ঐসকল মত প্রচারিত ও প্রসারিত।

ভারতবর্ষে শাস্ত্রনির্বিশেষে বেদের প্রতি যে আনুগত্য, সেই বিষয়ে প্রাবন্ধিক একজন যথার্থ বিশ্লেষকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। উৎসাহবিশেষ হোক বা তীক্ষ্ণশ্লেষ, তাঁর অভিপ্রায়- "এই বেদভক্তি ভারতবর্ষে অতিশয় বিস্ময়কর পদার্থ। আমরা এ বিষয়টি কিঞ্চিৎ সবিস্তারে লিখিতে ইচ্ছা করি"।[৫০] সমগ্র আলোচনাটিতে প্রথমে বেদ-মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। অনন্তর বেদের পৌরুষেয়ত্বে ও অপৌরুষেয়ত্বে যুক্তি-প্রতিযুক্তির উপস্থাপন করে সাংখ্যের দৃষ্টিকোণ ব্যাখ্যাত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিকের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি যথেষ্ট গভীরতার দাবি রাখে। বেদের গৌরব প্রদর্শনের মতোই অগৌরবের স্থলগুলিও পাঠকের সামনে তুলে ধরা প্রাবন্ধিক তাঁর নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করেছেন। আলোচনা-পর্যালোচনার শেষে যখন এই বিচার প্রকট হয়, বেদের মান্যতা স্বীকৃত নাকি অস্বীকৃত? তখন প্রাবন্ধিকের দৃষ্টিভঙ্গি বড়ই নিরপেক্ষ। এমনকি সমাধানের ভারও পাঠক-সমালোচকদের হাতে ছেড়ে রাখা হয়েছে।

বেদ অপার মহিমার আশ্রয়। তার প্রভাব কতখানি সেবিষয়ে একেবারে মাপজোখ করে বলা যায় না। এতটাই ব্যাপক সেই প্রভাব যে, শাস্ত্র-গ্রন্থগুলি স্থলবিশেষে স্বল্প বা দীর্ঘকথায় বর্ণনা করেছে। প্রাবন্ধিক বেদের গৌরব কীর্তনে আশ্রয় নিয়েছেন *মনুসংহিতা, শতপথ-ব্রাহ্মণ, বিষ্ণুপুরাণ, বৈয়াসিক-মহাভারত* (শান্তিপর্ব), *ঋক্‌সংহিতা* এবং *তৈত্তিরীয়-সংহিতার*।

মনুসংহিতা অনুসারে- ক) বেদ পিতৃ, দেবতা ও মনুষ্যের চক্ষুস্বরূপ। সনাতন বা শাশ্বত এই বেদ একাধারে 'অশক্য' অর্থাৎ কারও পক্ষে বেদ প্রণয়ন করা সম্ভব নয় এবং 'অপ্রমেয়' অর্থাৎ মীমাংসাদিশাস্ত্র নিরপেক্ষভাবে ঐ তত্ত্ব অবগত হওয়াও সম্ভব

বেদের গৌরব

নয়।[৫১] খ) বেদবাহ্য বা বেদবিরুদ্ধ শাস্ত্রসকল, যেগুলি মূলত কুদৃষ্টিমূলক বা অসৎ তর্কযুক্ত, সেই সব শাস্ত্র প্রেত্য অর্থাৎ পরকালে নিষ্ফল।[৫২] গ) বেদ ছাড়া আর যত কিছু শাস্ত্র আছে সেগুলি সব অর্বাচীনকালীন ফলত সেগুলি উৎপত্তি-বিনাশশীল।[৫৩] ঘ) চতুর্বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র), ত্রিলোক (স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল), ত্রিকাল (ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান), পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ) এই সকল বেদ হতে প্রকাশিত।[৫৪] ঙ) বেদশাস্ত্র মানুষের পুরুষার্থ সাধনের পরম উপায়স্বরূপ।[৫৫] চ) যিনি বেদশাস্ত্রবিদ তিনি সেনাপতিত্ব, রাজ্য, দন্ডনেতৃত্ব, সার্বভৌমত্বের যোগ্য। বেদশাস্ত্রবিদ যেকোনও আশ্রমে থেকেও ব্রহ্মে লীন হওয়ার যোগ্য।[৫৬] ছ) বেদরূপ পরব্রহ্ম একাধারে জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়ের শরণ। এমনকি যিনি স্বর্গফল কামনা করেন বা যিনি

মোক্ষের অভিলাষী, তারও অবলম্বনের আশ্রয় বেদ।[৫৭] জ) যিনি লোক হত্যাকারী, যত্র-তত্র ভোজনকারী, তিনি যদি *ঋগ্বেদ* মনে রাখেন তাহলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন।[৫৮] প্রাবন্ধিক *মনুসংহিতা* হতে বেদ-মাহাত্ম্য বর্ণনায় এখানে বিরতি দিয়েছেন। তবে আরও দু'একটি স্থল প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে। যথা- মহাহ্রদের উপরে নিক্ষিপ্ত পাথর যেমন সেই জলাশয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে যায় তেমনই সকল প্রকার নিষিদ্ধ আচরণ তিন বেদের মধ্যে লীন হয়ে যায়।[৫৯] আবার অগ্নি যখন প্রবলরূপে প্রজ্বলিত হয় তখন যেমন সমস্ত কিছু দগ্ধ করে ফেলে তেমনই বেদজ্ঞ ব্যক্তি নিজের কর্মজনিত দোষগুলির বিনাশ করে থাকেন।[৬০] অন্যদিকে, *শতপথ-ব্রাহ্মণ* অনুসারে সকল ছন্দ, স্তোম, প্রাণ ও দেবতাগণের আত্মাস্বরূপ এই বেদ। আবার, *বিষ্ণুপুরাণ* অনুসারে দেবাদির রূপ, নাম, কর্ম প্রভৃতি সকল বেদশব্দ হতে সৃষ্ট। সেই সাথে, *বৈয়াসিক-মহাভারত* অনুসারে বেদ ব্রহ্মার পরম চক্ষু, পরম বল ও উত্তম আশ্রয় স্বরূপ। বেদ ব্যতীত লোকসৃষ্টিতে তিনি অক্ষম।[৬১] এবং *ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমে* আচার্য সায়নের মতে, বেদ হতে এই অখিল জগতের নির্মাণ।[৬২]

এইভাবে বেদমাহাত্ম্য কীর্তনের পর বেদের উৎপত্তি নিয়ে প্রাবন্ধিক জিজ্ঞাসার অবতারণা করেছেন। বেদের উৎপত্তিতে বহুল প্রসিদ্ধ বিতর্কের স্থল তার পৌরুষেয়ত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব নিয়ে। একদল মনে করেন বেদ নিত্য, বেদের কোনও প্রণেতা থাকতে পারে না। অন্যদিকে অপর একদল মনে করেন বেদ সৃষ্ট। বেদের প্রণেতা আছেন। স্বপক্ষ স্থাপনে এক এক দল অন্যান্য শাস্ত্র-গ্রন্থ হতে প্রমাণ উদ্ধারেও সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু একটি সর্বজনীন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতে পারেনি কোনও পক্ষই। প্রাবন্ধিকের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ- "হিন্দুশাস্ত্রের কি আশ্চর্য্য বৈচিত্র্য! সকলেই বেদ মানেন কিন্তু বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন দুইখানি শাস্ত্রীয় গ্রন্থের ঐক্য নাই"।[৬৩]

বেদ সৃষ্ট এবং পৌরুষেয়- এরূপ যুক্তির স্বপক্ষে প্রাবন্ধিক যে সুদীর্ঘ 'রেফারেন্স' দিয়েছেন এখন তার উল্লেখ করা হচ্ছে- ক) *ঋগ্বেদের* 'পুরুষসুক্তে' বর্ণনা রয়েছে- পুরুষকে পশুরূপে চিন্তা করে নিষ্পন্ন মানসযজ্ঞে ঋক, সাম, যজু এই বেদত্রয়ের উৎপত্তি।[৬৪] খ) *অথর্ববেদে* বেদের উৎপত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন দিগ্‌নির্দেশ বিদ্যমান। যেমন কোথাও বলা হয়েছে ইন্দ্র হতে বেদের উৎপত্তি, কোথাও কাল হতে, কোথাও বা গায়ত্রী হতে। আবার *অথর্ববেদের* অন্তর্গত 'আয়ুর্বেদ' ব্রহ্মার মন থেকে উৎপন্ন- এরূপ বক্তব্যও উপলব্ধ। গ) *শতপথ-ব্রাহ্মণে* বেদের উৎপত্তিতে অনেকগুলি মতের সংকলন লক্ষ্য করা যায়। যেমন কোথাও

বেদ পৌরুষেয়

অগ্নি হতে ঋক্, বায়ু হতে যজুঃ ও সূর্য হতে সামবেদের উৎপত্তি বর্ণিত হয়েছে, কোথাও বা প্রজাপতি কর্তৃক বেদসৃষ্টির ব্যাখ্যান, কোথাও বা জল হতে অণ্ডের এবং সেই অণ্ড হতে বেদত্রয়ের সৃষ্টির বর্ণনা, কোথাও বা মহাভূতের অর্থাৎ ব্রহ্মার নিশ্বাস হতে বেদের উৎপত্তির দিশা নির্দেশ, কোথাও আবার মনরূপ সমুদ্র হতে বাক্‌রূপ শাবলের দ্বারা দেবতাগণ কর্তৃক বেদ উদ্ধারের কাহিনী। ঘ) *তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণের* নির্দেশ, প্রজাপতি সোমকে সৃষ্টির পর বেদত্রয়ের সৃষ্টি করেন। ঐ ব্রাহ্মণেই অন্যত্র প্রজাপতির শ্মশ্রু হতে বেদের উৎপত্তির এবং বেদমাতারূপে বাগ্‌দেবীর উল্লেখ লক্ষণীয়। ঙ) *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্* অনুসারে প্রজাপতি (হিরণ্যগর্ভ) বাক্ সৃষ্টি করে সেই বাক্ হতে সকল বেদাদির সৃষ্টি করেছেন।[৬৫] চ) *বিষ্ণুপুরাণ*, *ভাগবত পুরাণ* ও *মার্কণ্ডেয় পুরাণের* মতে বেদ ব্রহ্মার মুখ হতে উৎপন্ন। ছ) *বৈয়াসিক-মহাভারতের* 'ভীষ্মপর্বে' বলা হচ্ছে বিষ্ণু মন হতে বেদের সৃষ্টি করেছিলেন। জ) *হরিবংশে* অনেকটা 'পুরুষসুক্তে'র ধাঁচে, গায়ত্রীসম্ভূত ব্রহ্মতেজোময় পুরুষের মুখমণ্ডলের বিবিধ প্রত্যঙ্গ হতে বেদের সৃষ্টি বর্ণিত হয়েছে; যথা- নেত্রদ্বয় হতে ঋক্ ও যজুঃ, জিহ্বাগ্র হতে সাম ও মূর্দ্ধা হতে অথর্বের এরূপে চারটি বেদের সৃষ্টি। ঝ) দর্শন পরম্পরাগুলিতে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক সম্প্রদায় বেদ পরমপুরুষের বা পরমেশ্বর রচিত বলে মনে

করেন। এবং ঞ) *বৈয়াসিক-মহাভারতের* 'শান্তিপর্বে' অসাধারণ তেজস্বী ব্রহ্মাকর্তৃক পদ্মের উপর অবস্থানরত অবস্থায় সুন্দরমূর্তি চারটি বেদের সৃষ্টির কথা বর্ণিত হয়েছে।[৬৬]

অপরদিকে বেদ অপৌরুষেয় এই পক্ষেও প্রাবন্ধিক বেশ কিছু যুক্তি দিয়েছেন। যথা– ক) বেদভাষ্যকার সায়নাচার্য *ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকায়* বেদকে পরমেশ্বরের নিশ্বাসস্বরূপ বলে উল্লেখ করেছেন।[৬৭] অর্থাৎ নিশ্বাস যেমন স্বাভাবিক তেমনই বেদরাশিও তাঁর স্বাভাবিক কর্ম। খ) মাধবাচার্য *তৈত্তিরীয় যজুর্বেদের* 'বেদার্থপ্রকাশ' নামক টীকায় বেদের অপৌরুষেয়ত্বে

বেদ অপৌরুষেয়

এই যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ব্যবহারকালে কালিদাসাদির বাক্যের ন্যায় বেদ পুরুষবিরচিত নয়, তাই অপৌরুষেয়। গ) দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে মীমাংসক ও বেদান্তী বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদন করেছেন। তাদের যুক্তিতে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও ইন্দ্রিয়ের অপূর্ণতা এই চারটি দোষ মনুষ্যকৃত রচনায় দৃষ্ট হয়; কিন্তু বেদে যেহেতু এই দোষগুলির স্থান নেই সেহেতু বেদ অপৌরুষেয়। আরও কয়েকটি যুক্তি এই স্থলে উল্লেখ্য। যেমন– ঘ) *বৃহদারণ্যকোপনিষদে* বেদসকলকে নিশ্বাসের মতই পরমেশ্বরের স্বাভাবিক কর্ম বলে নির্দেশ করা হয়েছে।[৬৮] ঙ) *পরাশর সংহিতার* বক্তব্য বেদের কেউ কর্তা নেই, চতুর্মুখ ব্রহ্মা কেবল স্মরণকর্তা মাত্র।[৬৯] চ) *নিরুক্তে* আচার্য যাস্কও বেদের অপৌরুষেয়ত্বেই মত পোষণ করেন। সেকারণেই ঋষি শব্দের মন্ত্রকর্তা নয়; মন্ত্রদ্রষ্টা অর্থ নিরুক্তকারের অভিপ্রেত । ঋষি শব্দের ব্যুৎপত্তিতে বেদকে তিনি স্বয়ম্ভু বা উৎপত্তিরহিত বলে নির্দেশ করেছেন।[৭০] ছ) এমনকি এই তত্ত্বও প্রসিদ্ধ যে, যুগান্তে অর্থাৎ প্রলয়কালে বেদ অভিন্নরূপে অবস্থান করে এবং ঋষিগণ কেবল সেই স্বয়ম্ভু বেদকে তপস্যাদ্বারা লাভ করেন।[৭১]

সুতরাং একথা সত্য যে বেদের উৎপত্তিতে ঐক্যমতে পৌঁছানো দুষ্কর কর্ম। পৌরুষেয়ত্বে যেমন একাধিক যুক্তি তেমনই অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদনেও সমান তৎপরতা। এ বিতর্ক আবহমান কালের। তাই শ্রীমদ্ অনির্বাণকে উদ্ধার করেই এই আলোচনার মধ্যান্তর ঘোষণা করা যাক– "বস্তুত অপৌরুষেয়বাদের মূল কথাটা হল চেতনার স্রোত্তরণ। অপক্ষপাতে বলতে পারি, সকল ধর্মেরই মূল অপৌরুষেয়। ভারতবর্ষ একথাটা গোড়াতেই স্বীকার করেছে। সত্যের প্রশ্নটা যখন তার বাঙ্ময়

ঐক্যমতের সন্ধানে

প্রকাশকে অতিক্রম করে তত্ত্বভাবনার কোঠায় উত্তীর্ণ হয়েছে, তখন বৈদিক আর অবৈদিক ধারার মধ্যে কোনও তফাত থাকেনি। অলক্ষ্যে তারা এসে মিলেছে একই আর্যচিত্তের অপৌরুষেয় তত্ত্বসাক্ষাৎকারের সাধারণ ভূমিতে। তাই আমরা দেখতে পাই আদিম বৈদিক যুগেরই মত ভারতবর্ষের অধ্যাত্মচিন্তার পরবর্তী যুগে নর আর বিপ্রের সাধনধারা পরস্পর মিলে গেছে। কপিল, কণাদ, গৌতম তার্কিক হয়েও বেদপন্থী সমাজে সর্বজনমান্য, বুদ্ধ অবৈদিক হয়েও সত্যকার বেদ ও ব্রাহ্মণে শ্রদ্ধাশীল, হিন্দু বৌদ্ধ জৈন সবারই অধ্যাত্মসাধনার একটা সাধারণ নাম 'ব্রহ্মচর্য'। আর এই 'ব্রহ্ম' কথাটির মধ্যে সেই বৈদিক যুগ হতে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের অধ্যাত্মসাধনার সমগ্র ইতিহাসটি ধরা রয়েছে। এই একটি শব্দের ব্যঞ্জনার মধ্যে এসে মিলেছে এখানকার সাধনার প্রত্যক্-বৃত্ত আর পরাক্-বৃত্ত দুটি ধারাই। চেতনার ক্লিষ্টতা হতে মুক্তি চাই মানবাত্মার এই চিরন্তন আকূতি। সে মুক্তির আশ্বাস যেখান থেকেই আসুক না কেন, তাকেই তুল্যভাবে আপ্তবচন বলে মেনে নিতে হবে তার লোকোত্তর ব্যঞ্জনার প্রতি লক্ষ্য রেখে। আপ্তবাণী ঈশ্বরের হতে পারে, দেবমানবের হতে পারে, শুধু বাণীও হতে পারে। কিন্তু সর্বত্রই তা লোকোত্তর শাশ্বত একটা অপৌরুষেয় তত্ত্বেরই প্রকাশ, কেননা সে তত্ত্ব পাওয়া গেছে আমাদের লৌকিক

প্রমাণবিধিকে অতিক্রম করে, পাওয়া গেছে শ্রদ্ধার দ্বারা এবং তপস্যার দ্বারা, পাওয়া গেছে অন্তরাবৃত্ত চিত্তের অনুধ্যান দ্বারা”।[৭২]

সাংখ্যের দৃষ্টি

যাইহোক, এখন বেদের পৌরুষেয়ত্ব–অপৌরুষেয়ত্ব সম্পর্কে সাংখ্যের দৃষ্টিভঙ্গির প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন প্রাবন্ধিক। প্রাবন্ধিকের শ্লেষ– “কেহ বলেন বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়, কেহ বলেন বেদ সৃষ্ট এবং ঈশ্বরপ্রণীত। ইহা ভিন্ন তৃতীয় সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। কিন্তু সাংখ্যপ্রবচনকারের মত সৃষ্টিছাড়া”।[৭৩] সৃষ্টিছাড়া কেন? কারণ প্রাবন্ধিক মনে করেন, সাংখ্য পৌরুষেয়ত্ব বা অপৌরুষেয়ত্ব কোনও পক্ষই অবলম্বন করে না। সাংখ্য বেদের অপৌরুষেয়ত্বের ব্যাখ্যান করে না, যেহেতু বেদেই বেদের উৎপত্তির কথা উল্লেখ রয়েছে– *ন নিত্যত্বং বেদানাং কার্যত্বশ্রুতেঃ* (*প্রবচনসূত্র* ৫/৪৫)।[৭৪] অপরদিকে বেদের পৌরুষেয়ত্বের স্বপক্ষেও যুক্তি দেওয়া যায় না। যেহেতু যিনি পুরুষ তিনি মুক্ত হলে বেদসৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হবেন না আর তিনি বদ্ধ হলে অসর্বজ্ঞত্ব হেতু বেদসৃজনে সক্ষম হবেন কী করে?– *ন পৌরুষেযত্বং তত্কর্তুঃ পুরুষস্যাভাবাত্* (*প্রবচনসূত্র* ৫/৪৬) তথা *মুক্তামুক্তযোরযোগ্যত্বাত্* (*প্রবচনসূত্র* ৫/৪৭)।[৭৫] স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হয় পৌরুষেয় নয়, অপৌরুষেয়ও নয়; তাহলে সাংখ্যের দৃষ্টিতে বেদের অবস্থান কী? *সাংখ্যপ্রবচনসূত্র* উদ্ধার করলে দেখা যাবে, অঙ্কুরাদি যেমন অপৌরুষেয় তথাপি নিত্য নয় তেমনই বেদ অপৌরুষেয় হয়েও নিত্য হয় না– *নাপৌরুষেযত্বান্নিত্যত্বমঙ্কুরাদিবত্* (*প্রবচনসূত্র* ৫/৪৮)।[৭৬] সাংখ্য তাই বেদের প্রবাহনিত্যতা স্বীকার করে, অনাদিনিত্যতা স্বীকার করে না। কীরকম? সাংখ্যের যুক্তিতে প্রতিটি মন্ত্রের দ্রষ্টা এক একজন ঋষি। সেই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির পর গুরুশিষ্য পরম্পরায় বেদের অধ্যয়ন অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে চলে আসছে। ফলত বেদের সজাতীয় উচ্চারণপ্রবাহের উচ্ছেদ কোনও কালেই ঘটছে না। এইরূপ উচ্চারণপ্রবাহের নিত্যতা সাংখ্যের স্বীকার্য কিন্তু কূটস্থরূপে বা অনন্তরূপে বা অনাদিরূপে বেদের নিত্যত্ব সাংখ্যের স্বীকার্য নয়।

সাংখ্য
বৈদিক অথবা অবৈদিক ?

প্রাবন্ধিকের মতে, উক্ত বিষয়টিকে ‘অনবধানতাপ্রযুক্ত ভ্রান্তি’ মনে করার কোনও কারণ নেই যেহেতু সাংখ্যকার যথেষ্ট বুদ্ধিধর। বরং এই অভিগমন (approach) তাঁর এক সুপরিকল্পিত কৌশলী পন্থা। আমাদের ভাষায় ‘tactics’ বা ‘calculated risk’ বলা যেতে পারে। তৎকালীন সমাজের প্রেক্ষিতে অচলা বেদভক্তির অর্ঘ্য উপেক্ষা করার কোনও উপায়ান্তর না দেখে সাংখ্যকার অন্তরের ভক্তি না থাকলেও মৌখিক বেদভক্তি অবলম্বন করেছেন প্রতিবাদীদের নিরস্ত করতে। প্রাবন্ধিকের বয়ানে “সাংখ্যকারের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাও বিচিত্র, ভ্রান্তিও বিচিত্র। সাংখ্যকার যে এমন রহস্যজনক ভ্রান্তিতে অনবধানতাপ্রযুক্ত পতিত হইয়াছিলেন, আমরা এমত বিবেচনা করি না। আমাদিগের বিবেচনায় সাংখ্যকার অন্তরে বেদ মানিতেন না, কিন্তু তাৎকালিক সমাজে, ব্রাহ্মণে এবং দার্শনিকে কেহ সাহস করিয়া বেদের অবজ্ঞা করিতে পারিতেন না। এজন্য তিনি মৌখিক বেদভক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যদি বেদ মানিতে হইল তবে আবশ্যকমত প্রতিবাদীদিগকে নিরস্ত করিবার জন্য স্থানে স্থানে বেদের দোহাই দিয়াছেন। কিন্তু তিনি অন্তরে বেদ মানিতেন বোধ হয় না। বেদ পৌরুষেয় নহে, অপৌরুষেয়ও নহে এ কথা কেবল ব্যঙ্গ মাত্র”।[৭৭]

প্রাবন্ধিকের যুক্তি অনস্বীকার্য। শ্রীমদ্ অনির্বাণকে উদ্ধার করলে দেখা যাবে তিনিও সাংখ্যমতকে অবৈদিক বলে উল্লেখ করেছেন। তবে একথা বলতে দ্বিধা করেননি যে সাংখ্যমত কখনই অনার্য নয়। তাঁর মতে আর্যভাবনায় ঋষিপ্রবর্তিত ও মুনিপ্রবর্তিত এই দুইটি ধারার মধ্যে কপিল মুনিধারার প্রবর্তক কারণ তিনি ছিলেন সিদ্ধ[৭৮] এবং তিনি দেখিয়েছেন

বৃহদারণ্যকোপনিষদের 'যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ডে' অক্ষরব্রহ্মবাদে সাংখ্যের এই মুনিধর্মধারার ভাবনা অনেকখানি অনুপ্রবিষ্ট।[৭৯] এমনকি সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব সেই অক্ষরব্রহ্ম তত্ত্বের অঙ্গীভূত বলে তিনি মনে করেন।[৮০] তাই নতুন ইন্ধন না জুগিয়ে বরং শ্রীমদ্ অনির্বাণকে উদ্ধার করেই এই প্রসঙ্গের ইতি ঘোষণা করা চলে– "সাংখ্যমত মূলত অবৈদিক হলেও অনার্য নয়। আর্যভাবনার দুটি মূলধারা– একটি ঋষিপ্রবর্তিত আরেকটি মুনিপ্রবর্তিত। কপিল মুনিধারার প্রবর্তক, তিনি সিদ্ধ, তাঁর দর্শন সাংখ্যদর্শন। বৃহদারণ্যকোপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ডটি খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় যাজ্ঞবল্ক্যের অক্ষরব্রহ্মবাদে এই সাংখ্যভাবনা কতখানি অনুপ্রবিষ্ট। মুনিধর্ম এবং প্রব্রজ্যা দুইই তাঁর অঙ্গীকৃত। সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব তাঁর ব্রহ্মতত্ত্বের অঙ্গীভূত, সাংখ্যযোগের নাড়ীবিজ্ঞান তাঁর জানা। প্রত্যক্ দৃষ্টিতে তাঁর অক্ষর-ব্রহ্মবাদ এবং সাংখ্যের কৈবল্যবাদ একই মৌন অনুভবের দুটি দিক"।[৮১]

প্রাবন্ধিক নিরপেক্ষ বেদ বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তাই বেদের গৌরব প্রদর্শনের মতো তার অগৌরব প্রদর্শনও কর্তব্য বলে বিবেচনা করেছেন। বেদের অগৌরব প্রদর্শনে প্রথমেই তিনি আশ্রয় নিয়েছেন *মুণ্ডকোপনিষদের*। যেখানে ঋষি অঙ্গিরা শৌনককে পরা ও অপরা এই দুই বিদ্যার নির্দেশ করে অপরা বিদ্যারূপে বেদচতুষ্টয়ের উল্লেখ করেছেন।[৮২] এখন 'অপরা' মানেই কি অগৌরবের? আচার্য শংকর *মুণ্ডকোপনিষদের* ভাষ্যে বলেছেন,*পরা চ পরমাত্মবিদ্যা, অপরা চ ধর্মাধর্মসাধন-তত্ফলবিষয়া* । পরা বিদ্যা অপেক্ষা অপরা বিদ্যা লঘু। অর্থাৎ পরা বিদ্যা শ্রেষ্ঠ হলে অপরাবিদ্যা শ্রেষ্ঠেতর। কিন্তু এ প্রশ্ন স্বাভাবিক, যে বিদ্যা ধর্ম ও অধর্ম বিষয়ক জ্ঞানের প্রমাণ, তা শ্রেষ্ঠেতর হলেও অগৌরবের হয় কীরূপে? অপরদিকে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* দ্বিতীয় অধ্যায়ের কয়েকটি শ্লোক[৮৩] উদ্ধার করে প্রাবন্ধিক দেখাতে চেয়েছেন বেদপারায়ণদের অর্থাৎ বেদই যাদের পরম আশ্রয় তাদের নিন্দা। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* অনুসারে যারা বেদের তাৎপর্যে প্রকৃতপক্ষে অনভিজ্ঞ তারা স্বর্গাতিরিক্ত অন্য বস্তু (মোক্ষ) স্বীকার করেন না এবং জন্ম-কর্ম-কর্মফল ইত্যাদি যে আপাতরমণীয় কর্মকাণ্ডময়ী বাণীকেই প্রকৃষ্ট বলে মনে করেন। এই আপাতরমণীয় বাণীকে 'পুষ্পিতাং বাচং' অর্থাৎ পুষ্পিত পলাশের সাথে তুলনা করা হয়েছে। ফুল্লকুসুমিত পলাশ বৃক্ষ যেমন দর্শনমাত্র মনোহর কিন্তু পরিণামে বিন্দুমাত্রও ফলপ্রদ নয়, তেমনই বেদের কর্মকাণ্ডও ভোগৈশ্বর্যের প্রতি নিবিষ্ট যা আপাতরমণীয় হলেও পরিণামরমণীয় নয়। এমনকি কর্মকাণ্ডাত্মক বেদকে ত্রৈগুণ্যবিষয় বলেই নির্দেশ করা হয়েছে। ত্রৈগুণ্য অর্থাৎ সংসার। অতএব বেদের কর্মকাণ্ডে এই ত্রৈগুণ্যবিষয়ক সংসারের প্রতিপাদন। তাই নিস্ত্রৈগুণ্য হওয়ার উপদেশ লক্ষ্য করা যায়– *ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন*।[৮৪] তবে একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বেদের কর্মকাণ্ডের ভাগটিকে বা ঐ অংশের অনুসরণকারীদেরই নিন্দা করা হয়েছে। জ্ঞানকাণ্ড বা জ্ঞানকাণ্ডের অনুসরণকারীদের নিন্দা করা হয়নি। তাই সামগ্রিকভাবে বেদের অগৌরব বলা যায় কি? প্রাবন্ধিক *কঠোপনিষদ্* উদ্ধার করেছেন– *নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো/ ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন*।[৮৫] প্রবচন অর্থাৎ বেদপাঠের দ্বারা সেই দুর্বিজ্ঞেয় আত্মতত্ত্বকে লাভ করা যায় না। এখানেও কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। কোনও এক পাঠক খুব ভালো *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করেন, খুব ভালো বোঝানও কিন্তু তার নিজের অনুভূতি একেবারে শূন্য হওয়ায় হরিনামের দ্বারা ভবসাগর তো দূর অস্ত, ছোট নদীও পার করতে তিনি অসমর্থ। অপরদিকে, নিরক্ষর গোয়ালিনী পড়তে তথা পড়াতে না পারলেও কেবল উপলব্ধির দ্বারাই ভবসাগর পার করে যায়।[৮৬] সুতরাং পাঠকের উপলব্ধিই মূল, পাঠ্যবিষয়ের অবস্থান কিন্তু নিরপেক্ষ। তাই বেদপাঠের দ্বারা যিনি উপলব্ধি করেননি তার নিন্দা অবশ্যই করা উচিত কিন্তু তাতে পাঠ্য বেদরাশির অগৌরব কোথায়? প্রাবন্ধিক *ভাগবত পুরাণ* অবলম্বন করেছেন, যেখানে বলা হচ্ছে পরমেশ্বরের অনুগ্রহ হলে ব্যক্তি বেদ ত্যাগ করেন।[৮৭] কিন্তু এখানেও একই কথা প্রযোজ্য পরমেশ্বরের অনুগ্রহ যদি

বেদের অগৌরব

শ্রেষ্ঠ বিষয় হয় তাহলে বেদাদি শ্রেষ্ঠেতর হয়। তবে অগৌরবের হয় না। তাই নিরপেক্ষ বিচার করতে গিয়ে বেদের অগৌরব প্রদর্শনের পক্ষে প্রাবন্ধিক প্রদর্শিত যুক্তিগুলি সহজেই স্বীকার্য নয়।

বেদের পৌরুষেয়ত্ব–অপৌরুষেয়ত্ব নিয়ে যেমন সংশয়ের বাতাবরণ বিদ্যমান তেমনই অগৌরবের দিকও উপলব্ধ। তাই এমতাবস্থায় বেদের মান্যতা নিয়ে প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক। প্রামাণ্য–অপ্রামাণ্যের বিচারে নাস্তিক পরম্পরার দর্শনগুলি বেদের মান্যতাতে শুরু থেকেই প্রশ্ন তুলে আসছে। আস্তিক পরম্পরার দর্শনগুলি বেদের মান্যতা স্বীকার করে। তবে প্রত্যেকের স্বীকারে কিছু ভিন্নতা আছে। বেদের মান্যতা প্রতিষ্ঠাপনে সর্বাগ্রে অবস্থানকারী হলেন মীমাংসক। বেদের অস্তিত্বে প্রমাণের অপেক্ষায় মীমাংসক শব্দপ্রমাণের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শব্দপ্রমাণ বেদ বহির্ভূত শাস্ত্র যথা স্মৃতিতেও প্রযোজ্য তাই এইরূপ অতিব্যাপ্তি দোষ নিরাসনে মীমাংসক পুনরায় বেদের মধ্যেই বেদচতুষ্টয়ের নামোল্লেখ থাকার যুক্তি দিয়েছেন। এবং মীমাংসকের যুক্তি, বেদের 'অঘটন–ঘটন–পটীয়সী–অলৌকিকশক্তি'র কারণে বেদের মধ্যে থাকা বাক্যগুলি বেদের অস্তিত্বে প্রমাণ। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক সুচতুর মন্তব্য করেছেন– "এ সম্বন্ধে কেবল ইহাই বক্তব্য যে, যদি বেদের এরূপ শক্তি থাকে তবে বেদ অবশ্য মান্য। কিন্তু সে শক্তি আছে কি না, এই এক স্বতন্ত্র বিচার আবশ্যক হইতেছে"।[৮৮] প্রাবন্ধিকের মতে ভারতবর্ষ সনাতন ধর্মমূলক। তাই বেদ মান্য নাকি অমান্য? এর থেকে গুরুতর প্রশ্ন দ্বিতীয় নেই। ভারতবর্ষের ভাবী মঙ্গলামঙ্গল এই প্রশ্নের মীমাংসার উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। প্রাবন্ধিক প্রশ্নের গুরুত্ব ও গম্ভীরতা ব্যাখ্যায় 'মুখব্যাদান' করলেও উত্তরের বেলায় কূটনৈতিকভাবে বিতর্কের ধার–পাশ দিয়ে না গিয়ে বিচারের দরজা খোলা ছেড়েছেন– "পাঠক দেখিবেন, বেদ মানিব কেন? এ প্রশ্নের আমরা কোন উত্তর দিই নাই। দিবারও আমাদের ইচ্ছা নাই। যাঁহারা সক্ষম তাঁহারা সে মীমাংসা করিবেন"।[৮৯] তাই বেদ–মান্যতার এই সংশয়ে কোনও একটি কোটিতে সিদ্ধান্ত স্থাপন না করে শ্রীমদ্ অনির্বাণের মন্তব্য দিয়েই প্রসঙ্গের ইতি ঘোষণা করা যায়– "বেদের শব্দরাশি নিত্য– এ বিশ্বাস বেদপন্থীর একার নয়। পৃথিবীর সব ধর্মই তাদের বাণীকে ঈশ্বরবাণী অতএব নিত্য বলে ঘোষণা করেছে। যেসব ধর্ম প্রবক্তাতে বিশ্বাস করে তারা প্রবক্তার বাণীকে উৎপন্ন বলে স্বীকার করতে বাধ্য হলেও সে বাণী যে কোনও মূল দিব্যবাণীরই অভিব্যক্তি মাত্র, একথা জোরের সঙ্গেই বলেছে। অপৌরুষেয়ত্ব বা অলৌকিকত্বের সঙ্গে নিত্যত্বের একটা ন্যায়সিদ্ধ সম্পর্ক আছে। আসলে দুটি ভাবনাই মানুষের চেতনার স্রোত্তরণের প্রয়াস হতে উদ্ভুত। স্রোত্তরণের প্রবেগ মানুষের প্রাকৃত জীবনেও আছে। আমরা আছি একটা ঝামেলার মাঝে, ভেসে চলেছি পরিবর্তনের স্রোতে। এর মধ্যে সত্তার একটা স্থির নির্ভর কোথাও চাই নইলে আমাদের কাজ চলে না। বাইরে যেমন প্রকৃতির ক্রিয়াসারূপ্যের উপর আমাদের বিশ্বাস, অন্তরেও তেমনি চাই একটা অধ্যাত্ম ক্রিয়াসারূপ্যের অচল প্রতিষ্ঠা। চিত্তের এমন একটা ভূমি চাই, যাকে বলতে পারি প্রাকৃত চেতনার সমস্ত বৃত্তির আশ্রয়, তার সমস্ত কর্মপ্রবৃত্তির একটা নির্ভরযোগ্য উৎস। এই অধ্যাত্মপ্রতিষ্ঠাকেই পরাক্ দৃষ্টিতে বলি ঈশ্বর, প্রত্যক্ দৃষ্টিতে বলি আত্মা। এই গভীর উৎস হতে উৎসারিত যে বাণী, যা আমাদের কর্ম এবং ভাবনাকে সংশয় ও অনৈশ্চিত্যের আন্দোলন হতে প্রতিষ্ঠার ভূমিতে উত্তীর্ণ করে, তাই আমাদের কাছে আপ্তবাণী শাস্ত্র বা বেদ"।[৯০]

বেদের মান্যতা ?

৩.৫. উপসংহার

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন পরিপূর্ণরূপে গৃহী। স্বাভাবিকভাবেই প্রবৃত্তির একেবারে ধ্বংস তিনি চাননি। তবে জীবনের অভাববোধ থেকেই এমন তাৎপর্য খুঁজে পেতে চেষ্টা করেছেন যা তার গতিপথকে উর্দ্ধায়িত করে। তাঁর চিন্তাভাবনার ধারা

ছিল প্রগতিশীল। যে শিক্ষা বা যে ভাবনা প্রগতির কথা বলে না; তিনি সেই পথের পথিক হতে চাননি– "ভারতবর্ষে দেখতে পাই মনীষার এমন একটি ধারা যাতে শিক্ষণীয় অনেক কিছু আছে কিন্তু সে ধারা রুদ্ধগতি ও ক্ষয়িষ্ণু। এখনো টোলে দর্শন শিক্ষার ব্যবস্থা আছে কিন্তু সে শিক্ষা অনুর্বর নিষ্ফল"।[৯১] স্বাভাবিকভাবে, তত্ত্ব (theory) ও প্রয়োগ (application) এই দুই ধারার মধ্যে তিনি দৃঢ়ভাবে দ্বিতীয় মার্গের কথা বলেছেন– "হিন্দু দর্শনকে দুভাবে পড়া যেতে পারে– শুধুই তত্ত্বের জন্য অথবা ভারতীয় ইতিহাসের গতিকে বোঝার জন্য। যে চিন্তা জাতীয় সমাজের পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করছে, সেটাই জানা এখন আমাদের দরকার হয়ে পড়েছে। নিছক তত্ত্বের জন্য হিন্দু দর্শন পড়ার দরকার আছে বলে মনে হয় না"।[৯২] একথা বোধগম্য হয় যে, ভারতীয় সমাজের তাৎকালিক গতিকে উপলব্ধির অভিপ্রায়েই সম্ভবত তিনি সাংখ্যের ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করেছিলেন।

যথেষ্ট আধুনিক ও স্পষ্টদৃষ্টিতে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর 'লক্ষ্য পাঠক' (target reader) পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং "এই শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের উক্তি সহজে বুঝিতে পারেন না। বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া দিলেও তাহা বুঝিতে পারেন না"।[৯৩] পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বশবর্তী হওয়ায় প্রাচীন ভারতীয় চিন্তা-প্রণালী ঐ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট অপরিচিত। তাই "তাঁহাদিগকে বুঝাইতে গেলে পাশ্চাত্য প্রথা অবলম্বন করিতে হয়, পাশ্চাত্য ভাবের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়"।[৯৪] সেই কারণে, আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে দুঃখপ্রাধান্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি অবতারণা করেছেন সেইসব দৃষ্টান্তের যেগুলি প্রাচীন পণ্ডিতদের না, বরং আধুনিক সমালোচকের। প্রসঙ্গক্রমে সেখানে মাদক সেবন, রাসায়নিক যৌগ কার্বনিক অ্যাসিড, ম্যালথাসের পপুলেশন থিয়োরি এইরকম বিবিধ বিষয় উঠে এসেছে। শাস্ত্রীয় বিষয়ের ব্যাখ্যায় তথা সমালোচনায় এটি একটি অভিনব উদ্যোগ, যা বিষয়ের উপলব্ধিতে অনেক বেশি সহায়ক। আবার দুঃখনিবৃত্তির আলোচনায় প্রাবন্ধিকের বক্তব্যের রেশ ধরে পাঠক পৌঁছে যেতে পারেন সূক্ষ্ম মস্তিষ্কের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায়। অন্যদিকে, সাংখ্য সেশ্বর নাকি নিরীশ্বর এই সমস্যায় দুটি পক্ষের অবতারণা করে যথাযথ যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। যুক্তি-প্রতিযুক্তি কিংবা বাদ-প্রতিবাদে পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তী উভয়ের অবস্থানই যে সমান প্রয়োজন, সেকথা প্রাবন্ধিক ভীষণভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। অবশ্য সর্বত্রই প্রাবন্ধিকের বক্তব্যের সাথে বা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সহমত পোষণ করা চলে এমনটা নয়। কর্ম থেকে জ্ঞানে উত্তরণের প্রসঙ্গে তিনি সাধারণীকরণের (Generalization) আশ্রয় নিয়েছেন, যা সহজেই মেনে নেওয়া চলে না। বেদের প্রামাণ্য-অপ্রামাণ্য নিয়ে অনেক যুক্তিজাল বিস্তারের পরেও সিদ্ধান্তের পথে খুব সচেতনভাবেই পা ফেলেননি।

তাহলে সুপ্রাচীন ঐতিহ্য, সে শিক্ষা-সংস্কৃতি-চিন্তা যেখানেই হোক না কেন, তার মধ্যে কি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা আছে? প্রাবন্ধিকের বিচারে সুপ্রাচীন অতীত আদর্শের কার্যকারিতা, বর্তমান গতিময় সময়ে অক্ষুণ্ণ থাকতে নাও পারে; তাই নতুন আঙ্গিকে সেই সুপ্রাচীন অতীত ঐতিহ্যের ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে– "Let us revere the past, but we must, in justice to our new life, adopt new life, adopt new methods of interpretation and adopt the old eternal and underlying truths to the necessities of that new life".[৯৫]

@@@@@

উল্লেখপঞ্জি

[১] অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, *বঙ্কিমচন্দ্রজীবনী*, পৃ. ২৪

[২] *তদেব*, পৃ. ৬০

[৩] অশোক কুমার মিশ্র, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস* (আধুনিক পর্ব), পৃ. ২৬৪

[৪] অধীর দে, *আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা*, পৃ. ৫

[৫] বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ সংস্করণ), দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ২২১

[৬] *তদেব*, পৃ. ২২৪

[৭] *তদেব*, পৃ. ২২২

[৮] তত্রৈব

[৯] তত্রৈব

[১০] তত্রৈব

[১১] *শ্রীশ্রী চণ্ডী* (উদ্বোধন কার্যালয় সংস্করণ), ১/৭৬

[১২] পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, *তন্ত্র পরিচয়*, পৃ. ১২

[১৩] *তদেব*, পৃ. ১৪ ["তন্ত্র বলেন, এই সংসারে যদি কিছু জ্ঞেয় থাকে, তবে সে তোমার দেহ। ঐ দেহের সাহায্যে তোমার জ্ঞানোদয় হয়, ঐ দেহের সাহায্যে তুমি জগৎ মিথ্যা ও ব্রহ্ম সত্য বলিয়া থাক, ঐ দেহের সাহায্যে তোমার আত্ম–অনুভূতি হইয়া থাকে এবং সেই অনুভূতি হইতে তুমি বিশ্বাত্মার ধারণ করতে সমর্থ হও; অতএব এই দেহটাকে বাতিল করলে চলবে না"।]

[১৪] বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ সংস্করণ), দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ২২২

[১৫] Bankim Chandra Chattopadhyay, "Buddhisim and the Sankhya Philosophy", The Calcutta Review. Vol. 106 (https://en.wikisource.org/wiki/Buddhism_and_the_Sankhya_Philosophy)

[১৬] তত্রৈব

[১৭] বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ সংস্করণ), দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ২২২

[১৮] Christians remained the largest religious group in the world in 2015, making up nearly a third (31%) of Earth's 7.3 billion people, according to a new Pew Research Center demographic analysis. (https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/05/)

[১৯] According to 2015 figures, Christians form the biggest religious group by some margin, with 2.3 billion adherents or 31.2% of the total world population of 7.3 billion. Next come Muslims (1.8 billion, or 24.1%), Hindus (1.1 billion, or 15.1%) and Buddhists (500 million, or 6.9%). (https://www.theguardian.com/news/2018/aug/27/religion-why-is-faith-growing-and-what-happens-next)

[২০] *চার্বাক–ষষ্টিঃ*, ৫৫/৬০ ও ৫৬/৬০

[২১]Thomas Malthus, *An Essay on the Principle of Population* (https://www.economicsdiscussion.net/articles/malthusian-theory-of-population-explained-with-its-criticism/1521)

[২২] জীবানন্দ বিদ্যাসাগর (সম্পা.), *সাংখ্যদর্শনম্ (অনিরুদ্ধকৃতবৃত্তিসহিতম্)*, পৃ.১

[২৩] *তদেব*, পৃ. ১৮৫

[২৪] *The New Encyclopaedia Britannica*, Vol. 24 (Macropaedia), p. 784

[২৫] There have always been two theories of the sensation of pain, a quantitative or intensity theory and a stimulus specific theory. According to the former, pain results from excessive stimulation of every kind; e.g., excessive heat or cold, excessive damage to the tissues. This theory in its simplest form entails the belief that the same afferent nerve fibers are activated by all of these various stimuli; pain is felt merely when they are conducting far more impulses than usual.___ The stimulus specific theory proposes that pain results from interactions between various impulses arriving at the spinal cord and brain. [*The New Encyclopaedia Britannica*, Vol. 24 (Macropaedia), p. 830]

[২৬] জীবানন্দ বিদ্যাসাগর (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫

[২৭] বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ সংস্করণ), দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ২২৫

[২৮] তত্রৈব

[২৯] *তদেব*, পৃ. ২২৬

[৩০] তত্রৈব

[৩১] তত্রৈব

[৩২] তত্রৈব

[৩৩] তত্রৈব

[৩৪] তত্রৈব

[৩৫] অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমিবার্যনলানিলাঃ
চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজাযতে
কিণ্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রব্যেভ্যো মদশক্তিবত্। (*চার্বাক-ষষ্টিঃ*, ৪৮/৬০)

[৩৬] অতএবোক্তম্ উত্পাদব্যযধ্রৌব্যযুক্তং সত্ [সঞ্জিত কুমার সাধুখাঁ (সম্পা), *সর্বদর্শনসংগ্রহে বৌদ্ধদর্শন ও জৈনদর্শন*, পৃ. ৮৪]

[৩৭] বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ সংস্করণ), দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ২২৬-২২৭

[৩৮] *তদেব*, পৃ. ২২৭

[৩৯] তত্রৈব

[৪০] তত্রৈব

[৪১] Rajendralal Mitra (Ed.), *Yoga Aphorisms of Patanjali*, p. 23

[৪২] Fredrich Maxmüller, *The Six Systems of Indian Philosophy*. P. 429

[৪৩] ঢুন্টিরাজ শাস্ত্রী (সম্পা.), *ন্যায়কুসুমাঞ্জলিঃ*, পৃ. ১৪ (শুদ্ধবুদ্ধস্বভাব ইত্যৌপনিষদাঃ, আদিবিদ্বান্ সিদ্ধ ইতি কাপিলাঃ, ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টোনির্মাণকাযমধিষ্ঠাযসম্প্রদাযপ্রদ্যোতকোঽনুগ্রাহকশ্চেতি পাতঞ্জলাঃ, লোকবেদবিরুদ্ধৈরপি নির্লেপঃস্বতন্ত্রশ্চেতি মহাপাশুপতাঃ, শিব ইতি শৈবাঃ, পুরুষোত্তম ইতি বৈষ্ণবাঃ, পিতামহ ইতি পৌরাণিকাঃ, যজ্ঞপুরুষ ইতি যাজ্ঞিকাঃ, সর্বজ্ঞ ইতি সৌগতাঃ, নিরাবরণ ইতি দিগম্বরাঃ, উপাস্যত্বেন দেশিত ইতি মীমাংসকাঃ, লোকব্যবহারসিদ্ধ ইতি চার্বাকাঃ, যাবদুক্তোপপন্ন ইতি নৈযাযিকাঃ কিং বহুনা কারবোঽপি যং বিশ্বকর্মেত্যুপাসতে, তস্মিন্নেবং জাতিগোত্রপ্রবরচরণকুলধর্মাদিবদাসংসারং প্রসিদ্ধানুভাবে ভগবতি ভবে সন্দেহ এব কুতঃ?)

[৪৪] Richard Garbe (Ed.), *The Sāṁkhya-pravacana-bhāṣya*, 'Saṁkhya-pravacana-bhāṣyabhūmikā', p. 2

[৪৫] জীবানন্দ বিদ্যাসাগর (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬

[৪৬] *তদেব*, পৃ. ৮৫

[৪৭] বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ সংস্করণ), দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ২২৯

[৪৮] জীবানন্দ বিদ্যাসাগর (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭

[৪৯] তত্রৈব

[৫০] বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ সংস্করণ), দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ২৩০

[৫১] পিতৃদেবমনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুঃ সনাতনম্
অশক্যাং চাপ্রমেযং চ বেদাশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ (*মনুসংহিতা*, ১২/৯৪)

[৫২] যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতযো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টযঃ
সর্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ (*মনুসংহিতা*, ১২/৯৫)

[৫৩] উত্পদ্যন্তে চ্যবন্তে চ যান্যতোঽন্যানি কানিচিত্
তান্যর্বাক্কালিকতযা নিষ্ফলান্যনৃতানি চ। (*মনুসংহিতা*, ১২/৯৬)

[৫৪] চাতুর্বর্ণ্যং ত্রযো লোকাশ্চত্বারশ্চাশ্রমাঃ পৃথক্
ভূতং ভবদ্ভবিষ্যং চ সর্বং বেদাত্ প্রসিদ্ধ্যতি।
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপং চ রসো গন্ধশ্চ পঞ্চমঃ
বেদাদেব প্রসূযন্তে প্রসূতির্গুণকর্মতঃ। (*মনুসংহিতা*, ১২/৯৭ ও ১২/৯৮)

[৫৫] তস্মাদেতত্ পরং মন্যে যজ্জন্তোরস্য সাধনম্ (*মনুসংহিতা*, ১২/৯৯)

[৫৬] সৈনাপত্যং চ রাজ্যং চ দন্ডনেতৃত্বমেব চ
সর্বলোকাধিপত্যং চ বেদশাস্ত্রবিদর্হতি।
বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো যত্র তত্রাশ্রমে বসন্
ইহৈব লোকে তিষ্ঠন্ স ব্রহ্মভূযায কল্পতে। (*মনুসংহিতা*, ১২/১০০ ও ১২/১০২)

[৫৭] ইদং শরণমজ্ঞানমিদমেব বিজানতাম্

ইদমন্বিচ্ছতাং স্বর্গমিদমানন্ত্যমিচ্ছতাম্। (*মনুসংহিতা*, ৬/৮৪)

[৫৮] হত্বা লোকানপীমাংস্ত্রীনশ্নন্নপি যতস্ততঃ

ঋগ্বেদং ধারযন্ বিপ্রো নৈনঃ প্রাপ্নোতি কিংচন। (*মনুসংহিতা*, ১১/২৬২)

[৫৯] যথা মহাহ্রদং প্রাপ্য ক্ষিপ্তং লোষ্টং বিনশ্যতি

তথা দুশ্চরিতং সর্বং বেদে ত্রিবৃতি মজ্জতি। (*মনুসংহিতা*, ১১/২৬৪)

[৬০] যথা জাতবলো বহ্নির্দহত্যার্দ্রানপি দ্রুমান্

তথা দহতি বেদজ্ঞঃ কর্মজং দোষমাত্মনঃ। (*মনুসংহিতা*, ১২/১০১)

[৬১] ব্রহ্মোবাচ–

বেদা মে পরমং চক্ষুর্বেদা মে পরমং বলম্

বেদা মে পরমং ধাম বেদা মে ব্রহ্মচোত্তরম্।

বেদানৃতে হি কিং কুর্যাং লোকানাং সৃষ্টিমুত্তমাম্

অহো বত মহদ্দুঃখং বেদনাশনজং মম। [*বৈয়াসিক-মহাভারত* (বিশ্ববাণী সং), শান্তিপর্ব, ৩৩১/৩১ ও ৩৩১/৩৩]

[৬২]... বেদেভ্যোঽখিলং জগত্। (সায়ণাচার্য, *ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রম*, মঙ্গলাচরণ, ২/৬)

[৬৩] বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ সংস্করণ), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৩০

[৬৪] তস্মাদ্ যজ্ঞাত্ সর্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে

ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজাযত। (*ঋগ্বেদ*, পুরুষসূক্ত ৯/১৬)

[৬৫] স তযা বাচা তেনাত্মনেদং সর্বমসৃজত্ যদিদং কিং চ ঋচো যজূংষি সামানি ছন্দাংসি... (*বৃহদারণ্যকোপনিষদ্* ১.২.৫)

[৬৬] দদৃশাতেঽরবিন্দস্থং ব্রহ্মাণমমিতপ্রভম্

সৃজন্তং প্রথমং বেদাংশ্চতুরশ্চারুবিগ্রহম্। (*বৈয়াসিক-মহাভারত* (বিশ্ববাণী সং), শান্তিপর্ব, ৩৩১/২৭)

[৬৭] যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগত্

নির্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরম্। (সায়ণাচার্য, *ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকা*, মঙ্গলাচরণম্, ২/৬)

[৬৮] ...অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরস... (*বৃহদারণ্যকোপনিষদ্* ২.৪.১০)

[৬৯] ন কশ্চিদ্ বেদকর্তাস্তি বেদস্মর্তা চতুর্মুখঃ

ব্রহ্মাদ্যাঃ ঋষযঃ সর্বে স্মারকা ন তু কারকাঃ। (*পরাশর সংহিতা* , ১/২১)

[৭০] সাক্ষাত্কৃতধর্মাণ ঋষযো বভূবুস্তেঽবরেভ্যোঽসাক্ষাত্কৃতধর্মভ্য উপদেশেন মন্ত্রান্ সংপ্রাদু... (*নিরুক্ত* ১.৩.৯)

[৭১] যুগান্তে অন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষযঃ

লেভিরে তপসা পূর্বমনুজ্ঞাতা স্বয়ম্ভুবা।। (*বৈয়াসিক-মহাভারত* (বিশ্ববাণী সং), শান্তিপর্ব, ২১০/১৯)

[৭২] অনির্বাণ, *বেদ মীমাংসা*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১২-১৩

[৭৩] বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ সংস্করণ), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৩১

[৭৪] জীবানন্দ বিদ্যাসাগর (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৯

[৭৫] তত্রৈব

[৭৬] তত্রৈব

[৭৭] বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ সংস্করণ), দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ২৩২

[৭৮] সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ (*শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা*, ১০/২৬)

[৭৯] *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্* ৪.৪.২২ (...সর্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসংভেদায তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেনৈতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি।)

[৮০] *তদেব*, ৪.৪.১৭ (যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ/তমেব মন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতম্)

[৮১] অনির্বাণ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০

[৮২] তস্মৈ স হোবাচ। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্‌ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যযা তদক্ষরমধিগম্যতে। (*মুণ্ডকোপনিষদ্* ১.১.৪–১.১.৫)

[৮৩] যমিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ/বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ।।

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্/ ক্রিযাবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি ।।

ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তযাপহৃতচেতসাম্/ ব্যবসাযাত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীযতে।।

ত্রৈগুণ্যবিষযাঃ বেদাঃ নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন/ নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্।। (*শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা*, ২/৪২–৪৫)

[৮৪] তত্রৈব

[৮৫] *কঠোপনিষদ্*, ১/২/২৩

[৮৬] সীতানাথ গোস্বামী (সম্পা.), *কঠোপনিষদ্*, ১ম অধ্যায়, পৃ. ২০৪ (পাদটীকা)

[৮৭] যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।

স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্।। (*শ্রীমদ্ভাগবতম্*, ৪.২৯.৪৫)

[৮৮] বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ সংস্করণ), দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ২৩৩

[৮৯] *তদেব*, পৃ. ২৩৪

[৯০] অনির্বাণ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪

[৯১] ভবতোষ দত্ত, *চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র*, পৃ. ১৫

[৯২] তত্রৈব

[৯৩] বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ সংস্করণ), দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৬৮০

[৯৪] তত্রৈব

[৯৫] অরবিন্দ পোদ্দার, *বঙ্কিম-মানস*, পৃ. ৯০

ж ж ж ж ж

চতুর্থ অধ্যায়

"The Sānkhya philosophy of Kapila was the first rational system that the world ever saw. Every metaphysician in the world must pay homage to him. I want to impress on your mind that we are bound to listen to him as the great father of philosophy"

-Swami Vivekananda (*The Complete Works of Swami Vivekananda*, Vol.2)

সাংখ্যের ঐতিহ্যানুসন্ধানে

স্বামী বিবেকানন্দ

"I want this to be clear, because it is the stepping-stone to Vedānta and it is absolutely necessary for you to understand it because this is the basis of the philosophy of the world. There is no philosophy in the world that is not indebted to Kapila".

-Swami Vivekananda (*The Complete Works of Swami Vivekananda*, Vol.2)

৪.০. ভূমিকা

মানব সমাজ দীর্ঘদিন যাবৎ একপ্রকার ছাঁচে জীবনযাত্রা অতিবাহিত করে আসছে। সমাজ, সংস্কার, প্রথা, বিশ্বাস- এই সবই মানব জীবনের সাথে জড়িয়ে থাকে। তবে, এই বহমানতায় মাঝে মাঝে আপাদ-মস্তক ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন দেখা দেয় কারণ দীর্ঘদিনের ক্লেদ, গ্লানি, জীর্ণতা সমাজের গতিপথকে অবরুদ্ধ করে ও সমাজে বাস করা সামাজিকদের ভগ্নস্তূপে পরিণত করে। সেই ভগ্নস্তূপ থেকেই 'ফিনিক্স' পাখির মত নব কলেবরে তথা নব উদ্যমে সমাজকে জাগিয়ে তোলার জন্য প্রয়োজন হয় কোনও ক্ষণজন্মা সংস্কারকের বা যুগ-প্রবর্তকের বা মানবহিতৈষীর। বঙ্গজননীর ক্রোড়ে আবির্ভূত এরকমই এক ক্ষণজন্মা হলেন স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি অমিত-প্রভাবে সমাজের অজ্ঞানের আবর্জনাগুলিকে জ্ঞানের সম্মার্জনী দিয়ে দূরে সরিয়ে ধর্ম ও সমাজকে এক নতুন রূপ প্রদান করেন এবং বঙ্গদেশের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন।

৪.১. ব্যক্তিজীবন ও কর্মজীবন

তদানীন্তন 'কলিকাতা' শহরের শিমুলিয়ায় বিখ্যাত দত্ত বংশে, ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারি এই পূণ্যাত্মার আবির্ভাব হয়। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন প্রগতিশীল চিন্তাধারার ব্যক্তি। কোনওরকম গোঁড়ামির লেশমাত্র ঐ উদারচেতা মানুষটির মধ্যে ছিল না। অপরদিকে, মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী ছিলেন প্রাচীনপন্থী তবে অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণা। স্বাভাবিকভাবেই, পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে এই প্রাচীন-অর্বাচীন ধারার সুষম সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়।

পূর্বাশ্রমে তিনি পরিচিত হন নরেন্দ্রনাথ দত্ত নামে। তবে তাঁর জন্মের কাহিনীটি অলৌকিক। অবশ্য মহাপুরুষদের জন্মকাহিনী তো একটু-আধটু চমৎকৃত হবেই, এতে আশ্চর্যের কী? শ্রদ্ধা-সত্য-বিশ্বাসের অপূর্ব নিদর্শন সেই কিংবদন্তি- "একদিন প্রভাতে শিবপূজান্তে দেবী ভুবনেশ্বরী ধ্যানস্থা হইলেন। মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া সূর্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল। দেবী যেন বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছেন, তাঁহার সমস্ত সত্তা শিবভাবনায় তন্ময়। ক্রমে সন্ধ্যার ধূসর আলোক তাঁহার তপঃক্লিষ্ট সংযমপূণ্যোজ্জ্বল বদনখানি স্বর্গীয় বিভায় মন্ডিত করিয়া ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। গভীর রজনীতে শ্রান্তদেহা জননী নিদ্রিতা হইয়া পড়িলেন। বহুদিনের ঈপ্সিত আকাঙ্খা যেন পূর্ণ হইল। ভুবনেশ্বরী স্বপ্নে দেখিলেন তুষারধবল রজতভূধরকান্তি কৈলাসেশ্বর তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। ধীরে ধীরে দৃশ্য পরিবর্তিত হইল; ভক্তের বিস্ময়মুগ্ধ হৃদয় অপূর্ব আনন্দে পরিপ্লুত করিয়া তিনি ক্ষুদ্র শিশুমূর্তি ধারণ করিয়া জননীর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন"।[১]

বাল্যাবস্থার নরেন্দ্রনাথ, যিনি 'বিলে' নামেই বেশি জনপ্রিয়, বহু ঘটনার সাক্ষী। সেই ক্ষুদ্র বা অতিক্ষুদ্র ঘটনাগুলির সমাবেশ এখানে উদ্দেশ্য নয় তবে তার দু'একটির মধ্যে দিয়ে সেই অমিত ব্যক্তিত্বের কিঞ্চিৎ অস্ফুট আভাস উদ্ধারের প্রয়াসই মূল উদ্দেশ্য। গাড়ির প্রতি নরেন্দ্রনাথের ভালোবাসার একটি ঘটনা এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, "গাড়ি তিনি এত ভালবাসিতেন যে প্রত্যহ বাড়ির সম্মুখে বসিয়া প্রত্যেকখানি গাড়ি লক্ষ্য করিতেন। একদিন তাঁহার পিতা প্রশ্ন করিলেন, 'নরেন তুই বড় হলে কি হবি, বল দিকি'? নরেন্দ্র মাথা নাড়িয়া গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন 'ঘোড়ার সহিস কি কোচোয়ান হব"।[২] যথার্থ উত্তর। সারথি হবার জন্যই তো তিনি জন্মেছিলেন। এই দেশমাতৃকাকে তার উপযুক্ত পথে চালিত করতে তাঁর মতো যোগ্য সারথি ছাড়া হয় কী করে?

তাঁর চরিত্রের একটি দিক ছিল, যুক্তি সহকারে কোনও কিছুর যথার্থতা প্রতিপাদন না হলে তিনি কখনই তা গ্রহণ করতেন না। কেবলমাত্র মুখের কথা বা কথার কথাতে বিশ্বাস করে নেওয়ার দলে তিনি ছিলেন না। সংস্কার ও অপসংস্কারের ধারণা ছোটবেলা থেকেই তাঁর অন্তরে বোধ হয় স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হত– "শৈশবকাল হইতেই নরেন্দ্র হিন্দুগৃহে চিরাচরিত দেশাচার ও লোকাচারসম্মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচার নিয়মগুলি মানিয়া চলিতেন না। তজ্জন্য জননী শাসন করিলে নরেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ ঐগুলির কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন। 'ভাতের থালা ছুঁয়ে গায়ে হাত দিলে কি হয়?' 'বাঁ হাতে করে গেলাস তুলে জল খেয়ে হাত ধোয় কেন? হাতে তো এঁটো লাগে নি?' ইত্যাদি প্রশ্নের যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিতে গিয়া জননী বিব্রত হইয়া পড়িতেন"।[৩] এরূপ যুক্তিপূর্ণ মানসিকতাই তো একজন ভাবী সংস্কারকের লক্ষণ। সেই সংস্কারক, যিনি পরবর্তীকালে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে বলিষ্ঠ চেতনার বিকাশ ঘটিয়ে মানবসমাজকে এক অন্য মাত্রায় উপস্থিত করবেন।

'তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা'– উপনিষদের এই মহান বাণীর যথার্থ প্রতিফলন দেখা যায় নরেন্দ্রনাথের মধ্যে। আশৈশব তিনি ছিলেন ত্যাগের পরাকাষ্ঠা। বড় আবেগপূর্ণ এক প্রাঞ্জল ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়– "একদিন জনৈক খেলার সাথী সমভিব্যাহারে তিনি বাজার হইতে শ্রীশ্রীসীতারামের একটি যুগল প্রতিমূর্তি ক্রয় করিয়া আনিলেন। বাটীর ছাদের উপর একটি নির্জন কক্ষে উহা স্থাপন করিয়া বালক মূর্তিটির সম্মুখে ধ্যানস্থবৎ বসিয়া থাকিতেন। বালকের সীতারামে প্রীতি তাঁহার হিন্দুস্থানী কোচোয়ান বন্ধুটিকে অতীব আনন্দ প্রদান করিত। শিশু–হৃদয়ের যে কোন সমস্যা যে কোন প্রশ্ন মীমাংসা করিয়া দিতে সে বিরক্তি বা অবসাদ বোধ করিত না। একদিন কথাপ্রসঙ্গে বিবাহের কথা উঠিল। কোচোয়ান কোন অজ্ঞাত কারণে বিবাহের উপর বিরক্ত ছিল, কাজেই সে বিবাহিত জীবনের অশান্তিসঙ্কুলতার এমন একটি জীবন্ত চিত্র বর্ণন করে যে, বালক নরেন্দ্রনাথের সুকুমার চিত্তে তাহা গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া গেল। নানা চিন্তায় আকুল হইয়া নরেন্দ্র অশ্রুপূর্ণ লোচনে জননীর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার চক্ষে জল দেখিয়া জননী কারণ জানিবার জন্য ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র ক্রন্দন–কম্পিত কণ্ঠে কোচোয়ানের নিকট যাহা যাহা শুনিয়া ছিলেন বিস্তারিত ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, 'মা, আমি সীতারামের পূজো কেমন করে করবো– সীতা রামের বৌ ছিল যে?' স্নেহবিকলা জননী প্রিয়তম পুত্রকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, 'সীতারামের পূজা নাই করলে, কাল থেকে শিবপূজা করো বাবা'। জননীকে কার্যান্তরে ব্যাপৃত দেখিয়া বালক ধীরে ধীরে কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। প্রিয়তম সীতারামের মূর্তিটি লইয়া অপরের অজ্ঞাতসারে ছাদের উপর উপনীত হইলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ক্রমে নিবিঢ় হইয়া আসিতেছে, ঊর্ধ্বে ভ্রাম্যমান অসংখ্য উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কমণ্ডলীপরিশোভিত ধূসর আকাশ, নিম্নে আদর্শ দাম্পত্যপ্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শখানি উভয় হস্তে ধারণ করিয়া সংশয়সঙ্কুলচিত্তে ভাবী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। একদিকে গভীর সীতারামভক্তি, অপরদিকে তীব্র বিবাহবিতৃষ্ণা– বালকের ক্ষুদ্র হৃদয় আলোড়িত হইল। আর না। বিবাহিত জীবন উন্নত, যত পবিত্র হউক না কেন, তাঁহার আদর্শ নহে। মূর্তিখানি ঊর্ধ্ব হইতে রাজপথে নিক্ষিপ্ত হইয়া শতধা চূর্ণ হইয়া গেল। বিজয়ী বীরের মত গর্বিত পদক্ষেপে বীরেশ্বর ভবনশিখর পরিত্যাগ করিলেন"।[৪] ঐ সামান্য বয়সে এ ছিল ত্যাগের এক অসামান্য দৃষ্টান্ত। যিনি দেশমাতৃকার জন্য সর্বস্ব পণ রেখে ত্যাগের জয়গান গেয়ে যাবেন পরবর্তীকালে, তার পক্ষেই তো এমন ত্যাগ স্বীকার সম্ভব।

পাঁচ বছর বয়স পূর্ণ হলে গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হলে প্রথাগত বিদ্যাশিক্ষার আরম্ভ হয় মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন থেকে। এরপর ১৮৭৭ খৃস্টাব্দে পিতার কর্মসূত্রে স্থানান্তরের কারণে ১৪ বছর বয়সে নরেন্দ্রনাথকেও মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে স্থানান্তরিত হতে হয়। সেখানে বিদ্যালয়ের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করে

নরেন্দ্রনাথের পিতা বিশ্বনাথ দত্ত স্বয়ং পুত্রকে শিক্ষা দিতে থাকলেন। ফলত স্কুলপাঠ্য ছাড়াও ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে তার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। এমনকি প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রাদিতেও তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন। রায়পুর হতে প্রত্যাবর্তন করে তিনি পুনরায় মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হন। এই সময়ের একটি ঘটনা তার দৃঢ়তা ও আত্মনির্ভরতার সাক্ষ্য বহন করে– "মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউসানে অধ্যয়নকালীন একজন পুরাতন সুদক্ষ শিক্ষক কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকজন উদ্যোগী ছাত্র তাঁহাকে বিদায়াভিনন্দন দিবার জন্য প্রস্তুত হন। আগামী পুরস্কার-বিতরণী সভায় তাঁহারা শিক্ষক মহাশয়কে অভিনন্দিত করিবেন স্থির করা হইল। দেশবিখ্যাত বাগ্মিপ্রবর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কথিত সভার সভাপতি ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কে বক্তৃতা করিবে ভাবিয়া লাজকুণ্ঠিত বালকগণ আকুল হইল। অবশেষে সকলের অনুরোধে নরেন্দ্রনাথই বক্তারূপে নির্বাচিত হইলেন। নরেন্দ্র সভামঞ্চে দাঁড়াইয়া প্রায় অর্ধঘণ্টা স্বীয় স্বভাবমধুরকণ্ঠে সুললিত ইংরাজীতে উক্ত শিক্ষক মহাশয়ের গুণাবলী বর্ণনা করিলেন। তিনি বক্তৃতা শেষ করিলে সুরেন্দ্রনাথ উঠিয়া গভীর প্রীতির সহিত নরেন্দ্রের বক্তৃতার প্রশংসা করিলেন"।[৫]

১৮৭৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, আঠারো বছর বয়সে, নরেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন কিন্তু প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় তাকে কলেজ পরিত্যাগ করতে হয়। এরপর জেনারেল এসেম্বলি ইনস্টিটিউশনে যোগ দিয়ে, দৃপ্ত ব্যক্তিত্বের অধিকারী নরেন্দ্রনাথ অতি অল্প সময়ের মধ্যে অসাধারণ মেধার বলে পাশ্চাত্য দর্শনের আলোচনায় ব্রতী হয়ে দেকার্তের অহংবাদ, হিউমের নাস্তিকবাদ, ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ ও স্পেন্সারের অজ্ঞেয়বাদের সাথে পরিচিত হলেন। কিন্তু দার্শনিক সূক্ষ্মতত্ত্বের পর্যালোচনাতেও তাঁর আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসার পরিপুষ্টি হল না। জ্ঞানপিপাসায় পিপাসার্তের গলায় সর্বক্ষণ ধ্বনিত হতে থাকল, 'কস্মিন্নু ভগবন্ বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি'?

জগতে প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর থাকে। কখনও তা সময়ের সাথে প্রশ্নকর্তার সামনে ধরা দেয়, কখনও বা উত্তরদাতার সম্মুখে প্রশ্নকর্তাকে উপস্থিত করে। নরেন্দ্রনাথও তাঁর জীবনের অনেক অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তরদাতারূপে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের খোঁজ পেলেন ১৮৮০ সালের নভেম্বর মাসের একদিন, কলকাতায় সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ীতে। একতাল মাটি যেমন যোগ্য মূর্তিকারের হাতে এসে সুবেশা মৃন্ময়ীর রূপ পায়, তেমনই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যভাবের স্পর্শে নরেন্দ্রনাথের বিবেক আনন্দের সন্ধান পেল। এ যেন জন্ম–জন্মান্তরের অবিচ্ছেদ্য বন্ধন। যদিও শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে গুরু বলে তখনও স্থির করে উঠতে পারেননি নরেন্দ্রনাথ। কলেজের পাঠ চলাকালীন তিনি তাঁর পিতার পরামর্শে এটর্নীর পেশাতেও শিক্ষা লাভ করছিলেন কিন্তু, হায় হতভাগ্য! নদীর গন্তব্যস্থল যেমন সমুদ্রেই নির্দিষ্ট থাকে তেমনই নরেন্দ্রনাথেরও জীবনপথ এইসব তুচ্ছ পেশার অনেক উর্দ্ধে জীবকল্যাণে সুনির্দিষ্ট ছিল।

কলেজের পরীক্ষা সমাপ্ত করলেন নরেন্দ্রনাথ, তবে শুরু হল জীবনের পরীক্ষা। পিয়ানোর রিডের মতো ভিন্ন ভিন্ন সুরে তাঁর বেসুরো জীবনের ছন্দপতন হতে থাকলো। মারা গেলেন বিশ্বনাথ দত্ত। প্রাচুর্যে ও লালিত্যে মানুষ নরেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করলেন দারিদ্র্যের নিদারুণ বাস্তব। সংসারের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী বিপৎকালে আত্মীয়বর্গদের সঙ্গ পেলেন না। আর প্রাণপণ চেষ্টা করেও কোনও কাজের ব্যবস্থা করে উঠতে পারলেন না যাতে করে সংসারের হাল ধরতে পারেন। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো যুক্ত হল বাড়ি নিয়ে মামলা। সবদিক দিয়ে দেওয়ালে পিঠ ঠেকার উপক্রম হলে নিয়তি তাকে এনে উপস্থিত করল শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে। শুরু হল নরেন্দ্রনাথের জীবনের এক নতুন অধ্যায়। কল্পতরুর আশ্রয়ে উপস্থিত হয়ে অমৃতলাভের সন্ধানে তাঁর যাত্রা শুরু হল। যে ঠাকুর একদিন 'পাগল' বলে প্রতীত হয়েছিল এখন সেই "ঠাকুর তাঁহার নিকট

রহস্যময় উন্মাদ নহেন, তাঁহার জীবনের চরম আদর্শ, গুরু, পিতা– সর্বস্ব”।[৬] গুরু-শিষ্যের সে এক অলৌকিক ভাবমাধুর্য! কথায় বলে গুরুকৃপাতে কী না সম্ভব? – ‘মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘযতে গিরিম্’। হলও তাই। নরেন্দ্রনাথের জীবনপথের বন্ধুর রাস্তা কিছুটা মসৃণ হল। কিন্তু নিয়তির হিসেবের খাতায় হিসেব ছিল অন্যরকম। যে গুরুর সমীপে ঐশশক্তির পরিচয় প্রতিনিয়ত একটু একটু করে উপলব্ধি করছিলেন নরেন্দ্রনাথ, সেই পরমপূজ্য গুরুদেব ১৮৮৬ সালে জুলাই মাসের শেষদিকে এই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করলেন।

অকস্মাৎ আপতিত গুরুদায়িত্ব মানুষকে হয় খড়কুটোর মতো ভাসিয়ে নিয়ে যায়, নয়তো বনস্পতির মতো দৃঢ়মূল করে তোলে। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ ছিলেন উদীয়মান সূর্য। সূর্যরশ্মির বিচ্ছুরণ যেমন নিজে থেকেই তার প্রকাশ জ্ঞাপন করে, তেমনই নরসিংহ নরেন্দ্রনাথের পরিচয় তার উদাত্ত ভাবমূর্তিতে প্রকটিত হতো। বিবেক-চরিতকার সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় সারগর্ভ কথা বলেছেন– “জীবন তাঁহার নিকট ছিল এক স্বচ্ছন্দ অবিরাম প্রবাহ। তথাকথিত নীতিশাস্ত্রের বিধিনিষেধের বাঁধন জড়াইয়া পঙ্গু হইয়া ভালমানুষ সাজিবার গতানুগতিকতা তাঁহার জীবনের সহজ-প্রবল গতিমুখে কোন বাধা দান করিতে পারে নাই”।[৭] বড়ই কঠোর তবে বাস্তব কথা।

১৮৮৮ সাল থেকে ১৮৯২ সাল অবধি তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করলেন। এই দীর্ঘ ভ্রমণ বৃত্তান্ত পরিবেশনের জায়গা এখানে অবশ্যই নেই তবে এর উদ্দেশ্য যদি স্বল্প কথায় প্রকাশ করতে হয় তাহলে বলা চলে এই দেশভ্রমণ প্রকৃতপক্ষে “আমরা যাহাকে দুঃখকষ্ট বলি, যাহার সামান্য স্পর্শে আমরা ব্যথিত চিত্তে আর্তনাদ করিয়া ‘ভগবানের বিচার নাই’ বলিয়া ধিক্কার দিই, মূর্তিমান সন্ন্যাস এই মহাপুরুষ অবিচলিতভাবে তাহা সহ্য করিয়াছেন– কেবল সহ্য নয়– ঐগুলি লইয়া তিনি যেন আনন্দে উন্মত্ত। তিনি দুঃখকষ্ট হইতে পলায়নের চেষ্টা কোনদিন করেন নাই বরং স্বীয় সমগ্র যোগৈশ্বর্য গোপন করিয়া মানবজাতির দুর্বলতার সমগ্র পাপভার সমগ্র দুঃখকষ্ট নিজস্কন্ধে বহন করিয়া, আমাদের মত মানুষ সাজিয়া, জগতের কল্যাণ কামনায় নবজাগরণের পূণ্যবারতা লইয়া প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে যাচিয়া গিয়াছেন”।[৮] দীর্ঘ ভারত ভ্রমণে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এবার উদ্দেশ্য এই সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা সমাজের আর্ত, নিপীড়িত, ব্যথিতদের মধ্যে বিতরণ করে তাদের উদ্ধার করা। এমনকি ত্যাগের ও বৈরাগ্যের যে মাহাত্ম্য এতদিন দেশের প্রতিটি প্রান্তে ধ্বনিত হয়েছে এবার সমগ্র বিশ্বের দরবারে তার কীর্তনের জন্য ১৮৯৩ সালের ৩১শে মে স্বামী বিবেকানন্দ সুদূর আমেরিকার শিকাগো অভিমুখে যাত্রা করলেন। বস্তুত তা ছিল বিশ্ব-বিজয়-যাত্রার শুরু মাত্র। এরপর দীর্ঘসময় পাশ্চাত্যে ধর্মপ্রচারে নিযুক্ত থেকে হিন্দুধর্ম তথা মানবধর্মকে এক উচ্চকোটির মাত্রায় স্থাপন করেন। কবির ভবিষ্যদ্বাণী–

বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়
বাঙালীর ছেলে বাঘে ও বলদে ঘটাবে সমন্বয়।

পাশ্চাত্যে শাশ্বত সত্যের প্রচার শেষ হলে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য উদ্যোগ নিলেন। যে জীর্ণতা ও প্রাণহীনতায় এই সুবিশাল দেশটির গতি রুদ্ধ হয়েছিল, সেই বদ্ধ অর্গল উন্মুক্ত করতে প্রয়োজন ছিল এক বলিষ্ঠ শক্তির– “পাশ্চাত্য দেশে তিনি বিশ্বমানের কল্যাণের জন্য সার্বভৌমিক ধর্মের শাশ্বত সত্য প্রচার করিয়াছিলেন আর ভারতে ফিরিয়া তিনি আমাদের জরাজীর্ণ সভ্যতা, সমাজ প্রাণহীন ধর্মাচরণের গতানুগতিকতাকে অতি নির্মম আঘাত করিলেন”।[৯] তবে যে উদ্দেশ্যে তাঁর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন, সেই উদ্দেশ্যের সার্থক রূপায়ণে একদিকে যেমন প্রয়োজন কর্মীর, তেমনই কর্মীদের এক ছাতার তলায়

আনার জন্য দরকার একটি 'অর্গানাইজেশন্'। ১৮৯৭ সালের মে মাসে ভক্ত ও সন্ন্যাসীদের নিয়ে গঠিত হল সংঘ। যা অদ্যাবধি 'রামকৃষ্ণ মিশন' নামে পরিচিত হয়ে আসছে। এরপর ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আবারও একবার যাত্রা করেন তিনি। সমগ্র দেশ জুড়ে এক অনাবিল ভাবের তরঙ্গে আন্দোলিত করে তোলেন সকলকেই। তিনি ছিলেন ত্যাগী, সন্ন্যাসী। সমস্ত প্রকার বন্ধন হতে মুক্ত। অথচ সেই মুক্ত হৃদয় আবদ্ধ ছিল ভারতমাতার বন্ধনে– "তিনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন বটে কিন্তু তাঁর হৃদয় ভারতের কথা দিয়েই পূর্ণ ছিল। ভারতবর্ষ তাঁর ধ্যান–জ্ঞান। ভারতের জন্যই যে তাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত। রক্তের প্রতি বিন্দুতে এই চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা ছিল না"।[১০]

যে অর্গানাইজেশন্ এর মাধ্যমে তিনি সেবাব্রতের কর্মসূচীর উদ্বোধন করেছিলেন, তার ভিত্তিভূমি মজবুত জমিতে প্রোথিত করতে এক স্থায়ী মঠ নির্মাণের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ১৮৯৮ সালের জানুয়ারি মাসে সুদীর্ঘ উত্তর ভারত ভ্রমণের পর স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতায় ফিরে আসলেন। পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বেলুড় গ্রামে উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের পর, শিষ্য–শিষ্যাদের অর্থানুকূল্যে নির্মিত হল স্বামী বিবেকানন্দের বহুকাঙ্খিত 'বেলুড় মঠ'। বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠাপন তার জীবনের এক অসামান্য কীর্তি। সমাজের মধ্যে থাকা দৃঢ়মূল অপসংস্কারগুলি দূর করতে তিনি ছিলেন সদা তৎপর। তিনি মনে করতেন, "দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনগুলি শিক্ষিত ভদ্রসমাজের অভাব–অভিযোগের মধ্যে যতদিন সীমাবদ্ধ থাকিবে ততদিন কাহারো কল্যাণ নাই"।[১১] দূরদৃষ্টি আর কাকে বলে! বড়ই প্রাসঙ্গিক আজকের দিনে। ধর্ম ও অধর্মের আবহমান কুতর্কের অঙ্গারে জল নিক্ষেপ করে তাঁর অন্তরের উপলব্ধি ছিল "যতদিন আমার জন্মভূমির একটি কুকুর পর্যন্ত অভুক্ত থাকিবে ততদিন তাহাকে আহার প্রদানই ধর্ম। ইহা ছাড়া আর যা কিছু - অধর্ম"।[১২] তিনি ছিলেন যথার্থ মানবমিত্র সেই কারণেই সমগ্র জাতির অভ্যুত্থানে তাঁর তৎপরতা ছিল সর্বাগ্রে।

সমাজের একেবারে শেষ স্তরের ব্যক্তিটির প্রতিও তাঁর করুণার ধারা প্লাবিত হতো উচ্ছল স্রোতের ন্যায়। করুণাঘন, সদানন্দমূর্তি সেই বিবেকজীবনের এক টুকরো খণ্ডচিত্র সযত্নে চিত্রিত হয়েছে বেলুড় মঠের পটভূমিকায়– "মঠের জমি সাফ করিতে প্রতিবর্ষেই কতকগুলি স্ত্রী–পুরুষ সাঁওতাল আসিত। স্বামিজী তাহাদের লইয়া কত রঙ্গ করিতেন এবং তাহাদের সুখ–দুঃখের কথা শুনিতে কত ভালবাসিতেন। একদিন কলিকাতা হইতে কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক মঠে স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। স্বামিজী তামাক খাইতে খাইতে সেদিন সাঁওতালদের সঙ্গে এমন গল্প জুড়িয়াছেন যে স্বামী সুবোধানন্দ আসিয়া তাঁহাকে ঐ সকল ব্যক্তির আগমন সংবাদ দিলে বলিলেন 'আমি এখন দেখা করিতে পারিব না, এদের নিয়ে বেশ আছি'। বাস্তবিকই সেদিন স্বামিজী ঐ সকল দীন–দুঃখী সাঁওতালদের ছাড়িয়া আগন্তুক ভদ্রলোকদের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন না। সাঁওতালদের মধ্যে একজনের নাম ছিল কেষ্টা। স্বামিজী কেষ্টাকে বড়ই ভালবাসিতেন। কথা কহিতে আসিলে কেষ্টা কখনও স্বামিজীকে বলিত 'ওরে স্বামী বাপ্ তুই আমাদের কাজের বেলায় এখানকে আসিস না, তোর সঙ্গে কথা বল্‌লে আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে যায়, আর বুড়ো বাবা(স্বামী অদ্বৈতানন্দ) এসে বকে'। কথা শুনিয়া স্বামিজীর চোখ ছল ছল করিত এবং বলিতেন, 'না না বুড়ো বাবা বকবে না, তুই তোদের দেশের দুটো কথা বল'– বলিয়া তাহাদের সাংসারিক সুখ–দুঃখের কথা পাড়িতেন। একদিন স্বামিজী কেষ্টাকে বলিলেন 'ওরে তোরা আমাদের এখানে খাবি?' কেষ্টা বলিল 'আমরা যে তোদের ছোঁয়া এখন খাই না, এখন যে বিয়ে হয়েছে, তোদের ছোঁয়া নুন খেলে যে জাত যাবে রে বাপ্'। স্বামিজী বলিলেন 'নুন কেন খাবি? নুন না দিয়ে তরকারী রেঁধে দেবে তা হলে তো খাবি'? কেষ্টা ঐ কথায় স্বীকৃত হইল। অনন্তর স্বামিজীর আদেশে মঠে সেই সকল সাঁওতালদের জন্য লুচি, তরকারী, মিঠাই, মণ্ডা, দধি ইত্যাদির জোগাড় করা হইল

এবং তিনি তাহাদিগকে বসাইয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। খাইতে খাইতে কেস্টা বলিল 'হাঁ রে স্বামী বাপ্– তোরা এমন জিনিসটা কোথায় পেলি, হামরা এমনটা কখনো খাইনি'। স্বামিজী তাদের পরিতোষ করিয়া খাওয়াইয়া বলিলেন, 'তোরা যে নারায়ণ, আজ আমার নারায়ণের ভোগ দেওয়া হল'। আহারান্তে সাঁওতালেরা বিশ্রাম করিতে গেলে স্বামিজী শিষ্যকে বলিলেন 'এদের দেখলুম যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ– এমন সরলচিত্ত– এমন অকপট, অকৃত্রিম ভালবাসা, এমন আর দেখিনি'। অনন্তর মঠের সন্ন্যাসিবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'দেখ্ এরা কেমন সরল! এদের কিছু দুঃখ দূর করতে পারবি? নতুবা গেরুয়া পরে আর কি হল? পরহিতায় সর্বস্ব সমর্পণ, এরেই নাম যথার্থ সন্ন্যাস। এদের ভাল জিনিস কখনও কিছু ভোগ হয়নি। ইচ্ছে হয় মঠ–ফঠ সব বিক্রী করে দিই এই সব গরীব দুঃখী, দরিদ্রনারায়ণদের মধ্যে বিলিয়ে"।[১৩]

অক্লান্ত পরিশ্রম ধীরে ধীরে তাঁর ঐ নশ্বর দেহটিকে গ্রাস করতে থাকল। সিদ্ধপুরুষ সেসবের ভ্রূক্ষেপ না করে নিজব্রতে অটল রইলেন। মধ্যে মধ্যে বায়ু পরিবর্তনের জন্য স্থান পরিবর্তন হল কিন্তু ক্লান্তি ক্রমশই স্তূপীকৃত হতে থাকল। অবশেষে ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর কর্মস্রোতের আশ্রয় বেলুড় মঠে, কর্মবিরতি নিয়ে অনন্ত নিদ্রায় শায়িত হলেন। এই শেষ মুহূর্তটি বড়ই মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক– "জপমালাহস্তে শায়িত মহাপুরুষের দেহ নিস্পন্দ ও স্থির। রাত্রি তখন ৯টা বাজিয়াছে, এমন সময় তাঁহার হস্ত কম্পিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রিত শিশুর মত অস্ফুটস্বরে একটু ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। দুইটি গভীর দীর্ঘশ্বাস পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মস্তক উপাধান হইতে হেলিয়া পড়িল। স্বামিজীকে তদবস্থায় দেখিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় ব্রহ্মচারী নিম্নতলে গিয়া বয়স্ক সন্ন্যাসিগণকে সংবাদ প্রদান করিলেন। তাঁহারা আসিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, যোগিবর অনন্ত নিদ্রায় শায়িত! অমানিশার অন্ধ তিমিরাবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে জগন্মাতা তাঁহার রণশ্রান্ত বীরপুত্রকে ব্যগ্রবাহু প্রসারিত করিয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন"।[১৪]

বোধ করি এই দিনটির জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ গেয়েছিলেন–
মন চল নিজ নিকেতনে,
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেন অকারণে?
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ
সব তোর পর কেহ নয় আপন,
পর প্রেমে কেন হয়ে অচেতন
ভুলেছ আপন জনে?

৪.২. রচনাসম্ভার

স্বামী বিবেকানন্দ প্রায়শই তাঁর গুরুভাই ও শিষ্যদের নিকট বলতেন, তিনি যা করে যাচ্ছেন তা উপলব্ধি করতে এই ধরণীর বুকে আর একজন বিবেকানন্দকে জন্মাতে হবে। বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় বিবেকানন্দ অদ্যাবধি জন্ম লাভ করেনি। তাহলে একথা কি প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া চলে, এত আলোচনা–পর্যালোচনা সত্ত্বেও বিবেকানন্দ আমাদের উপলব্ধির বাইরেই রয়ে গেছেন? আশৈশব কড়ায়–গণ্ডায় 'বিবেকোক্তি' কণ্ঠস্থ করার পর এই জাতীয় প্রশ্ন একদিকে বিতর্কের অন্যদিকে

বিরক্তিরও। যাইহোক, একজন মহান ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করার মূল উপাদান কী? নির্বিবাদে বলা যেতে পারে তাঁর 'চিন্তা–ভাবনা'। আর, চিন্তা–ভাবনা সাধারণত প্রতিফলিত হয় সেই ব্যক্তির বাণী ও রচনার মধ্যে দিয়ে।

এখন কেউ বলতেই পারেন, ইংরেজি ভাষায় নয় খণ্ডের *The Complete Works of Swami Vivekananda* এবং বাংলা ভাষায় দশ খণ্ডের *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা* বেশ কয়েকটি সংস্করণে 'সংস্কৃত' হয়ে সুধী পাঠকবৃন্দের নিকট উপলব্ধ। উপলব্ধ সেই অমৃতবাণীর প্রতিটি ছত্রে প্রবেশ করে উপলব্ধির দ্বার উন্মুক্ত করলেই হল। সমস্যা কোথায়? সমস্যার জায়গা হল 'অপর্যাপ্ততা'। সংস্কারকর্তারা (সম্পাদকগণ) *The Complete Works of Swami Vivekananda* র প্রথম খণ্ডের মুখবন্ধে স্পষ্টতই আক্ষেপ করছেন বিবেকবাণীর অপর্যাপ্ততার– "Swami Vivekananda lectured for the first time from a public platform on September 11th, 1893 and on July 4th, 1902, he passed away. The fact that so much has been permanently recorded of the immense work done in nine short years is largely due to the energy and devotion of his young English Secretary, J J Goodwin, who accompanied him to England from America in 1896 and to India from England in 1897, and who was the first of his personal disciples to fall, dying at Ootacamund on 2nd June, 1898. Had Mr. Goodwin lived, we should doubtless have had further priceless records of the work done in California, at Los Angeles, San Francisco and elsewhere, during the winter of 1899 to 1900"।[১৫] অর্থাৎ সম্পূর্ণ বাণী নথিভুক্ত হয়নি, বেশ কিছু অমূল্য বার্তা অ–মূল্যে কালের গর্ভে রয়ে গেছে।

অবশ্য এ তো গেল 'বাণী'র কথা। সেইটুকু 'অপর্যাপ্ততা'কে বাদ দিয়ে যদি তার প্রবন্ধ, পুস্তক/পুস্তিকা ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি রাখি, তাহলে 'সামগ্রিক' উপলব্ধিতে বাধা কোথায়? প্রাবন্ধিক শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করছেন এখানে 'নির্ভরযোগ্যতা' একটি 'দূরপনেয়–সংশয়–সমস্যা'। তাঁর স্পষ্টোক্তি, "ইংরেজি–বাংলায় জড়াজড়ির পাশাপাশি বিবেকানন্দের মুদ্রা–সাক্ষরবহ *Complete Works* তথা 'বাণী ও রচনা'র বহু বহু পৃষ্ঠা জুড়ে রয়েছে তাঁর ভক্তমণ্ডলীর হস্তাবলেপ। অর্থাৎ, আমরা যে পাঠ–প্রত্যাশা নিয়ে কোনো দার্শনিক বা সাহিত্যিকের গ্রন্থলোকের দিকে অগ্রসর হই– সে দার্শনিক প্লেটো বা শংকর হোন, হোন না সাহিত্যিক শেক্সপীয়র বা রবীন্দ্রনাথ– তা আদৌ পূরণ করে না ইংরেজি তথা বাংলা 'বিবেকানন্দ রচনাবলি'। বিবেকানন্দের বেলায়– পাঠ সংকলনের নীতিগত অভিনবতার দরুনই– পাঠকের ওপর বর্তায় আলাদা হুঁশিয়ারির দায়। বিভিন্ন ব্যক্তিস্বরের বিমিশ্রতা– সাধারণ এ সমস্যার অতিরিক্ত আছে আবার বিবেকানন্দের সই–লাঞ্ছিত ভাষণ বা নিবন্ধের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে দূরপনেয় সংশয়–সমস্যা"।[১৬] তিনি 'ভক্তিযোগে'র ভূমিকায় স্বামী সারদানন্দ লিখিত বক্তব্যটিকে তাঁর মতামতের স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে দেখিয়েছেন– "বিবেকানন্দের বক্তৃতামালা ইংরেজি 'ভক্তিযোগ' এর দ্বিতীয় সংস্করণের 'ভূমিকা'য় লিখেছিলেন সারদানন্দ: 'স্বামী বিবেকানন্দের নামে যেসকল গ্রন্থ আছে, ঐগুলির প্রায় সবই তাঁহার স্বল্প–পরিসর কর্মময় জীবনে ভারতে ও ভারতের বাহিরে প্রদত্ত বক্তৃতাবলীর সাঙ্কেতিক নোট হইতে সংকলিত হইয়াছে। পূর্বে লিখিত নোট অবলম্বন করিয়া স্বামীজি কখনও বক্তৃতা দিতেন না, বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া যাহা মনে উঠিত, তাহাই বলিয়া যাইতেন। ...সাঙ্কেতিকলিপিতে গৃহীত নোটগুলি... সুদক্ষ ব্যক্তিদ্বারা ভাষায় রূপান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও কিছু কিছু বাদ গিয়াছে, কিছু ভুলত্রুটি হইয়াছে এবং কোন কোন বাক্য স্থানচ্যুত হইয়াছে। এখানে সেখানে তাড়াতাড়ি একটু চোখ বুলানো ছাড়া স্বামীজি নিজে কখনও সাংকেতিক–লিপিতে গৃহীত নোটগুলির দিকে বেশী মনোযোগ দিতেন না এবং সর্বদাই বিশেষ ভুলত্রুটিগুলি

সংশোধন করিয়া এবং কোনও সময় ততটুকু না করিয়াও মুদ্রণের জন্য পাঠাইয়া দিতেন"।[১৭] তাই বিবেক-রচনাসম্ভারের প্রতি তাঁর যুক্তি 'এত গোলযোগ যেখানে সেখানে সাবধানী হওয়া ভালো'।

কথায় বলে পক্ষ রাখলে বা থাকলে প্রতিপক্ষও রাখতে বা থাকতে হয়, নচেৎ বিতর্কের যথার্থতা সিদ্ধ হয় না। স্বাভাবিকভাবেই সন্দিগ্ধপক্ষে যেমন মতামত আছে তেমনই অসন্দিগ্ধপক্ষেও মতামত থাকবে। যেমন, অধ্যাপক আর. সি. মজুমদার দৃঢ়ভাবে মনে করেন, নরেন্দ্রনাথ দত্তকে আমরা স্বামী বিবেকানন্দরূপে যদি না পেতাম তাহলে অন্তত উনিশ শতকের একজন ভালো মানের লেখক ও কবি পেতাম - "On the whole, it may well be believed that if Narendranath Dutta had not been Swami Vivekananda, Bengal might have one more addition to the large number of her good poets of the nineteenth century"।[১৮] আরও কথা এই যে, স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজি লেখা সে গদ্য হোক বা পদ্য, তার সৌন্দর্যের ও ভাবের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তিনি বিবেকানন্দ ব্যতীত অন্যকে দিতে নারাজ - "It is idle to expect an Indian writer achieving literary fame by writing in English. But the beautiful language of his English prose writings reflects great credit upon him"।[১৯] অপরদিকে, অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ মহাশয় নিঃসংশয় চিত্তে উদারকণ্ঠে স্বামী বিবেকানন্দের রচনার মধ্যে নিহিত মৌলিকত্বের প্রশংসাপত্র দিচ্ছেন- "যদিও রচনার প্রসার ও বৈচিত্র্য সাহিত্যিকের পক্ষে কম কথা নয়, তবু যে লেখক ভাবের জগতে কোনো মৌলিক চিন্তা বা উপলব্ধির সঞ্চার করেছেন, তার মূল্য গতানুগতিক সাহিত্য-সাধনার অনেক উর্ধ্বে। স্বামীজির সাহিত্যকৃতি সেই মৌলিকতার অধিকারী"।[২০]

তর্ক-বিতর্ক তথা যুক্তি-প্রতিযুক্তির চড়াই-উতরাইয়ে, উপলব্ধ বাণী ও রচনার সেই সুবিশাল সংকলন এযাবৎ কাল অবধি বিবেক-মনীষার পরিচয় বহন করে আসছে। স্বাভাবিকভাবেই, কোনও এক পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দেওয়া হবে। তাই, বিবেক-বাণী ও রচনার মৌলিকত্বের বিতর্কের ইতি টেনে আপাতত সেই সুবিশাল রচনাসম্ভারের পরিচয় উদ্ঘাটনের প্রয়াস করা যাক।

স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র বাণী ও রচনা-কে আমরা সাতটি বিভাগে রাখতে পারি-

<u>বিভাগ ১:</u> বক্তৃতা

<u>বিভাগ ২:</u> আলাপচারিতা

<u>বিভাগ ৩:</u> পুস্তক/পুস্তিকা

<u>বিভাগ ৪:</u> প্রবন্ধ

<u>বিভাগ ৫:</u> কবিতা-স্তোত্র

<u>বিভাগ ৬:</u> চিঠিপত্র

<u>বিভাগ ৭:</u> সঙ্গীত

> *বিভাগ ১ : বক্তৃতা*

বক্তৃতা এমন একটি বিষয়, যা শ্রোতার সম্মুখে বক্তার প্রতিকৃতিটিকে মেলে ধরে। সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে নজর দিলে দেখা যাবে, তাবড় প্রচারকগণ আসমুদ্র-হিমাচল খ্যাত হয়েছেন ওজস্বী বাগ্-ব্যবহারের মধ্যে দিয়েই। স্বামী বিবেকানন্দ এই পর্যায়ে একজন বাগ্মী পুরুষ ছিলেন। অধ্যাপক আর. সি. মজুমদার সুন্দর যুক্তি দিয়েছেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের বাক্-ভঙ্গিমার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজকের দিনে উপলব্ধ হবে না কারণ সেই সময়ের কোনও জীবিত ব্যক্তিকে পাওয়া দুষ্কর।[২১] তবে, সেইসময়ের বিভিন্ন লেখাতে সুমধুর, সান্দ্রধ্বনির অধিকারী স্বামী বিবেকানন্দের অসাধারণ বাক্পটুতার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাক্যন্ত্রের উপর তাঁর এতটাই দক্ষতা ছিল যে, বাণীর মাধ্যমে আকৃষ্ট করতে পারতেন জনসমষ্টিকে। অধ্যাপক মজুমদার আমেরিকান কবি ও সম্পাদক Harriet Monroe এর আত্মজীবনী *A Poet's Life* থেকে স্বামী বিবেকানন্দের বাগ্মিতার সমর্থনে কবির মন্তব্য উদ্ধার করেছেন, "…the handsome monk in the orange robe gave us in perfect English a masterpiece. His personality, dominant, magnetic, his voice, rich as a bronze bell; the controlled fervor of his feeling; the beauty of his message to the Western world he was facing for the first time- these combined to give us a rare and perfect moment of supreme emotion. It was human eloquence at its highest pitch"।[২২] এই ক্ষমতাবলেই ধীরে ধীরে তাঁর বাণীর মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের অনেক মণি-মাণিক্য।

স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতার সংখ্যা অনেক। স্থান-কাল ভেদে স্বল্পদৈর্ঘ্যের বক্তৃতা যেমন আছে তেমনই সুদীর্ঘ বক্তব্যও আছে। বক্তৃতার ব্যাপ্তিও অনেক। ধর্ম-দর্শন-বিজ্ঞান কী নেই সেখানে! কোথাও পর্যালোচনা, কোথাও তুলনা, কোথাও বা তথ্যের উপস্থাপনা। বিখ্যাত চিকাগো বক্তৃতায় স্বামী বিবেকানন্দ যে শিবমহিম্ন স্তোত্র পাঠ করে শুনিয়েছিলেন, *রুচীনাং বৈচিত্র্যাদ্ ঋজুকুটিলনানাপথজুষাম্/ নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব* [অর্থাৎ ভিন্ন রুচিহেতু মানুষ সোজা বা বাঁকা নানাপথের ভজনা করে তবে নদীর গন্তব্য যেমন সমুদ্রেই নির্দিষ্ট তেমনই এই সকল পথ সেই এক পরমাত্মার লক্ষ্যে যায়] – সেই মূলসুরটিই তিনি অনুরণন করেছেন তাঁর বক্তৃতামালায়। বিষয়ের ভিন্নতা হোক বা পরিধির ভিন্নতা সর্বত্র অনুস্যূত হয়েছে মানবধর্মের জয়গান।

> *বিভাগ ২ : আলাপচারিতা*

স্বামী বিবেকানন্দ যেহেতু বাণীর মধ্যে দিয়ে সহজেই অপরজনকে আকৃষ্ট করতে পারতেন, তাই তাঁর সাথে ভক্তবৃন্দের ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তির আলাপচারিতার জায়গা ছিল উন্মুক্ত। এগুলি সেই অর্থে সরাসরি তাঁর রচনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় না, কিন্তু এই আলাপচারিতাগুলি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সাক্ষ্য বহন করে। স্বাভাবিকভাবেই যিনি স্বামী বিবেকানন্দের সাথে এই আলাপচারিতার মহান সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, তিনি পরবর্তীকালে স্মৃতিচারণার মাধ্যমে সেই মহামূল্যবান কথোপকথন জগৎ-সংসারের সামনে উজাগর করেছেন। এরকমই কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আলাপচারিতা হল–

- শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর সাথে 'স্বামী-শিষ্য সংবাদ' (From the diary of a disciple)
- প্রিয়নাথ সিংহের সাথে 'স্বামীজির স্মৃতি'

- সুরেন্দ্রনাথ সেনের সাথে 'তিন দিনের স্মৃতিলিপি'
- মিস ওয়াল্ডোর সাথে 'Inspired Talks' (দেববাণী)
- ভগিনী নিবেদিতার সাথে 'Notes of some wanderings with the Swami Vivekananda' (স্বামীজির সহিত হিমালয়ে)
- সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের সাথে আলাপচারিতা (God the last refuge)

> ➢ ***বিভাগ ৩ : পুস্তক/পুস্তিকা***

পুস্তক রচনার পরিকল্পনা নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ পুস্তক রচনা করেননি। বলা চলে, খাতা-কলম নিয়ে দিনের পর দিন সময় অতিবাহিত করে পুস্তক রচনার অবসর তাঁর ছিল না। তথাপি, বিভিন্ন স্থলে বক্তৃতার কালে এক এক বিষয়ে তিনি যে অমূল্য বক্তব্য পরিবেশন করেন, সেই বক্তব্য পরবর্তীকালে পুস্তক বা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।

এরকমই কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক বা পুস্তিকার নাম-

- Bhakti-yoga (1895) ভক্তিযোগ
- Addresses on Bhakti-yoga (1895) ভক্তিরহস্য
- Supreme Devotion (1896) পরাভক্তি
- Trans.(Eng.) Of Narada Bhaktisutra (1895) নারদ ভক্তিসূত্র
- Science and Philosophy of Religion (1897) ধর্মবিজ্ঞান
- Study of Religion ধর্মসমীক্ষা
- Thoughts on Vedanta বেদান্তের আলোকে
- Karma-yoga (1896) কর্মযোগ
- Raja-yoga (1896) রাজযোগ
- Trans. (Eng.) Of Patanjala-yogasutra পাতঞ্জল যোগসূত্র

> ➢ ***বিভাগ ৪ : প্রবন্ধ***

স্বামী বিবেকানন্দ রচিত মৌলিক প্রবন্ধগুলি সবকটিই বাংলা ভাষায় লেখা। ১৮৯৭ থেকে ১৯০২ সালের মধ্যে এই প্রবন্ধগুলি 'উদ্বোধন পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়।

উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি যথা-

- প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য (The East and The West)
- পরিব্রাজক (Memories of European Travel)
- বর্তমান ভারত (Modern India)
- ভাববার কথা (Matter for serious thought)

➢ ***বিভাগ ৫ : কবিতা-স্তোত্র***

স্বামী বিবেকানন্দ 'হালকা চালের' ছন্দ নিয়ে খেলা করার কবি ছিলেন না। তাঁর ভাবের মধ্যে থাকা উদ্যম, দৃঢ়তা ও ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর রচনায়। সেই পর্যায়ে কবিতাগুলি ছিল মহান ভাবাদর্শের ও চিন্তাদর্শের এক স্বচ্ছ দর্পণ। কবিতাগুলি বাংলা ও ইংরাজি এই দুই ভাষাতেই মূলত লেখা। সংস্কৃতেও অবশ্য একটি কবিতা পাওয়া যায়। (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা একটি পত্রে [পত্রসংখ্যা–১১৮] সংস্কৃতে রচিত শিরোনামহীন আটটি শ্লোকও দৃষ্ট হয়)।

ক্রম	মূল কবিতা	অনুবাদ
১.	The Song of the Sannayasin	সন্ন্যাসীর গীতি
২.	To the Awakened India	প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি
৩.	Kali the Mother	মৃত্যুরূপা মাতা
৪.	My play is done	খেলা মোর হল শেষ
৫.	No one to Blame	দোষ কারো নয়
৬.	Hold on Yet a While, Brave Heart	ধৈর্য ধর কিছুকাল হে বীর হৃদয়
৭.	Angels Unawares	অজানা দেবতা
৮.	Thou Blessed Dreams	হে স্বপন!
৯.	To an Early Violet	অকালে ফোটা একটি ফুলের প্রতি
১০.	Who knows how Mother plays	কে জানে মায়ের খেলা
১১.	The Cup	পানপাত্র
১২.	The living God	জাগ্রত দেবতা
১৩.	Light	আলোক
১৪.	Requiescat in Pace	শান্তিতে সে লভুক বিশ্রাম
১৫.	A Benediction	আশীর্বাদ
১৬.	To the fourth of July	মুক্তি
১৭.	Peace	শান্তি
১৮.	Song of the Free	জীবন্মুক্তের গীতি
১৯.	To my own Soul	আমারই আত্মাকে
২০.	সখার প্রতি	
২১.	নাচুক তাহাতে শ্যামা	
২২.	গাই গীত শুনাতে তোমায়	
২৩.	সাগর বক্ষে	

স্তব-স্তোত্র

২৪.	শিরোনামহীন ৮টি শ্লোক	সংস্কৃত
২৫.	শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্রাণি	সংস্কৃত
২৬.	শ্রীরামকৃষ্ণপ্রণামঃ	
২৭.	শিবস্তোত্রম্	
২৮.	অম্বাস্তোত্রম্	

➢ *বিভাগ ৬ : চিঠিপত্র*

চিঠি সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করতেন “যারা ভালো চিঠি লেখে, তারা মনের জানালার ধারে বসে আলাপ করে যায়। তার কোনো ভার নেই, বেগও নেই, স্রোত আছে”। চিঠির মধ্যে থাকা ঐ স্রোতই প্রেরকের ভাবাবেগকে প্রাপকের অন্তঃস্থলে পৌঁছে দেয়। নিবিড় বেদনা হোক বা অত্যন্ত আনন্দ, সুগভীর আশা হোক বা অগভীর প্রত্যাশা; চিঠি লেখার যেকোনও কারণ থাকতে পারে। আর, প্রেরক ও প্রাপকের গণ্ডী ছাড়িয়ে যখন তা আমজনতার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয়, তখন তা হয়ে ওঠে ঐ মধুর যোগসূত্রটির উপলব্ধির এক উপাদেয় উপাদান। স্বামী বিবেকানন্দের অসংখ্য চিঠিপত্র এরকমই এক উপাদান।

পত্রসাহিত্যে চিঠিপত্রের বিষয়বস্তু মোটের উপর তিন ধরণের। যথা– বৈষয়িক, প্রণয়মূলক ও অনুভূতিপ্রবণ।[২৩] অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দের মতো বহুমুখী ব্যক্তির চিঠিপত্রকে এইরকম নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুতে ভাগ করা অসমীচীন হবে। কোনও চিঠিতে যেমন পাণিনি ব্যাকরণ ও মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের উৎকৃষ্টতার তারতম্য সূচিত হয়েছে (পত্র সংখ্যা ৩, বাণী ও রচনা, খন্ড–৬), তেমনই কোনও চিঠিতে বৈরাগ্যের উজ্জ্বল মহিমার পক্ষে দীর্ঘ যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে (পত্র সংখ্যা ১৩৬, বাণী ও রচনা, খন্ড–৭)। অতএব ‘versatility’ বা ‘বিবিধার্থকতা’র কারণে বিষয়বস্তুর দিক থেকে ভাগ না করে স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র চিঠিপত্র থেকে বেশ কিছু তথ্য উপস্থাপন করা যেতে পারে।

‘স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা’ অনুসরণে তাঁর রচিত সর্বমোট পত্রের সংখ্যা পাঁচশত পঞ্চাশটিরও উপরে। তিনি চিঠিপত্রগুলি বাংলা, ইংরাজি, সংস্কৃত ও ফরাসী এই চারটি ভাষাতেই লিখেছিলেন। সংস্কৃত ও ফরাসী ভাষায় লেখা চিঠির সংখ্যা কম। সংস্কৃত ভাষায় মোট তিনটি চিঠি পাওয়া যাচ্ছে, যার মধ্যে দুইটি (পত্র সংখ্যা ৩২৯, ৩৪৯) শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে ও একটি (পত্র সংখ্যা ৩৪১) শুদ্ধানন্দকে। ফরাসী ভাষায় দুইটি চিঠি (পত্র সংখ্যা ৫১২,৫১৩) উপলব্ধ; একটি মাদাম কাল্‌ভের উদ্দেশ্যে অন্যটি ক্রিস্টিনের উদ্দেশ্যে। এ বাদে সমস্ত চিঠিপত্র বাংলা ও ইংরাজি ভাষায় লিখিত।

অপর একটি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য এই যে কাদের তিনি বেশীবার চিঠি লিখেছেন, তাঁর একটা মোটামুটি বিবরণ পাওয়া যায় চিঠির সূচীপত্র থেকে। আলাসিঙ্গা [৪৪টি], মিসেস ওলি বুল (ধীরামাতা) [৫৭টি], প্রমদা মিত্র [৩২টি], নিবেদিতা [৩০টি], ব্রহ্মানন্দ [৩৫টি], মেরী হেল [৪৫টি], মিস ম্যাকলাউড [৩৭টি], রামকৃষ্ণানন্দ [২২টি] ও স্টার্ডি [৩১টি] –এরা হলেন সেই সমস্ত ব্যক্তি যাদের সাথে বিবেকানন্দের পত্রালাপ সবথেকে বেশী।

➢ *বিভাগ ৭ : সঙ্গীত*

স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে ছিল বহুমুখী প্রতিভার সন্নিবেশ। বক্তৃতা হোক বা প্রবন্ধ রচনা তিনি ছিলেন সবদিকেই সিদ্ধহস্ত। এরকমই সঙ্গীতেও তাঁর বিশেষ দক্ষতার পরিচয় মেলে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে, গৃহী জীবনে তাঁর যেমন মানসিক স্বাচ্ছন্দের অত্যন্ত অভাব ছিল, তেমনই সন্ন্যাসী জীবনে ছিল চূড়ান্ত কর্মব্যস্ততা। স্বাভাবিকভাবেই জীবনের ঐ দুই প্রবাহে সঙ্গীত রচনার কোনওরূপ অনুকূল পরিবেশ না থাকা সত্ত্বেও তিনি যে কটি গীত রচনা করেছিলেন, তা তাঁর অকৃত্রিম সঙ্গীত প্রীতির সাক্ষ্য বহন করে। দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় সর্বান্তকরণে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গীতপ্রীতির উচ্চ সমর্থন জানিয়েছেন– “সঙ্গীতের যথার্থ প্রেরণা না থাকলে তাঁর গান রচনা সম্ভব হত না। স্বামী বিবেকানন্দের রচিত গানের

সংখ্যাল্পতা সেজন্যে বড় কথা নয়। লক্ষণীয় হল গানের গুণাবলী; তার ভাব, ভাষা ও গঠনের সৌকর্য। গাইবার পক্ষে তাঁর গানগুলির উপযোগিতা। তা ছাড়া প্রয়োজনীয় অবসর ইত্যাদির কথাও বিবেচ্য। তাঁর গায়ক জীবন সম্পর্কে যে কথা প্রযোজ্য, গান রচয়িতা রূপেও তাঁর বিষয়ে সেকথা বলা যায়। অর্থাৎ তিনি যদি উপযুক্ত অবকাশ ও পরিবেশ পেতেন তাহলে গান রচয়িতা রূপেও আপন প্রতিভার দান উপযুক্ত পরিমাণে রেখে যেতেন"।[২৪]

যেসব গান তিনি রচনা করেছিলেন, সেইগুলিতে সুর সংযোজনা, তাল নির্দেশ ইত্যাদিও তিনি নিজেই সম্পূর্ণ করেন। কণ্ঠসঙ্গীতের পাশাপাশি যন্ত্রসঙ্গীতেও তাঁর ছিল সমান দখল। পাখোয়াজে তিনি ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী। একাধারে গায়ক ও বাদকের ভূমিকায় তিনি নিজেকে উপস্থাপন করার দক্ষতা রাখতেন। দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় তাত্ত্বিক বর্ণনা দিয়েছেন– "ধ্রুপদ গান গাইবার সময়ে গায়কের পক্ষে একযোগে মৃদঙ্গে সঙ্গত করা অতি কঠিন। একাধারে গান ও পাখোয়াজের সাধনায় দুর্লভ সিদ্ধি লাভের অধিকারী প্রতিভাধর ভিন্ন তা সম্ভব নয়। এবং এ বিষয়ে বেশি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। একমাত্র স্বনামধন্য যদুভট্ট সম্পর্কে একথা শোনা যায়। সঙ্গীত জগতে বাংলার গৌরব যদুভট্ট আপনার গানের সঙ্গে আপনি মৃদঙ্গে সঙ্গত করতে পারতেন। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত স্বামিজী"।[২৫]

গানের সাথে কবিতার পার্থক্যের জায়গা হল, গানের যথার্থ উপলব্ধি তখনই সম্ভব যখন তা প্রকৃত কণ্ঠে গীত ও কর্ণে শ্রুত হয়। সেইদিক থেকে স্বামী বিবেকানন্দের গানগুলি সত্যই সার্থক। তাঁর রচিত শ্রীরামকৃষ্ণ–আরাত্রিক সঙ্গীতটি (খন্ডন–ভব বন্ধন, জগ–বন্দন বন্দি তোমায়...) অদ্যাবধি প্রকৃত কণ্ঠে গীত ও কর্ণে শ্রুত হয়ে আসছে।

তাঁর রচিত গানের সংখ্যা ছয়টি। সেগুলি হল–

১. তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা...

২. নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ শশাঙ্ক সুন্দর...

৩. একরূপ, অরূপ–নাম–বরণ, অতীত–আগামী–কাল–হীন...

৪. মুঝে বারি বনোয়ারী সেঁইয়া...

৫. হর হর হর ভূতনাথ পশুপতি...

৬. খন্ডন–ভব বন্ধন, জগ–বন্দন বন্দি তোমায়...

৪.৩. প্রবন্ধসাহিত্য ও বিবেকানন্দ

প্রবন্ধের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, সংজ্ঞা ও ধারাবাহিক বিকাশ পূর্বেই সবিস্তারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে (পূর্বে ৩.৩ দ্রষ্টব্য)। একটি কথা সবিশেষ বলা যেতে পারে যে, সাহিত্যক্ষেত্রে একজন লেখকের ব্যক্তিগত ভাব প্রকাশের বা জ্ঞানের পরিস্ফুরণের যতরকম মাধ্যম আছে বা উপায় আছে, তার মধ্যে প্রবন্ধই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মাধ্যম। এর কারণ সম্ভবত প্রত্যক্ষতা তথা অন্তরঙ্গতা। অধীর দে মহাশয় *Compton's Pictured Encyclopedia* থেকে উদ্ধার করেছেন, "...unlike the novel or the short story or the drama, the essay does not aim primarily to create characters and through them to tell the story. It speaks directly to the reader, giving the author's views on customs or happenings or people, on art, on books or on life in general. It may teach, argue,

persuade, arouse emotion or merely amuse".[২৬] পাঠকের সাথে অন্তরঙ্গতার কারণেই জ্ঞানগর্ভ বিষয়েও লেখকের ভাব ও ভঙ্গিমা স্বচ্ছন্দভাবে প্রকাশ পায়।

মোটামুটিভাবে আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে চারটি পর্বে ভাগ করা যায়– রামমোহন পর্ব, অক্ষয়–ঈশ্বর পর্ব, বঙ্কিম পর্ব ও রবীন্দ্র পর্ব। স্বামী বিবেকানন্দ এই হিসেবে একজন রবীন্দ্র পর্বের প্রাবন্ধিক। রবীন্দ্র পর্বের প্রবন্ধগুলিতে একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, বিষয়নির্ভরতা থেকে ভাবনির্ভরতাতে উত্তরণ। প্রবন্ধ রচনার কৌশল, বাচনভঙ্গি, বিষয়বস্তুর উপস্থাপনার আঙ্গিক প্রভৃতি এই পর্বের প্রবন্ধগুলিতে প্রাধান্য পেয়েছিল।

একেবারে প্রাথমিক স্তরে, প্রবন্ধকে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে– বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধ ও ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। ব্যক্তিগত প্রবন্ধে আত্মগত দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যক্তিহৃদয়েরই প্রাধান্য। অপরদিকে বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধে বিষয়বস্তুর প্রাধান্যই মুখ্য। এবং এই বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধগুলিকে আবার আপাতভাবে চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে– বিবৃতিমূলক (যেমন ঐতিহাসিক বা সাময়িক ঘটনাশ্রিত), বর্ণনামূলক (যেমন রাষ্ট্র, সমাজ বা বিজ্ঞানাশ্রিত), তত্ত্বমূলক (যেমন ধর্ম, দর্শনাশ্রিত) ও ব্যাখ্যামূলক (যেমন শিক্ষা, সাহিত্যাশ্রিত)। স্বামী বিবেকানন্দ রচিত মৌলিক প্রবন্ধের সংখ্যা চারটি– প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য (The East and The West), পরিব্রাজক (Memories of European Travel), বর্তমান ভারত (Modern India) এবং ভাববার কথা (Matter for serious thought)। তাঁর প্রবন্ধগুলিতে তার মননশীলতা, বিশ্লেষণ–শক্তি ও ভূয়োদর্শিতার পরিচয় স্পষ্ট। রবীন্দ্র পর্বের প্রাবন্ধিক হলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যরীতিতে তিনি প্রভাবিত ছিলেন না। সাহিত্যসমালোচক ক্ষেত্র গুপ্ত মনে করেন, স্বামী বিবেকানন্দের মননশীলতা ও বিশ্লেষণী ক্ষমতাতে সমাজচেতনা যতটা ফুটে উঠেছে ততটা সেই সময়ের কারও লেখাতে প্রকাশিত হয়নি।[২৭]

৪.৪. বিবেক মননে সাংখ্য দর্শন

ভারতবর্ষের মাটিতে বেদান্তের সুদীর্ঘ ইতিহাস সুপ্রোথিত ও আপন মহিমায় ভাস্বর। তথাপি বেদান্তের প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্ত্য যাত্রায় এবং সমগ্র বিশ্বব্যাপী এক অসামান্য আবেদন সৃষ্টি করার পিছনে যিনি অন্যতম কারিগর ছিলেন, তিনি বেদান্ত–পুরুষ বিবেকানন্দ।

বেদান্তের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ভারতীয় আস্তিক দর্শনগুলির প্রথম প্রয়াসরূপ সাংখ্যদর্শনের মহত্ত্ব। স্পষ্টবক্তা বিবেকানন্দ একথা সর্বসমক্ষে স্পষ্ট করেছেন যে সাংখ্যদর্শনই হল বেদান্তের উপলব্ধিতে 'stepping stone' বা প্রথম পদক্ষেপ– "I want this to be clear, because it is the stepping-stone to Vedānta and it is absolutely necessary for you to understand it because this is the basis of the philosophy of the world. There is no philosophy in the world that is not indebted to Kapila" {এই বিষয়টি আমি স্পষ্টভাবে আপনাদিগকে বুঝাইতে চাই, কারণ ইহা বেদান্ত বুঝিবার পক্ষে প্রথম সোপান স্বরূপ। আর ইহা আপনাদের জানা একান্ত আবশ্যক, কারণ ইহাই সমগ্র জগতের বিভিন্নপ্রকার দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তি। জগতের এমন কোন দর্শনশাস্ত্র নাই, যাহা এই সাংখ্যদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা কপিলের নিকট ঋণী নয়}।[২৮] যথার্থ উক্তি নিঃসন্দেহে। তবে গ্রীক দর্শনের সাথে সম্পর্ক খুঁজতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ যখন গ্রীকদের 'আলেকজান্দ্রিয় দর্শন'[২৯] ও পরবর্তীকালের 'নস্টিক দর্শনে'র[৩০] ভিত্তিভূমিরূপে পিথাগোরাসের সাংখ্যদর্শন অধ্যয়নের তথ্য পরিবেশন করেন[৩১] তখন তা সাংখ্যের ব্যাপক মহিমা উদ্ভাসিত করলেও উপযুক্ত তথ্যসূত্রের

অভাবে[৩২] নিঃসংশয়ে তা মেনে নিতে অস্বস্তি হয়। তবে কাপিল দর্শন বা সাংখ্যদর্শনের প্রতি সকলের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা উচিত বলে তিনি মনে করেন কারণ যুক্তি-তর্ক, বিচার-বিমর্শের সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা সাংখ্যদর্শনেই হয়েছিল- "The Sānkhya philosophy of Kapila was the first rational system that the world ever saw. Every metaphysician in the world must pay homage to him. I want to impress on your mind that we are bound to listen to him as the great father of philosophy" {এই কপিল-দর্শনই পৃথিবীতে যুক্তি বিচার দ্বারা জগত্তত্ত্ব ব্যাখ্যার সর্বপ্রথম চেষ্টা। কপিলের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা জগতের সকল দার্শনিকেরই উচিত। আমি আপনাদের মনে এইটি বিশেষ করিয়া মুদ্রিত করিয়া দিতে চাই যে, দর্শনশাস্ত্রের জনক বলিয়া আমরা তাঁহার উপদেশ শুনিতে বাধ্য এবং তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা শ্রদ্ধা করা আমাদের কর্তব্য}।[৩৩]

৪.৪.১. প্রস্তাব: প্রকৃতি

বেদান্তের আলোচনার পথ সুগম করতে স্বামী বিবেকানন্দ সাংখ্যের প্রেক্ষাপট আলোচনায় সর্বাধিক মনোনিবেশ করেছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল, বেদান্ত সাংখ্যের প্রতিবন্ধক নয়, তা পরিপূরক। সাংখ্যের অপ্রাশস্ত্যের স্থলে বেদান্ত বাধা সৃষ্টিকারক নয় বরং সেই পথের 'লুপহোল'গুলির মেরামত কারক। তাই 'Sānkhya and Vedānta' শীর্ষক বক্তৃতায় তিনি সর্বাগ্রে ঘোষণা করেছেন, "I shall give you a resume of the Sānkhya Philosophy, through which we have been going. We, in this lecture, want to find where its defects are, and where Vedānta comes in and supplements it" {প্রথমে আপনাদের নিকট যে সাংখ্যদর্শনের আলোচনা করিতেছিলাম, এখন তাহার মোট কথাগুলি সংক্ষেপে বলিব কারণ এই বক্তৃতায় আমরা ইহার ত্রুটি কোনগুলি তাহা বাহির করিতে এবং বেদান্ত আসিয়া কীরূপে ঐ অপূর্ণতা পূর্ণ করিয়া দেন তাহা বুঝিতে চাই}।[৩৪]

প্রকৃতির আলোচনায় সর্বাগ্রে আসে গুণত্রয়ের কথা। সাংখ্যদর্শন অনুযায়ী প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সাম্যবস্থা। উক্ত গুণত্রয়ের স্বরূপ, প্রয়োজন ও ক্রিয়ার আলোচনায় স্বামী বিবেকানন্দ কমবেশি তত্ত্বকৌমুদীকারের বিবরণকেই (পূর্বে ২.৪.৮ দ্রষ্টব্য) অনুসরণ করেছেন। তবে তাঁর সাবলীল প্রকাশভঙ্গি লক্ষ্য করার মতো। গুণত্রয়ের কার্যকারিতার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, তমঃ গুণের প্রাবল্যে ব্যক্তি আলস্যপরায়ণ হয়। তার মধ্যে নড়ন-চড়ন দেখা যায় না। একপ্রকার নিষ্কর্মা হয়ে সে অবস্থান করে। আবার রজঃ গুণের প্রাবল্যে ঐ ব্যক্তির মধ্যে কখনও কখনও কর্মশীলতা প্রবল হয় এবং সত্ত্বগুণের প্রাবল্যে একপ্রকার সাম্য বিরাজ করে।[৩৫] অবশ্য এ তো গেল একজন ব্যক্তিতে সবকটি গুণের কার্যকারিতার প্রকাশ। অন্যদিকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে এক একটি গুণের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন কোনও ব্যক্তি কর্মশূন্য, অলস ও জাড্যগুণ বিশিষ্ট। অন্যদিকে কেউ কর্মশীল ও পরিশ্রমী। আবার কেউ শান্ত-স্থির, ক্রিয়াশীলতা ও নিষ্ক্রিয়তার সামঞ্জস্যের আধার।[৩৬]

গুণ-ত্রৈবিধ্য

সুতরাং প্রকৃতির লক্ষণ স্পষ্টতই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি শক্তির সাম্যবস্থা। আকর্ষণরূপ তমঃ ও বিকর্ষণরূপ রজঃ যখন সংযমরূপ সত্ত্বের দ্বারা সম্পূর্ণ সংযত হয় তথা সম্পূর্ণ সাম্যবস্থার কারণে কোনওরূপ সৃষ্টি বা বিকার থাকে না, তখন সেই অবস্থাকে প্রকৃতি বলা হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই শক্তিত্রয়ের প্রতিনিয়ত সাম্যবস্থা ও বৈষম্যবস্থার দরুণই প্রকৃতি থেকে নতুন সৃষ্টির উপক্রম হয়। তিনি প্রসঙ্গক্রমে, সাংখ্যের প্রকৃতির দুইটি মাত্রার (dimension) কথা বলেছেন। তাঁর মতে আর পাঁচজন যে অর্থে nature বা

প্রকৃতির লক্ষণ

প্রকৃতি বোঝে সেই অর্থে প্রকৃতি সমার্থক। অন্যদিকে, অপেক্ষাকৃত পারিভাষিক নাম অব্যক্ত। অব্যক্ত অর্থাৎ অপ্রকাশিত। এই অব্যক্ত–প্রকৃতি হতেই অনু–পরমাণু, জড়বস্তু, মন–বুদ্ধি তথা সকল পদার্থের উৎপত্তি।[৩৭]

পাতঞ্জল–যোগসূত্রের[৩৮] ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি এক পৌরাণিক কাহিনীর অবতারণাপূর্বক দেখিয়েছেন, প্রকৃতির একমাত্র উদ্দেশ্য পুরুষের স্বরূপে আরোপ। কাহিনীটি এইরূপ যে, দেবরাজ ইন্দ্র একসময় শূকরের রূপ ধারণ করে একটি কর্দমাক্ত জায়গায় একটি শূকরী ও অনেকগুলি শাবকসহ বাস করতে থাকেন। বাকি দেবগণ দেবরাজকে স্বর্গে ফিরে যাবার অনুরোধ করতে আসলে তিনি তাদের যথারীতি ফিরিয়ে দেন। দেবতারা মনস্থির করলেন শূকরী ও শাবকগুলিকে হত্যা করার। শূকরী ও সেই শাবকগুলি নিহত হলেও দেবরাজ স্বস্বরূপটি স্মরণ করতে পারলেন না। শোকে কাতর হয়ে বিলাপ করতে শুরু করলেন। পুরুষ বা আত্মাও এইরূপে প্রকৃতির সাথে মিলিত হয়ে তাঁর শুদ্ধ ও অনন্ত স্বরূপটি বিস্মৃত হন। সুতরাং প্রকৃতির উদ্দেশ্য পুরুষের স্বরূপে আরোপ। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "…the great Ātman, the Infinite being, without birth or death, established in its own glory. It appears to have become so degenerate that if you approach to tell it, 'You are not a pig', it begins to squeal and bite" {অনন্ত পুরুষের স্বরূপ–তাঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, তিনি নিজ মহিমায় বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু তিনি স্বরূপ ভুলিয়া এতদূর অধঃপতিত হইয়াছেন যে, যদি তুমি তাঁহার নিকট গিয়া বলো, 'তুমি শূকর নও', তিনি চিৎকার করিতে থাকিবেন ও তোমাকে কামড়াইতে আরম্ভ করিবেন}।[৩৯]

প্রকৃতির উদ্দেশ্য

সাংখ্যমতানুযায়ী মূল–প্রকৃতি হতেই মহদাদি ক্রমে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উৎপত্তি (পূর্বে ২.৪.১০ দ্রষ্টব্য)। যাইহোক, প্রকৃতির সেই প্রথম বিকাশকে 'মহত্' বলে। স্বামী বিবেকানন্দের মতে এই 'মহত্' ব্যাপারটিকে আমরা 'সমষ্টি বুদ্ধি' রূপে বুঝাতে পারি। আবার সেই মহৎ তত্ত্ব বা সমষ্টি বুদ্ধি থেকেই সমষ্টি অহংকারের উৎপত্তি। এবার একদিক থেকে এই মহৎ তত্ত্বকে যেমন অহংকার বলা যায় না, তেমনই এই দুটি একটি অপরটি থেকে অনেকাংশে পৃথক, একথাও বলা যায় না। তাঁর মতে মহৎ ও অহংকার আসলে দুটি ভিন্নাবস্থা। অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম অবস্থা 'মহত্' আর অপেক্ষাকৃত স্থূল অবস্থা 'অহংকার'। তিনি যুক্তি দিচ্ছেন, "In nature, for instance, you note certain changes going on before your eyes which you see and understand but there are other changes, so much finer, that no human perception can catch them. They are from the same cause, the same 'Mahat' is making these changes" {প্রকৃতিতে কতকগুলি পরিবর্তন আপনাদের চক্ষের সমক্ষে ঘটিতেছে, আপনারা সেগুলি দেখিতেছেন ও বুঝিতেছেন, কিন্তু আবার কতকগুলি পরিবর্তন আছে, সেগুলি এত সূক্ষ্ম যে কোন মানবীয় বোধশক্তিরই আয়ত্ত নয়। এই উভয় প্রকার পরিবর্তন একই কারণ হতে হইতেছে, সেই একই মহৎ ঐ উভয়প্রকার পরিবর্তন সাধন করিতেছে}।[৪০]

মহত্ ও অহংকার

এই প্রসঙ্গে তিনি শারীরবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের একটি অমীমাংসিত সমস্যার দিকেও ইঙ্গিত করেছেন। 'মন' বিষয়টির অস্তিত্ব নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্কের অন্ত নেই। বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে একটি বিষয়ের অস্তিত্ব তখনই স্বীকার করা হবে, যখন সেই বিষয়টিকে মাপা (measure) যায়। 'মন' যেহেতু পরিমাপের বাইরে তাই বিজ্ঞানীরা এর অস্তিত্বে সন্দিহান।[৪১] প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালীর এই ভিন্নতা সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন যথেষ্ট পরিমাণে। তাই মনের ধারণায় পাশ্চাত্য মতামতের প্রতি কোনওরূপ বিরূপ ধারণা পোষণ করেননি, বরং 'গোড়ায় গলদে'র জায়গাটি পাঠকের সামনে তুলে

ধরেছেন– "I want to impress this on your mind. It is very hard to grasp it, because in Western countries the ideas are so queer about mind and matter. It is hard to get those impressions out of our brains. I myself had a tremendous difficulty, being educated in Western philosophy in my boyhood" {আমি এই বিষয়টি আপনাদের মনে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করিয়া দিতে চাই। এটি ধারণা করা বড় কঠিন, কারণ পাশ্চাত্ত্য দেশে মন ও জড় সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণা আছে। মস্তিষ্ক হইতে ঐসকল সংস্কার দূর করা বড়ই কঠিন। বাল্যকালে পাশ্চাত্ত্য দর্শনে শিক্ষিত হওয়ায় আমাকেও এই তত্ত্ব বুঝিতে প্রচন্ড বাধা পাইতে হইয়াছিল}।[৪২] তিনি এইস্থলে 'মহত্' বা সমষ্টি বুদ্ধির স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুইপ্রকার অবস্থার কথা বলে ঈঙ্গিত করতে চেয়েছেন সম্ভবত মনের সূক্ষ্ম অবস্থার ও মস্তিষ্কের স্থূল অবস্থার প্রতি।[৪৩]

তবে তাৎপর্যপূর্ণ এই যে, বস্তুজগতের যা কিছু ভৌতিক-বস্তু তা সকলই মহৎ হতে উৎপন্ন। তিনি এই বিষয়টি প্রমাণ করতে তৎপর হয়েছেন। তবে, তার পূর্বে প্রেক্ষাপট রূপে সাংখ্যেরই একটি বক্তব্যকে কিঞ্চিৎ আলোচনা করে নিতে হয়। সাংখ্যদর্শন 'দেহভাণ্ড' ও 'ব্রহ্মাণ্ডে'র একরূপতার কথা বলে। অর্থাৎ একটি মনুষ্য শরীর যে নিয়মে গঠিত, সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডও সেই নিয়মে ক্রমবিকাশপ্রাপ্ত। আর, ব্রহ্মাণ্ডের এই ক্রমবিকাশে প্রথম রূপই 'মহত্' বা 'বুদ্ধিতত্ত্ব'। তিনি সাবলীল মন্তব্য করেছেন, "There is an infinite storehouse of intelligence out of which we draw what we require; there is an infinite storehouse of mental force in the universe out of which we are drawing eternally…" {আমাদের মধ্যে সকলেই সেই মহৎতত্ত্বের অংশ। সমষ্টি বুদ্ধিতত্ত্ব রহিয়াছে, তাহা হইতে আমাদের যাহা প্রয়োজন তাহা গ্রহণ করিতেছি; এইরূপ জগতের ভিতরে সমষ্টি মনস্তত্ত্ব রহিয়াছে, তাহা হইতেও আমরা চিরকালই প্রয়োজনমত লইতেছি}।[৪৪] যাইহোক, তিনি টেবিলের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। চোখের সামনে একটি টেবিল আছে যেটির স্বরূপ কী, তা একজন ব্যক্তি জানেন না। এমতাবস্থায়, ঐ টেবিল দর্শনেন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে মনের নিকটে যায়। মন তখন ঐটির উপর একটি প্রতিক্রিয়া পাঠায়, যে প্রতিক্রিয়াটিকে ব্যক্তি 'টেবিল' বলে থাকেন। তিনি এই দৃষ্টান্তের যুক্তি রেখেছেন, "I, with my own mind, have furnished the material for my eyes. There is something which is outside, which is only the occasion, the suggestion, and upon that suggestion, I project my mind; and it takes the form that I see" {আমি আমার নিজমনের দ্বারা আমার চক্ষুকে প্রয়োজনীয় উপাদান দিয়াছি, আর বাহিরে যাহা আছে, তাহা উদ্দীপক বা উত্তেজক কারণ মাত্র। সেই উত্তেজক কারণ আসিলে আমি আমার মনকে উহার দিকে প্রক্ষেপ করি এবং উহা আমার দ্রষ্টব্য বস্তুর আকার ধারণ করিয়া থাকে}।[৪৫]

'মহত্'ই সমগ্র ভৌতিক বস্তুর উপাদান

স্থূল অহংতত্ত্বের একটি পরিণাম 'ইন্দ্রিয়'। ইন্দ্রিয়সমূহ দুইভাগে বিভক্ত– জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়। সংখ্যায় এরা পাঁচটি পাঁচটি করে। ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বিশেষ মন্তব্য করেননি, তবে প্রশ্ন রেখেছেন 'ইন্দ্রিয়' কোনগুলি? স্বাভাবিকভাবেই উত্তর হয়, চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক্ ইত্যাদি যেগুলি দিয়ে আমরা দর্শন-শ্রবণ-ঘ্রাণ-আস্বাদন-স্পর্শ করে থাকি। কিন্তু তিনি চক্ষু-কর্ণ এইগুলিকে ইন্দ্রিয়ের স্বীকৃতি দিতে নারাজ। তার মতে চোখ বা কান যদি স্নায়ুকেন্দ্র থেকে পৃথক অবস্থান করে তাহলে চোখের দ্বারা দর্শন বা কানের দ্বারা শ্রবণকার্য সমাধা হবে না। অতএব স্নায়ুকেন্দ্রই প্রকৃত ইন্দ্রিয়, চক্ষু-কর্ণাদি

ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ

বাহ্যযন্ত্রমাত্র– "Here are the eyes, but the eyes do not see. Take away the brain centre; the eyes will still be there, as also the picture of the outside world complete on the retinae; yet the eyes will not see. So the eyes are only a secondary instrument, not the organ of vision. The organ of vision is the nerve-centre in the brain. Likewise the nose is an instrument and there is an organ behind it. The senses are simply the external instruments" {এই চক্ষু রহিয়াছে, কিন্তু চক্ষু দেখে না। চক্ষু যদি দেখিত, তবে মানুষের যখন মৃত্যু হয় তখন তো চক্ষু অবিকৃত থাকে, তবে তখন তারা দেখিতে পাইত। কোনখানে কিছুর পরিবর্তন হইয়াছে, কোন-কিছু মানুষের ভিতর হইতে চলিয়া গিয়াছে; আর সেই কিছু যাহা প্রকৃতপক্ষে দেখে, চক্ষু যাহার যন্ত্রস্বরূপ মাত্র, তাহাই যথার্থ ইন্দ্রিয়। এইরূপ এই নাসিকাও একটি যন্ত্রমাত্র, উহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত একটি ইন্দ্রিয় আছে। আধুনিক শারীরবিজ্ঞান আপনাদিগকে বলিয়া দেবে, উহা কি? উহা মস্তিষ্কস্থ একটি স্নায়ুকেন্দ্র মাত্র। চক্ষুকর্ণাদি কেবল বাহ্যযন্ত্র}।[৪৬] প্রসঙ্গক্রমে এই প্রশ্নেরও উত্থাপন করা হয়েছে যদি চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি 'বাহ্যযন্ত্র'গুলির অবস্থান স্নায়ুকেন্দ্রে তাহলে পৃথক পৃথক কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? একটিই কেন্দ্র স্বীকার করে নিলে হয়? এর উত্তরে তিনি ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে থাকা মন/বুদ্ধি/চিত্ত/অহংকারের ভূমিকা উল্লেখ করেছেন। তার মতে একই সময়ে শ্রবণ–মনন ইত্যাদি সবকটি কাজ সমাধা করা মনের পক্ষে অসম্ভব। তাই পৃথক স্নায়ুকেন্দ্রের ব্যবস্থা– "If there was only one organ for all the instruments, the mind would see and hear and smell at the same time and it would be impossible for it not to do all these at one and the same time. Therefore it is necessary that there should be a separate organ for each sense" {যদি একটিমাত্র স্নায়ুকেন্দ্র বা ইন্দ্রিয় থাকিত তবে মনকে একই সময়ে দেখিতে, শুনিতে ও আঘ্রাণ করিতে হইত আর উহার পক্ষে একই সময়ে এই তিনটি কার্য করা অসম্ভব হইত। অতএব প্রত্যেকটির জন্য পৃথক পৃথক স্নায়ুকেন্দ্রের প্রয়োজন}।[৪৭]

তন্মাত্র ও মহাভূত

অহংতত্ত্বের অপর একটি পরিণাম তন্মাত্র। রূপ–রস–গন্ধ–শব্দ–স্পর্শ সংখ্যায় পাঁচটি এই তন্মাত্র প্রকৃতপক্ষে সূক্ষ্ম, প্রত্যক্ষের বিষয় নয়, তবে অনুভবের বিষয় মাত্র। সে কীরকম? স্বামী বিবেকানন্দ সহজ ও সাবলীল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, "I smell a flower. To smell, something must come in contact with my nose. The flower is there but I do not see it move towards me. That which comes from the flower and in contact with my nose is called the Tanmātra, fine molecules of that flower" {আমি একটি পুষ্প আঘ্রাণ করিতেছি, উহার গন্ধ পাইতে গেলে কিছু একটা অবশ্য আমার নাসিকার সংস্পর্শে আসিতেছে। ওই পুষ্প রহিয়াছে–উহা যে আমার দিকে আসিতেছে, এমন তো দেখিতেছি না; কিন্তু কিছু যদি আমার নাসিকার সংস্পর্শে না আসিয়া থাকে তবে আমি গন্ধ পাইতেছি কীরূপে? ঐ পুষ্প হইতে যাহা আসিয়া আমার নাসিকার সংস্পর্শে আসিতেছে তাহাই তন্মাত্র, ঐ পুষ্পেরই অতি সূক্ষ্ম পরমাণু}।[৪৮] পুনরায় সূক্ষ্ম এই তন্মাত্রসকল হতে উৎপন্ন হয় স্থূল পঞ্চভূতসমূহ; ক্ষিতি–অপ্–তেজ–মরুত্–ব্যোম। তিনি যুক্তিসহকারে এই পঞ্চভূতের উৎপত্তি ও লয় ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে অব্যক্ত প্রকৃতি স্পন্দিত হতে থাকলে আকাশ থেকে উৎপত্তি হয় বায়বীয় বা বাষ্পীয় পদার্থের। স্পন্দন যখন আরও দ্রুত হয় তখন বায়বীয় পদার্থ থেকে উত্তাপ বা তেজের উৎপত্তি হয়। তেজ আবার ক্রমশই শীতল হতে থাকে ও তরলাকার ধারণ করে, সেইটিকে অপ্ বলা হয়। এবং সবশেষে যখন কঠিনাকার প্রাপ্ত হলে, তখন সেইটি হয় ক্ষিতি বা পৃথিবী। তাঁর ভাষায়, "We had ether, and motion, then came heat, then it became liquified and then it condensed into gross

matter" {সর্বপ্রথমে আকাশের স্পন্দনশীল অবস্থা, তারপর উত্তাপ, তারপর ইহা তরল হইয়া যাইবে আর যখন আর ঘনীভূত হইবে তখন উহা কঠিন জড় পদার্থের আকার ধারণ করিবে}।[৪৯]

তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে এই তন্মাত্র ও মহাভূতের তত্ত্ব পরবর্তীকালে দর্শনশাস্ত্রের অভিপ্রেত পথে হয়নি তাই তিনি সেদিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, "We generally find these things very curiously translated; people do not go to the philosophers or the commentators for their translation, and have not the brains to understand them themselves. A silly man reads three letters of Sanskrit and translates a whole book. They translate the elements as air, fire and so on. If they would go to the commentators, they would find they do not mean air or anything of that sort" {আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, লোকে এইগুলির অতি অদ্ভুত ইংরাজি অনুবাদ করিয়া থাকে। অনুবাদকগণ অনুবাদের জন্য প্রাচীন দার্শনিকগণের ও তাঁহাদের টীকাকারগণের সহায়তা গ্রহণ করেন না, আর নিজেদেরও এত বেশী বিদ্যা নাই যে নিজে নিজেই ঐগুলি বুঝিতে পারেন। তাঁহারা পঞ্চভূতের অনুবাদ করিয়া থাকেন বায়ু, অগ্নি ইত্যাদি। যদি তাঁহারা ভাষ্যকারগণের ভাষ্য আলোচনা করিতেন, তবে দেখিতে পাইতেন যে, ভাষ্যকারগণ ঐগুলি লক্ষ্য করেন নাই}।[৫০]

৪.৪.২. প্রস্তাব: পুরুষ

সাংখ্যমতে মূল প্রকৃতি ও প্রকৃতি হতে সৃষ্ট মহদাদির পারে স্বতন্ত্ররূপে অবস্থান করছেন পুরুষ। এই পুরুষ নির্গুণ তথা সর্বব্যাপী আত্মা। এখন, পুরুষ যদি নির্গুণ হন, তাহলে যে প্রশ্ন প্রথমেই উপস্থিত হয় সেইটি হল সর্বব্যাপী আত্মা সুখী বা দুঃখীরূপে প্রতীত হয় কেন? সাংখ্যপ্রণেতারা এর উত্তরে জবাকুসুম ও স্বচ্ছ স্ফটিকের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। তাদের মতে আত্মার এই সুখী-দুঃখীরূপে প্রতীতি প্রতিফলনের জন্য। সেইটি কীরকম? একটি স্বচ্ছ স্ফটিকের নিকট লাল ফুল রাখলে স্বচ্ছ স্ফটিকটি লাল বর্ণ প্রাপ্ত হয়। এরূপ আত্মা সর্বদাই স্বচ্ছ স্ফটিকের ন্যায় কিন্তু এই আত্মা যেরূপ মনের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ বিকশিত হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ সাংখ্যের মনস্তত্ত্বের এই দিকটি তুলে ধরেছেন এবং বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করেছেন দৃষ্টান্ত সহযোগে।

মন রূপ আয়নায় প্রতিফলন

জীবগণের মধ্যে মানুষ একটি ক্রমোন্নতিশীল প্রাণী। দিন দিন তার জ্ঞান, শক্তি ইত্যাদির বিকাশ ঘটে। অবশ্য খেয়াল করলে দেখা যাবে, একটি শিশুর মধ্যে অত জ্ঞান বা শক্তি থাকে না, দীর্ঘকালে সে জ্ঞানবান ও শক্তিমান হয়। এখন মজার ব্যাপার, ঐ জ্ঞান ও শক্তি তার মধ্যেই ছিল, বাইরে থেকে এসে উপস্থিত হয়নি। শৈশবে তা অবিকশিত অবস্থায় ছিল, ক্রমে তা বিকশিত হয়েছে মাত্র এবং মন রূপ আয়নায় প্রতিফলিত হয়েই আত্মার এই বিকাশ ঘটেছে।

ব্যাপারটিকে আর একটু বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। বিষয়জ্ঞানে তথা অনুভূতিতে, কোনও কিছু দেখার সময় প্রথমেই রয়েছে দেখার যন্ত্র চোখ। চোখের পিছনে কার্যকরী ভূমিকা চোখের স্নায়ু ও স্নায়ুকেন্দ্রের। প্রকৃতপক্ষে চক্ষুযন্ত্রটি ইন্দ্রিয় নয়,

পুরুষ-অস্তিত্বে যুক্তি

তার পশ্চাতে থাকা এই স্নায়ু ও স্নায়ুকেন্দ্রই প্রকৃত ইন্দ্রিয়। তবে অনুভূতিতে শুধু যন্ত্র বা ইন্দ্রিয় থাকলেই চলে না; প্রয়োজন ইন্দ্রিয়ের সাথে মনের সংযোগের। শুধু তাই নয়, এর পরেও প্রয়োজন নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি বুদ্ধির কারণ বুদ্ধির নিকট হতে প্রতিক্রিয়ার পরেই বহির্জগৎ

প্রতিভাত হয়। কিন্তু তাতেও সবটা সম্পূর্ণ হয় না। সম্পূর্ণতার জন্য প্রয়োজন হয় একটা স্থির কিছুর যেটি মনের তুলনায় স্থির। এই স্থির পদার্থটিই পুরুষ বা আত্মা। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, "Just as every picture, being composed of successive impulse of light, must be united on something stationary to form a whole, so all the ideas in the mind must be gathered and projected on something that is stationary- relatively to the body and mind- that is, on what is called the Soul, or Purusha or Ātman" {ধারাবাহিক আলোর স্পন্দনে পরিস্ফুট কয়েকটি বিচ্ছিন্ন চিত্রকে লইয়া একটি সম্পূর্ণ চিত্র ফুটাইয়া তুলিতে হইলে সেগুলির প্রত্যেকটিকে যেমন কোনো একটি স্থির বস্তুর উপর ফেলিতে হয়, সেইরূপ মনের প্রত্যেকটি ভাবকেও একত্র করিয়া দেহ ও মনের তুলনায় যাহা স্থির, সেরূপ কোনো একটি পদার্থের উপর প্রক্ষেপ করিতেই হবে। এই স্থির পদার্থটিকেই বলে জীবাত্মা, পুরুষ বা আত্মা}।[৬১]

অতএব পুরুষ সাক্ষী স্বরূপ। প্রকৃতির সাথে হোক বা প্রকৃতিজাত মহৎ–বুদ্ধি প্রভৃতিতে; পুরুষ কোনওভাবেই তাদের সাথে মিশ্রিত হয় না। পুরুষ সাক্ষী স্বরূপে অবস্থান করে আছে মাত্র। দৈনন্দিন জীবনে 'সোনা গলানোর' একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন[৬২] করে তিনি পুরুষ কে একপ্রকার *Catalytic Agent* বলতে চেয়েছেন। সোনার গলনের জন্য সোনার সাথে পটাসিয়াম সায়ানাইড (Cyanide of Potassium) মেশানো হয়। এই পটাসিয়াম সায়ানাইড এমন একটি রাসায়নিক বস্তু, সোনার গলনে তার ভূমিকা থাকে অথচ সোনার গলনের পর ঐ পটাসিয়াম সায়ানাইড পৃথক থেকে যায়। তার উপর গলনের কোনও প্রভাব পড়ে না। স্বামী বিবেকানন্দের মতে পুরুষও ঠিক এই প্রকার। পুরুষ কোনওপ্রকারেই প্রকৃতির সাথে মিশ্রিত হয় না। এমনকি মহৎ বা বুদ্ধি এইসব বিকারও না। তাঁর ভাষায় পুরুষ শুদ্ধ ও পূর্ণ– "What then is this Purusha? It is neither intelligence nor will, but it is cause of all these. It is its presence that sets them all going and combining. It does not mix with nature; it is not intelligence, or Mahat; but the Self, the pure, is Purusha" {পুরুষকে সেই–সকল বস্তুর কয়েকটির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, যেগুলির শুধু সান্নিধ্যই রাসায়নিক কার্য তরান্বিত করে, যেমন সোনা গলাইতে গেলে তাহাতে পটাসিয়াম সায়ানাইড (Cyanide of Potassium) মিশাইতে হয়। পটাসিয়াম সায়ানাইড পৃথক থাকিয়া যায় (শেষ পর্যন্ত), উহার উপর কোন রাসায়নিক কার্য হয় না, কিন্তু সোনা গলানো রূপ কার্য সফল করিবার জন্য উহার সান্নিধ্য প্রয়োজন। পুরুষ সম্বন্ধেও এই কথা। উহা প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত হয় না, উহা বুদ্ধি বা মহৎ বা উহার কোনরূপ বিকার নয়, উহা শুদ্ধ পূর্ণ আত্মা}।[৬৩]

পুরুষ সাক্ষী - লৌকিক দৃষ্টান্ত

সাক্ষীস্বরূপে অবস্থানকারী এই পুরুষ চিৎ স্বরূপ। একথা ঠিক যে, চেতনা স্বরূপ ঐ পুরুষের অবস্থিতিতেই অবচেতন প্রকৃতি যাবতীয় সৃষ্টিকার্য সমাধা করে, কিন্তু পুরুষ কখনই প্রকৃতির জন্য নয় বরং প্রকৃতিই পুরুষের জন্য সর্বদা উপস্থিত। সাংখ্যকারিকার স্পষ্ট নির্দেশ 'সংঘাত–পরার্থত্বাত্...' (পূর্বে ২.৪.৯ দ্রষ্টব্য)। প্রকৃতির এই পরার্থ বিষয়টি সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে তিনি পাঠ্যপুস্তকের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। পাঠ্যপুস্তকের দ্বারা পাঠকের জ্ঞান জন্মায়, তবে জ্ঞানলাভের পর পাঠকের কাছে ঐ পাঠ্যপুস্তক একপ্রকার অর্থহীন। তেমনই আত্মার জ্ঞানলাভ পর্যন্তই প্রকৃতির গ্রহণযোগ্যতা কারণ তারপর আর প্রকৃতিতে আসক্তি নয়, অনাসক্তিই কাম্য। তাঁর ভাষায়, "… the common saying has it, we think that man lives to eat and not eats to live. We are continually making this mistake; we are regarding

পুরুষের জন্যই প্রকৃতি - লৌকিক দৃষ্টান্ত

nature as ourselves and are becoming attached to it; as soon as this attachment comes, there is the deep impression on the soul, which binds us down and makes us work not from freedom but like slaves" {চলিত কথায় আছে, আমরাও মনে করি– মানুষ খাবার জন্যই বাঁচে, বাঁচার জন্য যে খায় তা নয়। আমরা ক্রমাগত এই ভুল করিতেছি, প্রকৃতিকেই আমি ভাবিয়া উহাতে আসক্ত হইতেছি। এই আসক্তি হইতেই আত্মার উপর গভীর সংস্কার পড়ে। এই সংস্কারই আমাদিগকে বদ্ধ করে এবং স্বাধীনভাবে কর্ম করিতে না দিয়ে ক্রীতদাসের মত কর্ম করায়}। [৫৪]

সাংখ্যের এই পুরুষ তত্ত্বটিকে সর্বজনবোধ্য করতে স্বামী বিবেকানন্দ অনেকগুলি পর্যায়বাচী শব্দের প্রয়োগ করেছেন। কখনও সাক্ষী, কখনও চিৎস্বরূপ, কখনও পূর্ণ–শুদ্ধ আত্মা, কখনও আনন্দস্বরূপ, কখনও বা অমৃতত্ত্বস্বরূপ। তবে এই চরম বা পরম তত্ত্বের উপলব্ধির পক্ষে, পর্যায়বাচী শব্দের কোনও একটি যথেষ্ট নয়, এবং সম্ভবত সেই কারণেই তিনি পুনরায় পুরুষকে ব্যাখ্যা করেছেন সমগ্র জগতের মহা আকর্ষণ রূপে। কীভাবে পুরুষ জগতের মহা আকর্ষণ স্বরূপ? তাঁর ভাষায়, "You see a man going after gold, because behind it is a spark of the Purusha though mixed up with a good deal of dirt. When a man loves his children or a woman her husband, what is the attracting power? A spark of purusha behind them" {মানুষকে যে কাঞ্চনের অন্বেষণে ধাবমান দেখিতে পান, তাহার কারণ সে না জানিলেও প্রকৃতপক্ষে সেই কাঞ্চনের মধ্যে পুরুষের এক স্ফুলিঙ্গ বিদ্যমান। যখন মানুষ সন্তান প্রার্থনা করে, অথবা নারী যখন স্বামীকে চায় তখন কোন্ শক্তি তাহাদিগকে আকর্ষণ করে? সেই সন্তান ও স্বামীর ভিতর যে সেই পুরুষের অংশ আছে, তাহাই সেই আকর্ষণী শক্তি}। [৫৫]

পুরুষ-
মহা আকর্ষণ স্বরূপ

একেবারে স্পষ্টত না হলেও প্রকারান্তরে *বৃহদারণ্যকোপনিষদের* মধুকাণ্ডস্থ যাজ্ঞবল্ক্য–মৈত্রেয়ী সংবাদে 'ন বা অরে পত্যুঃ কামায পতিঃ প্রিযো ভবতি আত্মনস্তু কামায পতিঃ প্রিযো ভবতি' থেকে শুরু করে 'ন বা অরে সর্বস্য কামায সর্বং প্রিযং ভবতি আত্মনস্তু কামায সর্বং প্রিযং ভবতি'[৫৬] পর্যন্ত অংশে প্রতিফলিত আত্মপ্রীতির অনুরণন।

দৃষ্টান্ত সহ সাংখ্যের পুরুষ তত্ত্বের বহুবিধ ব্যাখ্যা করলেও স্বামী বিবেকানন্দ 'বহু–পুরুষ' তত্ত্বকে স্বীকার করেননি। বরং তা খন্ডন করেই বেদান্তের ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠাপূর্বক উৎকৃষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর প্রতিশ্রুতি রেখেছেন। তাঁর কথায়, "So far the analysis is perfect, the psychology incontrovertible. So far there is no objection. But if we ask the Sānkhya the question, 'who created nature?' – the Sānkhya says that the Purusha and the Prakriti are uncreate and omnipresent, and that of this Purusha there is an infinite number. We shall have to controvert these propositions and find a better solution and by so doing we shall come to Advatism" {ইহার (সাংখ্যের) মনোবিজ্ঞান অখন্ডনীয়, ইহার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি হইতে পারে না। আমরা কপিলকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, প্রকৃতি কে সৃষ্টি করিল? আর তাহার উত্তর পাইলাম– উহা সৃষ্ট নয়। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, পুরুষ অসৃষ্ট ও সর্বব্যাপী, আর এই পুরুষের সংখ্যা অনন্ত। আমাদিগকে সাংখ্যের এই শেষ সিদ্ধান্তটির প্রতিবাদ করিয়া উৎকৃষ্টতর সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে এবং তাহা করিলেই আমরা বেদান্তের অধিকারে আসিয়া উপস্থিত হইব}। [৫৭]

৪.৪.৩. প্রস্তাব: সৃষ্টি

চর্মচক্ষু দ্বারা দৃশ্যমান এই জগৎ সর্বাধিক বিস্ময়কর একটি বিষয়। ভারতীয় দর্শন পরম্পরায় এমন কোনও শাখা নেই যারা এই বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করেননি। জগতের অস্তিত্ব, নাস্তিত্ব এইসব বাদ-প্রতিবাদের উর্ধ্বে জগতের উৎপত্তি ও সৃষ্টি প্রক্রিয়া বিশ্লেষণে প্রত্যেকটি দর্শন পরম্পরা তাদের যুক্তিজাল বিস্তার করেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ সাংখ্যোক্ত জগৎ উৎপত্তির প্রক্রিয়াটি অবিকল স্বীকার করেছেন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা যখন নষ্ট হয় তথা এই ত্রিবিধ উপাদান যখন মিশ্রিত হয় তখন উৎপত্তি হয় এই জগতের। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সর্বোচ্চ প্রকাশ 'মহত্' বা 'বুদ্ধিতত্ত্ব'। তিনি এইটিকে সমষ্টি বুদ্ধি বলে নির্দেশ করেছেন এবং তাঁর মতে ব্যষ্টি মনুষ্যবুদ্ধি আসলে ঐ সমষ্টি বুদ্ধিরই একটি অংশমাত্র। যাইহোক সেই মহৎ বা সমষ্টি বুদ্ধি হতে অহংতত্ত্ব, তথা অহংতত্ত্ব হতে সূক্ষ্মভূতের উৎপত্তি হয়। এই সূক্ষ্মভূতগুলি পরস্পর মিলিত হয়ে স্থূলভূতে পরিণত হয় এবং স্থূলভূত হতে দৃশ্যমান এই স্থূল জগতের উৎপত্তি। অতএব জগৎ উৎপত্তির এই ক্রমে যা কিছু তফাৎ তা সূক্ষ্মতা ও স্থূলতাকে নিয়ে।

সাংখ্যোক্ত উৎপত্তি প্রক্রিয়া স্বীকার করে নিলেও তিনি তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গি রেখেছেন। পঞ্চভূত রূপে যে ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুত্-ব্যোম এর অবতারণা, সেখানে তাঁর ধারণা 'আকাশ'ই অন্যান্য ভূত বা স্থূল জড়গুলির কারণ। বিজ্ঞানের 'ইথার' শব্দটির সাথে আপাত সাদৃশ্য খোঁজ করে আকাশ কে তিনি আদিভূতের শিরোপা দিয়েছেন- "There is one element which, according to them, is eternal; every other element is produced out of this one.

সৃষ্টি প্রক্রিয়ায়
স্বামী বিবেকানন্দের
দৃষ্টিকোণ

It is called Ākāsha. It is somewhat similar to the idea of ether of moderns though not exactly similar" {অন্যান্য সকল ভূত এই এক ভূত হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। এই ভূত আকাশ নামে অভিহিত। আজকাল 'ইথার' বলিতে যাহা বুঝায় ইহা কতকটা তাহারই মতো যদিও সম্পূর্ণ এক নয়। আকাশই আদিভূত, উহা হইতেই সমুদয় স্থূলবস্তু উৎপন্ন হইয়াছে...}।[৫৮] তবে আকাশের সাথে সাথে প্রাণের অস্তিত্ব স্বীকার করে আকাশ ও প্রাণের মিলিত প্রচেষ্টায় কীরূপে এই সমুদয় স্থূল প্রপঞ্চের সৃষ্টি (পূর্বে ৪.৪.১ দ্রষ্টব্য), তা তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। এপ্রসঙ্গে প্রাণ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য- "You must at once get rid of the idea that Prāna is breath. Breath is one effect of Prāna. By Prāna are meant the nervous forces governing and moving the whole body, which also manifest themselves as thought" {প্রাণের সহিত শ্বাসপ্রশ্বাসের কোন সম্বন্ধ নাই, আপনাদের ঐ ধারণা এখনই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। শ্বাসপ্রশ্বাস এই প্রাণ বা সর্বব্যাপী শক্তির একটি কার্য মাত্র। ...প্রাণসমূহ অর্থে সেই স্নায়বীয় শক্তিসমূহ বুঝায়, যেগুলি সমুদয় দেহটিকে চালাইতেছে এবং চিন্তা ও দেহের নানাবিধ ক্রিয়ারূপে প্রকাশ পাইতেছে}।[৫৯]

মূল প্রকৃতি যখন অব্যক্ত অবস্থায় অবস্থান করে, তখন তার মধ্যে স্পন্দনের চিহ্ন থাকে না। এই অবস্থাটি স্পন্দনরহিত। তবে মূল প্রকৃতি যখন স্পন্দনরহিত অবস্থা থেকে স্পন্দিত হয়, তখন প্রাণ আকাশের উপর ক্রমাগত আঘাত করে। এইরূপ ক্রমাগত আঘাতে আকাশ ঘনীভূত হতে থাকে। ক্রমশ আকর্ষণ-বিকর্ষণ শক্তিদ্বয়ের প্রভাবে পরমাণু গঠিত হয়। পরমাণু

সৃষ্টি প্রক্রিয়া-
অনাদি ও অনন্ত

সকল ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে দ্ব্যণুকাদিতে ও সবশেষে বিভিন্ন স্থূলভূতে পরিণত হয়। ঐ স্থূলভূত গুলি থেকেই জাগতিক পদার্থসমূহের সৃষ্টি। অতএব, দৃশ্যজগতে যা কিছু গতি বা শক্তি তা 'প্রাণে'র বিকার অন্যদিকে যা কিছু জড় বা আকৃতিযুক্ত তা 'আকাশে'র বিকার। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় "You have never seen force without matter or matter without force; what we

call force and matter are simply the gross manifestations of these same things, which, when superfine, are called prāna and ākāsha. Prāna you can call in english; life, the vital force but you must not restrict it to the life of man. At the same time you must not identify it with Spirit, Atman. So this goes on. Creation cannot have either a beginning or an end; it is an eternal on-going" {আপনারা কখনই জড় ব্যতীত শক্তি বা শক্তি ব্যতীত জড় দেখেন নাই। আমরা যাহাদিগকে জড় ও শক্তি বলি, সেগুলি কেবল এই দুইটির (অর্থাৎ আকাশ ও প্রাণের) স্থূল প্রকাশ মাত্র এবং ইহাদের অতি সূক্ষ্ম অবস্থাকেই প্রাচীন দার্শনিকগণ প্রাণ ও আকাশ নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রাণকে আপনারা জীবনীশক্তি বলিতে পারেন কিন্তু উহাকে শুধু মানুষের জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিলে অথবা আত্মার সহিত অভিন্ন ভাবে বুঝিলেও চলিবে না। অতএব সৃষ্টি প্রাণ ও আকাশের সংযোগে উৎপন্ন এবং উহার আদিও নাই, অন্তও নাই; উহার আদি-অন্ত কিছুই থাকিতে পারে না কারণ অনন্ত কাল ধরিয়া সৃষ্টি চলিয়াছে}"।[৬০]

প্রকৃতির সাম্যাবস্থা প্রকৃতপক্ষে গতিহীন অবস্থা কারণ সামঞ্জস্যে সাধারণত কোনও গতি থাকে না। অতএব এই চরাচর বিশ্বে যা কিছু দেখতে বা শুনতে বা অনুভব করতে পারা যায়, তার সবই জড় ও গতির সম্মেলন। একথা ঠিক যে পরমাণু সকল ক্রমশ দ্ব্যণুকাদিতে এবং বিভিন্ন স্থূলভূতে পরিণত হয় কিন্তু সাংখ্যমতে এই পরমাণু জগতের আদি অবস্থা নয়।

বৈশেষিকের পরমাণুবাদ

ভারতীয় দর্শন পরম্পরায় যে পরমাণুবাদের তত্ত্ব উপলব্ধ তা অবশ্যই ন্যায়-বৈশেষিকের হাত ধরে, বলা ভালো বৈশেষিকের কলমে। বৈশেষিকদের মতে পরমাণু হতেই জগতের যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টি। পরমাণুই বস্তুর চরম বা পরম অংশ, যার থেকে আর অণু হতে পারে না। যেমন মৃত্তিকা নির্মিত একটি ঘটের ক্ষেত্রে মৃৎ পিণ্ডটি হল চতুরণুক, সেখান থেকে ত্র্যণুক-দ্ব্যণুক ক্রমে সবশেষে আসে অবিভাজ্য পরমাণু।[৬১] অবয়ব যুক্ত বস্তুর কোথাও একস্থানে পরম্পরার বা ধারার ছেদ স্বীকার করতেই হয় নচেৎ অবিরাম ধারা চলতেই থাকে; তাই অবিভাজ্য পরমাণুর স্বীকার বৈশেষিকগণ কর্তৃক।

তবে সাংখ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে পরমাণু জগতের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থা। স্বামী বিবেকানন্দ সাংখ্যের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করেছেন, "This universe does not come out of atoms: they may be the secondary or the tertiary state. The primordial material may form into atoms and become grosser and bigger things; and as far as modern investigations go, they rather point towards the same conclusion"

পরমাণুবাদের বিরুদ্ধতা

{এই জগৎ পরমাণুপুঞ্জ হইতে উৎপন্ন হয় নাই, উহারা দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থা হইতে পারে। আদি ভূতই পরমাণুরূপে পরিণত হয়, তাহা আবার স্থূলতর পদার্থে পরিণত হয় আর আধুনিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান যতদূর চলিয়াছে তাহা ঐ মতের পোষকতা করিতেছে বলিয়াই বোধ হয়}।[৬২] তিনি 'ইথারে'র দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। বায়ু অবশ্যই পরমাণুসমূহে গঠিত। এবার বায়ুর পরমাণু কোথায় অবস্থান করবে? 'ইথার' যেহেতু সর্বত্রই বিদ্যমান অতএব 'ইথারে' অবস্থান করবে। এখন 'ইথার' যদি পরমাণুসমূহে গঠিত হয়, তাহলে ইথারের পরমাণু কোথায় অবস্থান করবে? তখন সূক্ষ্মতর ইথার স্বীকার করতে হবে। আবার সূক্ষ্মতর ইথারের পরমাণুর অবস্থানের জন্য সূক্ষ্মতম ইথার স্বীকার করতে হবে। এইরূপে কোনও শেষ না পেয়ে অনবস্থা'র সম্মুখীন হতে হবে। তাই পরমাণুবাদ চরম সিদ্ধান্ত হতে পারে না এরূপ তাঁর অভিমত। অবশ্য ভাষাপরিচ্ছেদকার আচার্য বিশ্বনাথও বস্তুর এই অনন্ত অবয়ব-ধারা বিচ্ছেদের উদ্দেশ্যেই পরমাণুতে বিশ্রামের অঙ্গীকার করেন।[৬৩]

জগৎ সৃষ্টি সম্পর্কে বহুশ্রুত ও বহুপ্রচলিত মন্তব্য এই যে, স্রষ্টার ইচ্ছাতেই এই সৃষ্টি। এমনকি ঔপনিষদিক ধ্যান-ধারণাতেও স্রষ্টা ও সৃষ্টিকার্যের মধ্যে 'স্রষ্টার ইচ্ছা'র ভূমিকা (পরে ৫.৪.২ দ্রষ্টব্য) লক্ষণীয়। স্বামী বিবেকানন্দ সৃষ্টিকার্যে এই ইচ্ছার কোনওরূপ ভূমিকা আছে কিনা- তাই নিয়ে প্রশ্ন রেখেছেন, "It is sad that the will of the Lord created the universe. It is very good as a common expression, but we see it cannot be true. How could it be will?" {ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে। সাধারণ দৈনিক ব্যবহার্য বাক্য হিসেবে ইহা অতি সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু ইহার আর অধিক মূল্য নাই। ইচ্ছা কীরূপে সৃষ্টির কারণ হইতে পারে?}[৬৪] তাঁর মতে 'ইচ্ছা' এই বিষয়টি প্রকৃতির তৃতীয় বা চতুর্থ বিকার। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তার পূর্বের বিষয়গুলির সৃষ্টি কোথা থেকে হল? অতএব, ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি এই কথাটি অযৌক্তিক। এমনকি সামান্য মানবদেহের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেও দেখা যাবে 'ইচ্ছা মস্তিষ্ককে বা হৃদয়কে চালিত করছে' এই কথা কতখানি ভুল! ইচ্ছা মস্তিষ্ককে বা হৃদয়কে যদি পরিচালনা করতো, তাহলে মানুষ ইচ্ছামতো মস্তিষ্কের বা হৃদয়ের গতিরোধ করতে পারতো। কিন্তু তা হতে দেখা যায় না। তাই দেহভাণ্ড হোক বা ব্রহ্মাণ্ড, কোনওক্ষেত্রেই তিনি ইচ্ছাকে নিয়ামক বলতে নারাজ- "Our will only covers a little portion of self-consciousness and moves our brain. It is not will, that is working your body or that is working the universe. This body is being moved by a power, of which, will is only a manifestation in one part. Likewise in the universe there is will, but that is only one part of the universe. The whole of the universe is not guided by will; that is why we cannot explain it by the will theory" {কেহ কেহ বলেন উহা (ইচ্ছা) আমাদের মস্তিষ্ককে সঞ্চালিত করে। তাহাই যদি করিত, তবে আপনারা ইচ্ছা করিলেই মস্তিষ্কের কার্য বন্ধ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তো পারেন না। সুতরাং, ইচ্ছা মস্তিষ্ককে সঞ্চালন করিতেছে না। হৃদয়কে গতিশীল করিতেছে কে? ইচ্ছা কখনই নয়; কারণ যদি তাহাই হইত, তবে আপনারা ইচ্ছা করিলেই হৃদয়ের গতিরোধ করিতে পারিতেন। ইচ্ছা আপনাদের দেহকেও পরিচালিত করিতেছে না, ব্রহ্মাণ্ডকেও নিয়মিত করিতেছে না}।[৬৫] তাই তাঁর মতে নিয়ামকের ভূমিকাটি অপর কোনও বস্তুর। 'ইচ্ছা' সেই বস্তুর বিকাশমাত্র। তিনি অপর বস্তুটির ব্যাখ্যা করেননি তবে তিনি সম্ভবত গতি বা শক্তি বা প্রাণ বা চৈতন্যকেই ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন।

সৃষ্টিকার্যে ইচ্ছা – সমস্যা ও সমাধান

৪.৪.৪. প্রস্তাব: ঈশ্বর

সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী। ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে বলে তারা মনে করেননি। এমনকি ইন্দ্রিয়াদি করণগুলির চালনায় নৈয়ায়িক যে আত্মার ইচ্ছা, যত্ন ইত্যাদি ব্যাপার স্বীকার করেন, সাংখ্যেরা আত্মার সেরূপ কর্তৃত্বও স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সাধনের নিমিত্তই জড় ইন্দ্রিয়গুলির প্রবৃত্তি।[৬৬] একথা ঠিক যে, সাংখ্যের সেশ্বর পক্ষ ও নিরীশ্বর পক্ষ নিয়ে বাদ প্রতিবাদের যথেষ্ট জায়গা আছে (পূর্বে ৩.৪.৫ দ্রষ্টব্য), তবে ঈশ্বরকৃষ্ণ বিরচিত *সাংখ্যকারিকা* ও টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র প্রণীত *তত্ত্বকৌমুদীর* অভিপ্রায় অনুধাবন করলে সাংখ্যের নিরীশ্বর পক্ষেই সিদ্ধান্ত দৃঢ় হয়।

স্বামী বিবেকানন্দও সাংখ্যের এই নিরীশ্বরবাদিতার যুক্তি সাংখ্য প্রদর্শিত পথেই হেঁটে গিয়ে ব্যক্ত করেছেন। প্রথমত, জগৎকারণরূপে আত্মা স্বীকার করলে প্রশ্ন উঠবে আত্মা মুক্ত নাকি বদ্ধ? যদি বদ্ধ হয়, তাহলে বদ্ধ বা বশীভূত হয়ে অর্থাৎ

ক্রীতদাসের মত অবস্থান করে বদ্ধ আত্মা কীভাবে সৃষ্টিতে সক্ষম হতে পারে? অপরদিকে মুক্ত আত্মার কোনওরূপ বাসনাই থাকে না; তাহলে তার সৃষ্টিকার্যের প্রয়োজনীয়তাও নেই। দ্বিতীয়ত, প্রকৃতির স্বীকারেই যেখানে সমুদয় সৃষ্টিকার্যের ব্যাখ্যা সম্ভব সেখানে ঈশ্বর বিষয়ে মতবাদ অনাবশ্যক। অতএব, সাংখ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোনও অবকাশ নেই। তবে, পাতঞ্জল-যোগসূত্রের সমাধি পাদের অন্তর্গত *বিরাম-প্রত্যয়াভ্যাসপূর্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ* (সূত্র-১৮) ইত্যাদি সূত্রের ব্যাখ্যায় সাংখ্যের নিরীশ্বরতার যুক্তি স্বীকার করে নিয়ে ঈশ্বর সম্পর্কে 'কপিলের মত' বলে তিনি এক অভিনব মন্তব্য করেছেন- "Kapila teaches that there are many souls, who, though nearly attaining perfection, fall short because they cannot perfectly renounce all powers. Their minds, for a time, merge in nature, to re-emerge as its masters. Such Gods there are" {কপিল বলেন, অনেক আত্মা এরূপ আছেন, যাঁহারা সিদ্ধাবস্থায় প্রায় নিকটবর্তী হয়েছেন, কিন্তু অলৌকিক শক্তি ও বাসনা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে না পারায় সিদ্ধ হইতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের মন কিছুকাল প্রকৃতিতে লীন থাকে; তাঁহারা প্রকৃতির প্রভুরূপে পুনরাবির্ভূত হন। এরূপ ঈশ্বর আছেন বটে}।[৬৭] 'Cosmology' (সাংখ্যীয় ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব) শীর্ষক আলোচনাতেও তিনি কপিলের মত বলে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন- "He (Kapila) admits a peculiar kind of God. He says we are all struggling to get free; and when we become free, we can, as it were, melt away into nature, only to come out at the beginning of the next cycle and be its ruler. We come out omniscient and omnipotent beings. In that sense we can be called Gods: you and I and the humblest beings can be Gods in different cycles" {তিনি (কপিল) এক বিশেষ প্রকার ঈশ্বর স্বীকার করেন। তিনি বলেন, আমরা সকলে মুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছি, এইরূপ চেষ্টা করিতে করিতে যখন মানবাত্মা মুক্ত হন, তখন তিনি যেন কিছুদিনের জন্য প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকিতে পারেন। আগামী কল্পের প্রারম্ভে তিনিই একজন সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান পুরুষরূপে আবির্ভূত হইয়া সেই কল্পের শাসনকর্তা হইতে পারেন। এই অর্থে তাঁহাকে ঈশ্বর বলা যাইতে পারে। এইরূপে আপনি, আমি এবং অতি সামান্য ব্যক্তি পর্যন্ত বিভিন্ন কল্পে ঈশ্বর হইতে পারিব}।[৬৮]

ঈদৃশ-ঈশ্বর স্বীকার: স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত

সমস্যার সূত্রপাত এখান থেকে। শ্রীমদ্ ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত *সাংখ্যকারিকাকে* প্রামাণ্য ধরলে 'প্রকৃতিলীন' জাতীয় কোনও শব্দের প্রয়োগ সেখানে নেই। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হয়, স্বামী বিবেকানন্দের ঐরূপ মন্তব্য দুটির কারণ কী? 'প্রকৃতিলীন' শব্দটি তিনি কোথা থেকে পেলেন? এর উত্তরে অনুমান করা চলে, *সাংখ্যপ্রবচনসূত্রে*র উপর ভিত্তি করেই তিনি 'প্রকৃতিলীন' শব্দটির প্রয়োগ করেছিলেন।[৬৯] বস্তুত, *সাংখ্যপ্রবচনসূত্রের* তৃতীয় অধ্যায়স্থ 'ন কারণলযাত্ কৃতকৃত্যতা মগ্নবদুত্থানাত্' (৩/৫৪), 'অকার্যত্বেঽপি তদ্‌যোগঃ পারবশ্যাত্' (৩/৫৫), 'স হি সর্ববিত্ সর্বকর্তা' (৩/৫৬), 'ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা' (৩/৫৭) ইত্যাদি সূত্রসমূহ[৭০] পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, প্রবচনসূত্রকার একথা মানেন যে কারণলয় প্রাপ্তি অর্থাৎ প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্তি হওয়াই 'কৃতকৃত্যতা' অর্থাৎ কৈবল্য নয়। ঐ বিষয়টি জলমগ্নের ন্যায়। স্নানের জন্য যিনি জলে ডুব দিয়েছেন তিনি যেমন জল থেকে পুনরায় উঠবেন, তেমনই পুরুষার্থের প্রেরণায় 'প্রকৃতিলীন' এর পুনরুত্থান হয়[৭১] এবং প্রবচন-সূত্রকার "ঈদৃশ-ঈশ্বর" স্বীকার করেছেন।

প্রকৃতিলীন

এপ্রসঙ্গে *ঈশোপনিষদের* 'বিদ্যা–অবিদ্যা' বিষয়ক মন্ত্রত্রয় (মন্ত্রসংখ্যা– ৯, ১০ ও ১১) এবং 'সম্ভূতি–অসম্ভূতি' বিষয়ক মন্ত্রত্রয় (মন্ত্রসংখ্যা– ১২, ১৩ ও ১৪) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিদ্যা–অবিদ্যা বিষয়ক মন্ত্রগুলির ভাষ্যে ভাষ্যকার শংকরাচার্য দেখিয়েছেন, দেবতা–উপাসনার দ্বারা দেবতাত্মভাবপ্রাপ্তিরূপ যে অমৃতত্ব লাভ হয় তা আপেক্ষিক অমৃতত্ব। সাংখ্য–যোগের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে 'দেবতা' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের উপাসনা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সাথে চিত্তের তদ্ভাববশত তাতে চিত্তের লয় প্রাপ্তি। জীবের লয় নয়; চিত্তের লয় প্রাপ্তি। স্বাভাবিকভাবেই চিত্তের লয় আপেক্ষিক অমৃতত্ব। আবার, সম্ভূতি–অসম্ভূতি বিষয়ক মন্ত্রগুলির ভাষ্যে ভাষ্যকার দেখিয়েছেন, হিরণ্যগর্ভোপাসনা দ্বারা অনৈশ্বর্যরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করে অর্থাৎ অণিমা–লঘিমাদি বেশ কিছু ঐশ্বর্য লাভ করে প্রকৃতির উপাসনা দ্বারা প্রকৃতিলয়রূপে আপেক্ষিক অমৃতত্ব লাভ হয়।[৭২] এক্ষেত্রেও সাংখ্য–যোগের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে প্রকৃতির অর্থাৎ মূলপ্রকৃতি বা প্রকৃতি–বিকৃতিগুলির কোনও একটির উপাসনা অর্থাৎ অব্যক্ত–মহত্–অহংকার–তন্মাত্র এগুলির কোনও একটির সাথে চিত্তের তদ্ভাববশত সেইটিতে চিত্তের লয় প্রাপ্তি। এক্ষেত্রেও লক্ষণীয় যে, জীবের লয় নয়; চিত্তের লয় প্রাপ্তি। স্বাভাবিকভাবেই তা আপেক্ষিক অমৃতত্ব।

প্রকৃতিলীন - অন্যত্র অন্য অর্থে?

এবার দেখা যাক *পাতঞ্জল যোগসূত্রের* দিকে। সমাধি পাদে সূত্র আছে 'ভবপ্রত্যযো বিদেহপ্রকৃতিলযানাম্'(১/১৯)। বিদেহলয় অর্থাৎ বিদেহে বা সূক্ষ্মতম ইন্দ্রিয়ে চিত্তের লীন থাকা। অপরদিকে, প্রকৃতিলয় অর্থাৎ প্রকৃতিতে (মূলপ্রকৃতি ও প্রকৃতি–বিকৃতি) চিত্তের লীন থাকা। লক্ষ্য করার বিষয়, এই দুটি ক্ষেত্রেই, সাধক প্রকৃতপক্ষে জন্ম–মৃত্যুর চক্র হতে বেরিয়ে আসেননি। তার কৈবল্য হয় না যেহেতু মনোলয় হয় মাত্র। স্বাভাবিকভাবেই সেই চিত্তলয়ের বা মনোলয়ের অবস্থা থেকে সাধকের পুনরায় জাগ্রদবস্থায় ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে।

অবশ্য, ভক্তিযোগে ঈশ্বরবিষয়ক আলোচনায় স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্যে পূর্বোক্ত 'নিজ মন্তব্য' দুটির তাৎপর্য কিছুটা স্পষ্ট হয়। তিনি বলেছেন, "Those who aspire to retain their individual mind even after liberation and to remain distinct will have ample opportunity of realizing their aspirations and enjoying the blessings of the qualified Brahman. These are they who have been spoken of in the Bhāgavata Purāṇa … These are they who are spoken of by the Sāṁkhyas as getting merged in nature in this cycle, so that, after attaining perfection, they may come out in the next as lords of world-systems. But none of these ever becomes equal to God (Ishvara)" {যাঁহারা মুক্তিলাভের পরও নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, ভগবান হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে চান, তাঁহাদের আকাঙ্খা চরিতার্থ করিবার ও সগুণ ব্রহ্মকে সম্ভোগ করিবার যথেষ্ট অবসর থাকিবে। ইঁহাদেরই কথা ভাগবত পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে…। সাংখ্যেরা ইঁহাদিগকেই 'প্রকৃতিলীন' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সিদ্ধি লাভ করিয়া ইঁহারা পরকল্পে কতকগুলি জগতের শাসনকর্তারূপে আবির্ভূত হন। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে কেহই কখন ঈশ্বরতুল্য হইতে পারেন না}।[৭৩] অতএব, তাঁর মতে ভাগবতের 'আত্মারাম' কিংবা সাংখ্যের 'প্রকৃতিলীন' কোনওভাবেই সর্বেশ্বর নন। তাহলে অনুমান করা চলে পাতঞ্জল যোগসূত্রের ব্যাখায় ও সাংখ্যীয় ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বের আলোচনায়, তিনি 'কপিলের মত' বলে যে মন্তব্য দুটি করেছিলেন সেখানে 'প্রকৃতিলীন'কে 'সর্বেশ্বর' বলতে চাননি।

প্রকৃতিলীন - কোনওভাবেই সর্বেশ্বর না

অপরদিকে, সাংখ্যে "ধৃত-শরীর" বলে একটি ধারণার প্রয়োগ আছে[৭৪] যা একপ্রকার 'জীবন্মুক্ত' কেই বোঝায় (পূর্বে ২.৪.১৭ দ্রষ্টব্য)। মধুসূদন সরস্বতীর *গূঢ়ার্থদীপিকায়* 'জীবন্মুক্ত' প্রসঙ্গে উপলব্ধ হয়, "...এবম্ভূতো জীবন্মুক্তো ব্যুত্থানদশায়াং কর্মণি বৈদিকে লৌকিকে বা অভিপ্রবৃত্তোঽপি প্রারব্ধকর্মবশাল্লোকদৃষ্ট্যাভিতঃ সাঙ্গোপাঙ্গানুষ্ঠানায প্রবৃত্তোঽপি স্বদৃষ্ট্যা নৈব কিঞ্চিত্ করোতি সঃ নিষ্ক্রিযাত্মদর্শনেন বাধিতত্বাদিত্যর্থঃ"।[৭৫] আবার বাচস্পতি মিশ্রের *তত্ত্বকৌমুদীতে* 'ধৃত-শরীর' সম্পর্কে দৃষ্ট হয়, "উত্পন্ন-তত্ত্বজ্ঞানোঽপি চ সংস্কারবশাত্ তিষ্ঠতি, যথোপরতেঽপি কুলাল-ব্যাপারে চক্রং বেগাখ্যসংস্কারবশাত্ ভ্রমত্ তিষ্ঠতি। কালপরিপাকবশাত্তূপরতে সংস্কারে নিষ্ক্রিযং ভবতি... প্রক্ষীযমাণাবিদ্যাবিশেষশ্চ সংস্কারস্তদ্বশাত্ তত্সামর্থ্যাত্ ধৃতশরীরস্তিষ্ঠতি"।[৭৬] এমতাবস্থায়, যদি *সাংখ্যপ্রবচনসূত্রের* দিকে দৃষ্টি ফেরানো যায়,[৭৭] তাহলে দেখা যাবে সেখানে 'জীবন্মুক্ত' ও 'ধৃত-শরীর' অভিন্নার্থেই বিদ্যমান।

ধৃত-শরীর ও জীবন্মুক্ত

কিন্তু ভক্তিযোগে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্য অনুধ্যান করলে মনে হয়, সাংখ্যের 'প্রকৃতিলীন' বিষয়টিকে তিনি 'জীবন্মুক্তে'র ধারণার সাথে এক করে দেখতে চেয়েছেন বা বলা ভালো দেখাতে চেয়েছেন। এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হয় জীবন্মুক্ত ও প্রকৃতিলীন একই কি না? *পাতঞ্জল-যোগসূত্রে* সমাধিপাদের 'ভবপ্রত্যযো বিদেহ-প্রকৃতিলযানাম্' (১/১৯) সূত্রের ব্যাসভাষ্যে রয়েছে "প্রকৃতিলযাঃ সাধিকারে চেতসি প্রকৃতিলীনে কৈবল্যপদমিবানুভবন্তি, যাবন্ন পুনরাবর্ততে অধিকারবশাত্ চিত্তমিতি" অর্থাৎ প্রকৃতি ও প্রকৃতি-বিকৃতিগুলি যথা মহত্, অহংকার, পঞ্চতন্মাত্রতে লীনতা প্রাপ্তি। কর্ম-সংস্কার হেতু বা অধিকার হেতু যতদিন না তাদের চিত্ত ফিরে আসে ততদিনই প্রকৃতিলীন অবস্থা। মোটকথা চিত্তের লয়ের কথাই এখানে বুঝতে হবে। অতএব, জীবন্মুক্ত প্রকৃতিলীন নয়। খুব স্পষ্ট করে না হলেও এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হয় না যে, জীবন্মুক্তের বিদেহমুক্তি অনতিবিলম্বেই সম্ভব কিন্তু প্রকৃতিলীনের প্রকৃতি হতে পুনরুত্থানের পর সংসারবাসনায় জড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রবল। তাই, 'প্রকৃতিলীন' শব্দটিতে তিনি যদি 'জীবন্মুক্ত'র ধারণাটিকেই বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে এই সাদৃশ্যে পাঠকের বা শ্রোতার সম্মুখে সহজবোধ্যতাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বলে ধারণা করা চলে।

প্রকৃতিলীন - জীবন্মুক্ত কিনা?

৪.৪.৫. প্রস্তাব: সাংখ্যমত খণ্ডনেই বেদান্তের সোপান

সাংখ্যের বহু-পুরুষ তত্ত্ব খণ্ডন প্রসঙ্গেই, স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠাপূর্বক উৎকৃষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন (পূর্বে দ্রষ্টব্য ৪.৪.২)। এখানে তাঁর মন্তব্যটির পুনরুল্লেখ প্রয়োজন, "So far the analysis is perfect, the psychology incontrovertible. So far there is no objection. But if we ask the Sānkhya the question, 'who created nature?' – the Sānkhya says that the Purusha and the Prakriti are uncreate and omnipresent, and that of this Purusha there is an infinite number. We shall have to controvert these propositions and find a better solution and by so doing we shall come to Advatism" {ইহার (সাংখ্যের) মনোবিজ্ঞান অখণ্ডনীয়, ইহার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি হইতে পারে না। আমরা কপিলকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, প্রকৃতি কে সৃষ্টি করিল? আর তাহার উত্তর পাইলাম- উহা সৃষ্ট নয়। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, পুরুষ অসৃষ্ট ও সর্বব্যাপী, আর এই পুরুষের সংখ্যা অনন্ত। আমাদিগকে সাংখ্যের এই শেষ সিদ্ধান্তটির প্রতিবাদ করিয়া উৎকৃষ্টতর সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে এবং তাহা করিলেই আমরা বেদান্তের অধিকারে আসিয়া উপস্থিত হইব}।[৭৮] বস্তুত স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন বেদান্তের

খুব বড় মাপের একজন প্রচারক। তাঁর দৃষ্টিতে সাংখ্যের সিদ্ধান্তগুলি উৎকৃষ্ট হলেও উৎকৃষ্টতর ছিল না একথা হলফ্ করে বলা চলে, নচেৎ বেদান্তের দোরগড়ায় তিনি উৎকৃষ্টতর সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থিত হতেন না। তাঁর উপলব্ধিতে সাংখ্যের সব প্রস্তাবগুলি নিখুঁত ছিল না কোনওভাবেই; তাই ঐ প্রস্তাবগুলির নিঁখুত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে তিনি সাংখ্যের সিঁড়ি অতিক্রম করে বেদান্তের অট্টালিকায় পদার্পণ করেছেন। একথার প্রমাণ মেলে কাপিল দর্শনের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকারের সময়– "We shall see how the Vedantists grope out of all these difficulties and reach a perfect solution, and yet all the glory really belongs to Sānkhya. It is very easy to give a finising touch to a building when it is constructed" {আমরা দেখিব, বেদান্তবাদীরা কীরূপে এই সকল আপত্তি ও আশঙ্কা কাটাইয়া নিখুঁত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সব গৌরব কপিলেরই প্রাপ্য। সমাপ্তপ্রায় অট্টালিকাকে সমাপ্ত করা অতি সহজ কাজ}।[৭৯]

মূলত সাংখ্যের তিনটি মত খন্ডন করেই বেদান্তের ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ। সেইগুলি যথা–

- আত্মার নিষ্ক্রিয়ত্ব
- ঈশ্বরের অনস্তিত্ব
- পুরুষ-বহুত্ব

সাংখ্যের যুক্তিতে আত্মা বা পুরুষ নির্গুণ, পরিণামরহিত তথা নিষ্ক্রিয়। গুণময়ী প্রকৃতি প্রকৃতপক্ষে পরার্থে প্রবৃত্ত হয় (পূর্বে ২.৪.১৬ দ্রষ্টব্য) ও নিঃস্বার্থভাবে পুরুষের প্রয়োজন সম্পাদন করে। সাংখ্যকারিকাকার স্পষ্টতই 'অগুণ' শব্দটির প্রয়োগ করেছেন পুরুষের জন্য।[৮০] নৃত্যপটীয়সী নর্তকী ও রঙ্গমঞ্চস্থ সভ্যগণের দৃষ্টান্তেও সাংখ্যোক্ত পুরুষ বা আত্মার নিষ্ক্রিয়তার কথা স্পষ্ট হয় (পূর্বে ২.৪.১৬ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু বেদান্ত আত্মার এই নিষ্ক্রিয়তার যুক্তি খন্ডন করেন। বেদান্তের দৃষ্টিতে মুক্ত আত্মা পারমার্থিক সত্তা বা নিরপেক্ষ সত্তা, পারমার্থিক জ্ঞান বা নিরপেক্ষ জ্ঞান তথা পারমার্থিক আনন্দ বা নিরপেক্ষ আনন্দ। অর্থাৎ মুক্ত আত্মা কোনওভাবেই ঐ সত্তা বা জ্ঞান বা আনন্দের বিকৃত প্রকাশ নয়; ঐগুলি আত্মার স্বরূপ। নিত্য নিরপেক্ষ

আত্মার নিষ্ক্রিয়ত্ব - খন্ডন

জ্ঞানের সকলের মধ্যেই প্রকাশ; তফাৎ শুধু সীমাবদ্ধতায়। মানব মস্তিষ্কে জ্ঞানের প্রকাশ অধিক স্পষ্ট অন্যদিকে মানবেতর মস্তিষ্কে জ্ঞানের প্রকাশ তুলনামূলক কম স্পষ্ট। আনন্দ সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। নিরপেক্ষ আনন্দের কোনও পরিসীমা নেই। সীমাবদ্ধতাতেই তার কম-বেশির তারতম্যতা। স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের উৎকৃষ্টতর সিদ্ধান্তের কথা শুনিয়েছেন– "কপিলের মতের বিরুদ্ধে এই প্রথম কথা পাইলাম, তিনি আত্মাকে নির্গুণ, অরূপ, নিষ্ক্রিয় পদার্থ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু বেদান্ত উপদেশ দিতেছেন, উহা সমুদয় সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দের সারস্বরূপ। আমরা যতপ্রকার জ্ঞানের বিষয় জানি, তিনি তাহা হইতে অনন্তগুণে মহত্তর, আমরা মানবীয় প্রেম বা আনন্দের যতদূর পর্যন্ত কল্পনা করতে পারি, তিনি তাহা হইতে অনন্তগুণে অধিক আনন্দময়, আর তিনি অনন্ত সত্তাবান"।[৮১]

এরপরের প্রসঙ্গ ঈশ্বরের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব বিষয়ক। সাংখ্যপ্রণেতারা ঈশ্বর স্বীকার করেন না, এ বিষয়ে যুক্তি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে (পূর্বে দ্রষ্টব্য ৪.৪.৪)। স্বামী বিবেকানন্দ এই স্থলে সাংখ্যের নিজস্ব যুক্তিতেই সাংখ্যের খন্ডনে অগ্রসর হয়েছেন। সাংখ্য ব্যষ্টিশ্রেণীতে বুদ্ধি প্রভৃতি ক্রমে প্রকৃতি হতে ভিন্ন 'পুরুষ'কে স্বীকার করেন কিন্তু সমষ্টি শ্রেণীতে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের একজন 'শাস্তা' আছেন– একথা স্বীকার করেন না। তিনি এস্থলে সাংখ্যের উদ্দেশ্যে প্রতিযুক্তি রেখেছেন, "If

you deny a universal Purusha behind the cosmic series, we deny your Purusha behind the individual series" {যদি আমরা অস্বীকার করি, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের একজন শাস্তা আছেন তাহা হইলে ঐ ক্ষুদ্রতর শ্রেণীর পশ্চাতেও যে একজন আত্মা আছেন– ইহা অস্বীকার করিতে হইবে, কারণ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড একই নির্মাণপ্রণালীর পৌনঃপুনিকতা মাত্র}।[৮২] তিনি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় মাটির দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। একতাল মাটিকে ব্যষ্টি বুঝালে সমগ্র মাটিকে সমষ্টি বুঝতে হবে। সেক্ষত্রে একতাল মাটির বিশ্লেষণ করলেই সমগ্র মাটির স্বরূপ বোঝা যায়। আর একই যুক্তিতে একটি মানবের বিশ্লেষণে প্রকারান্তরে সমগ্র জগতেরই বিশ্লেষণ করা হয়। ফলত, সমগ্র জগতের বিশ্লেষণে তার পশ্চাতে থাকা একটি চৈতন্যকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে স্বীকার করতে হবে। তাঁর ভাষায়, "This universal self which is beyond the universal modifications of Prakriti is what is called Ishwara, the Supreme Ruler, God" {যে সর্বব্যাপী চৈতন্য প্রকৃতির সমুদয় বিকারের পশ্চাতে রহিয়াছে, বেদান্ত তাহাকে সকলের নিয়ন্তা 'ঈশ্বর' বলেন}।[৮৩]

ঈশ্বরের অনস্তিত্ব - খণ্ডন

এরপর আসে সাংখ্যের বহু–পুরুষবাদ। তিনটি যুক্তির অবতারণা করে সাংখ্যে পুরুষের বহুত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে (পূর্বে ২.৪.৯ দ্রষ্টব্য)। খুব সংক্ষেপে বললে প্রথমত, জন্ম, মরণ ও ইন্দ্রিয়গুলির প্রতিটি পুরুষের সাথে পৃথক পৃথক সম্বন্ধ থাকে, দ্বিতীয়ত, যে অন্তঃকরণ যে পুরুষের জন্য নির্মিত সেই অন্তঃকরণের ক্রিয়া সেই পুরুষের জন্যই হয়ে থাকে এবং তৃতীয়ত, ত্রিবিধ গুণের বৈচিত্র্য থেকে জীবগণের বিবিধতা– এই যুক্তিসমূহের বলেই সাংখ্য পুরুষ বহুত্বের পক্ষ অবলম্বন করে। স্বামী বিবেকানন্দ সাংখ্যের পুরুষ বহুত্ব স্বীকার করেননি বরং খণ্ডনের মধ্যে দিয়ে বেদান্ত সম্মত আত্মৈকত্ব প্রতিষ্ঠাপনে তৎপর হয়েছেন। আত্মা সর্বব্যাপী ও অনন্ত একথা উপস্থাপন করে তিনি সাংখ্যের সম্মুখে প্রশ্ন রেখেছেন, যা 'অনন্ত' তা কী করে সংখ্যায় একাধিক হতে পারে? তিনি যুক্তি রেখেছেন দুটি অনন্ত বস্তু থাকলে খুব স্বাভাবিকভাবেই একটি অনন্ত অপরটিকে সীমাবদ্ধ করবে। আর সেইরকম হলে অনন্তের আনন্তর্য থাকবে না। অতএব, অনন্ত একটিই হওয়া সম্ভব।

বহুপুরুষবাদ - খণ্ডন

তিনি গাণিতিকভাবেও আত্মৈকত্ব প্রমাণ করতে প্রয়াস করেছেন। অজ্ঞাত দুটি বস্তু বোঝাতে দুটি চিহ্ন x এবং y ধরা হলে বহির্জগৎকে উপস্থাপন করা চলে x + মন = বহির্জগৎ আর অন্তর্জগৎকে উপস্থাপন করা চলে y + মন = অন্তর্জগৎ। এখন মন অবশ্যই দেশ–কাল–নিমিত্তের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় কারণ মন একটি বস্তুর দেশ ছাড়া ধারণ করতে পারে না, কাল ও নিমিত্ত ছাড়া চিন্তা করতে পারে না। অতএব, দেশ–কাল–নিমিত্ত এই তিনটির দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে সীমাবদ্ধ মন আপাতভাবে x এবং y এই দুটি অজ্ঞাত বস্তুকে বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ এই দুটি ভিন্ন ভিন্ন রূপ দিয়েছে। এখন দেশ–কাল–নিমিত্তের দ্বারা সীমাবদ্ধ মন এর লোপ করলে থাকে কেবল x এবং y এই দুটি অজ্ঞাত বস্তু। আবার, এই দুটি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় যেহেতু গুণরহিত বা বিশেষণরহিত, তাই স্বাভাবিকভাবে দুটিই নিরপেক্ষ। তাহলে নিরপেক্ষতা সিদ্ধ হলে সেখানে আর দ্বৈতভাব থাকে না ফলত একত্বেরই সিদ্ধি হয়।

আত্মৈকত্ব সিদ্ধি

গাণিতিক পরিভাষার পর তিনি দর্শনের ভাষা অবলম্বনে আত্মৈকত্বরূপ বেদান্তের উৎকৃষ্টতর সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনি করেছেন, "The whole universe is one. There is only one self in the universe, only one existence, and that one existence, when it passes through the forms of time, space, and causation, is called

by different names, Buddhi, fine matter, gross matter, all mental and physical forms. Everything in the universe is that one, appearing in various forms" {সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এক অখণ্ড সত্তামাত্র। জগতে কেবল এক আত্মা, এক সত্তা আছে; আর সেই এক সত্তা যখন দেশ-কাল-নিমিত্তের ছাঁচের মধ্যে পড়ে, তখনই তাহাকে বুদ্ধি, অহংকার, জ্ঞান, সূক্ষ্ম-ভূত, স্থূল-ভূত প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয়। সমুদয় ভৌতিক ও মানসিক আকার বা রূপ, যাহা কিছু এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ডে আছে, তাহা সেই এক বস্তু- কেবল বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইতেছে মাত্র}।[৮৪] অখণ্ডসচ্চিদানন্দস্বরূপ সেই 'এক বস্তু'র একরূপতা বোঝাতে স্বামী বিবেকানন্দ *নির্বাণ-ষটকম্* থেকে উদ্ধার করেছেন-

মনোবুদ্ধ্যহংকারচিত্তানি নাহং ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।
ন চ ব্যোম ভূমি র্ন তেজো ন বায়ুশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।।[৮৫]

৫.০. উপসংহার

ফরাসী প্রকৃতিবিদ ও লেখক Georges Louis Leclerc, count de Buffon তাঁর 'Discours sur le style' (Discourse on style) শীর্ষক বক্তৃতায় বলেছিলেন *Le style, cest I'homme měme*[৮৬] যার ইংরাজি ভাষান্তর হয়, *The style is the Man himself* এবং বাংলা অনুবাদ হয় 'শৈলীই ব্যক্তি'। এখন দেখার একথা সবক্ষেত্রেই সত্য কিনা?

দৈনন্দিন জীবন থেকে একটি উদাহরণ দেখা যেতে পারে। এক শ্রেণীকক্ষের সবকটি ছাত্রছাত্রী সারাবছর একই পাঠ্যক্রমের পাঠ ও অভ্যাস করলেও উত্তর পত্রে প্রত্যেকের চিন্তাভাবনার সমান প্রতিফলন হয় না। খাতায় তাদের ভিন্ন ভিন্ন উপস্থাপন শৈলীই (presentation style) তাদেরকে পৃথক করে দেয়। কেউ কৃতকার্য (pass) হয়, আবার কেউ বা অকৃতকার্য (fail) থাকে। কেউ প্রথমের সারিতে স্থান পায় কেউ বা অন্তিম সরণিতে। কিন্তু একটা প্রশ্ন এখানে থেকে যায় যে, উপস্থাপন শৈলীতেই কি ব্যক্তিত্বের সব পরিচয় প্রকাশিত হয়ে যায়? সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাঙ্গণে মহাকবি কালিদাসের উপস্থাপন শৈলীতে রাজা-রাজ্য-রাজবংশের রাজঘরানার ছাপ স্পষ্ট; কিন্তু কে বলতে পারে, সুউচ্চ রাজপ্রাচীর থেকে শতহস্ত দূরে তিনি অবস্থান করতেন না? আবার বাংলা সাহিত্যের আকাশে কবিগুরু রবি ঠাকুরের উপস্থাপন শৈলীতে মানবের নিকট ইহ জগতের অনর্থ-প্রপঞ্চ হতে দূরে যাবার আকুল হাতছানি; অথচ জগৎ-পারের এই মহান দ্রষ্টা জমিদারীর দেখাশোনায় দেনাপাওনার ব্যাপারে অভিনব চিন্তার পরিচয় দিয়েছিলেন।[৮৭] সুতরাং 'শৈলীই ব্যক্তি' একথা অনেকাংশে সত্য হলেও সর্বৈব সত্য নয়।

তবে এমন দৃষ্টান্ত অবশ্যই আছে যেখানে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ছায়ারূপ হয়েছে উপস্থাপন শৈলী। অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের হুবহু প্রতিফলন ঘটেছে শৈলীতে। 'শৈলীই ব্যক্তি' একথা বলতে বাধ সাধলেও তখন 'ব্যক্তিই শৈলী' বলতে বিশেষ বাধা হয় না। অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষের কথায়, "এমন লোকও মাঝে মাঝে দেখা যায়, যাঁদের রচনাগত ব্যক্তিত্ব এবং দৈনন্দিন জীবনের ব্যক্তিত্বে কোনো পার্থক্য নেই। অন্তরে ও বাহিরে যে বিদ্যুৎ ও বৈচিত্র্য তাঁরা জীবনে প্রকাশ করেন, তাঁদের রচনায়ও তার অবিকল ছায়াপাত। বাস্তব ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বে তখন কোনো পার্থক্য থাকে না। *The style is the Man* কথাটিকে ঘুরিয়ে বলা চলে *The Man is the style* (ব্যক্তিই শৈলী)। বাংলাসাহিত্যে বিবেকানন্দ সেই শ্রেণীর লেখক"।[৮৮]

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন পূর্ণতা ও পবিত্রতার উপাসক। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ব্যক্তিত্বের এই পূর্ণতা ও পবিত্রতা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর শৈলীতে। আলোচনা দর্শনের হোক বা বিজ্ঞানের বা সাহিত্যের, তিনি গেয়ে গেছেন পূর্ণতা ও পবিত্রতারই জয়গান। সেকারণেই মানব–অভ্যুদয়ের পথে *struggle for existence* অথবা *survival of the fittest* –এই জাতীয় তত্ত্ব তিনি মেনে নিতে চাননি বরং পূর্ণতাকে 'পাখির চোখ' করে জীবের পূর্ণতার অনুসন্ধান করে গেছেন, "In my opinion, struggle and competition sometimes stand in the way of a being's attaining its perfection. If the evolution of an animal is effected by the destruction of a thousand others, then one must confess that this evolution is doing very little good to the world. Taking it for granted that it conduces to physical well-being, we cannot help admitting that it is a serious obstacle to spiritual development. According to the philosophers of our country, every being is a perfect Soul..."{আমার বিবেচনায় struggle (লড়াই) এবং competition (প্রতিদ্বন্দ্বিতা) জীবের পূর্ণতালাভের পক্ষে অনেকসময় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। হাজার জীবনকে ধ্বংস করে যদি একটা জীবের ক্রমোন্নতি হয়, – যা পাশ্চাত্যদর্শন সমর্থন করে, তা হলে বলতে হয় এই evolution (ক্রমবিকাশ) দ্বারা সংসারের বিশেষ কোনো উন্নতিই হচ্ছে না। সাংসারিক উন্নতির কথা স্বীকার করে নিলেও আধ্যাত্মিক বিকাশকল্পে ওটা যে বিষম প্রতিবন্ধক, একথা স্বীকার করতেই হয়। আমাদের দেশীয় দার্শনিকগণের অভিপ্রায় জীবমাত্রই পূর্ণ আত্মা }।[৮৯]

তিনি এই পূর্ণতা ও পবিত্রতাকেই সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পবিত্র ভারতীয় দর্শনের পত্র–পল্লব–পুষ্পের সমূহ থেকে পূর্ণ 'বেদান্ত–পারিজাত'কে চয়ন করেছিলেন। কিন্তু একথা তিনি কখনই বিস্মৃত হননি যে, বেদান্তের ক্ষুদ্র চারাগাছ যে উর্বর মৃত্তিকায় প্রোথিত, সেই মৃত্তিকা সাংখ্যের হাতেই প্রস্তুত হয়েছিল। সেইকারণেই, বেদান্ত আলোচনার প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি সাংখ্যপ্রণেতা মহর্ষি কপিলকে স্মরণ করেছেন। আর এরূপ স্মরণকালে আবারও তাঁর ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা ও পবিত্রতা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর বক্তব্যে– "As says our great philosopher Kapila, if purity has not been the nature of the soul, it can never attain purity afterwards, for anything that was not perfect by nature, even if it attained to perfection, that perfection would go away again. Therefore, say all our philosophers, good is our nature, perfection is our nature, not imperfection, not impurity — and we should remember that". [আমাদের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কপিল বলিয়াছেন, যদি পবিত্রতা আত্মার স্বরূপ না হয় তবে আত্মা কখনই পরে পবিত্রতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে না কারণ যাহা স্বভাবতঃই পূর্ণ নহে তাহা কোনোরূপ পূর্ণতা লাভ করিলেও ঐ পূর্ণতা আবার চলিয়া যাইবে। ...এজন্য আমাদের সকল দার্শনিক বলেন পবিত্রতাই আমাদের স্বভাব, অপবিত্রতা নয়। পূর্ণত্বই আমাদের স্বভাব, অপূর্ণতা নয়]।[৯০]

উল্লেখপঞ্জি

---

[১] সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, *বিবেকানন্দ চরিত*, পৃ. ৪

[২] *তদেব*, পৃ. ৫

[৩] তত্রৈব

[৪] *তদেব*, পৃ. ৬

[৫] *তদেব*, পৃ. ১৫

[৬] *তদেব*, পৃ. ৫১

[৭] *তদেব*, পৃ. ৩৫

[৮] *তদেব*, পৃ. ৯০

[৯] *তদেব*, পৃ. ১৫৯

[১০] অন্নপূর্ণা দেবী, *স্বামী বিবেকানন্দ*, পৃ. ৯৮

[১১] সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১১

[১২] *তদেব*, পৃ. ২১২

[১৩] *তদেব*, পৃ. ৩৪১–৩৪২

[১৪] *তদেব*, পৃ. ৩৫১

[১৫] *The Complete Works of Swami Vivekananda* (150th Birth Anniversary Ed.), Vol. I, Preface, p.vii

[১৬] শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, "পুনর্ বিষয়ে পুনর্বিবেচনা", *আলিবাবার গুপ্তভাণ্ডার* (প্রবন্ধ সংকলন), পৃ. ২৩৪–২৩৫

[১৭] *তদেব*, পৃ. ২৩৫

[১৮] R. C. Majumdar, *Swami Vivekananda*: *A historical review*, p.85

[১৯] তত্রৈব

[২০] প্রণবরঞ্জন ঘোষ, *বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য* , পৃ. ২৫

[২১] It is no longer possible to have direct evidence of his oratical gifts as no living man of high authority ever heard him speak, but we may judge its quality by contemporary references. (R. C. Majumder, *Op.cit.*, p.82)

[২২] R. C. Majumder, *Op.cit.*, p.83

[২৩] দেবদ্যুতি বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পত্রসাহিত্য: সেকাল একাল চিরকাল', *প্রবন্ধ সঞ্চয়ন,* (সম্পা. সত্যবতী গিরি), পৃ. ১৭৬০–১৭৬১

[২৪] দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, *সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু*, পৃ. ১১৬

[২৫] *তদেব*, পৃ. ১১৭

[২৬] অধীর দে ,*বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা* ,পৃ. ১১

[২৭] চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও বিবেকানন্দের বিশিষ্টতা লক্ষণীয়। তিনি ধর্মরাজ্যের মানুষ হলেও তাঁর সমাজচেতনা এবং ইতিহাসবোধ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। সমাজতান্ত্রিক ভাবনা যত স্পষ্ট করে তাঁর লেখায় প্রকাশিত হয়েছে ততটা সেকালে আর কারও প্রবন্ধে ঘটেনি। (ক্ষেত্র গুপ্ত, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ.১৬৬*)

[২৮] *The Complete Works of Swami Vivekananda* (150th Birth Anniversary Ed.), Vol.2 (*A Study of the Sānkhya Philosophy*), p.435

[২৯] Philo of Alexandria, a Hellenized Jew also called Judaeus Philo, is a figure that spans two cultures, the Greek and the Hebrew. When Hebrew mythical thought met Greek philosophical thought in the first century B.C.E. it was only natural that someone would try to develop speculative and philosophical justification for Judaism in terms of Greek philosophy. Thus Philo produced a synthesis of both traditions developing concepts for future Hellenistic interpretation of messianic Hebrew thought, especially by Clement of Alexandria, Christian Apologists like Athenagoras, Theophilus, Justin Martyr, Tertullian, and by Origen. [Internet Encyclopedia of Philosophy (https://www.iep.utm.edu/philo/)]

[৩০] Gnosticism (after *gnôsis*, the Greek word for "knowledge" or "insight") is the name given to a loosely organized religious and philosophical movement that flourished in the first and second centuries CE. The exact origin(s) of this school of thought cannot be traced, although it is possible to locate influences or sources as far back as the second and first centuries BCE, such as the early treatises of the *Corpus Hermeticum*, the Jewish Apocalyptic writings, and especially Platonic philosophy and the Hebrew Scriptures themselves. [Internet Encyclopedia of Philosophy (https://www.iep.utm.edu/gnostic/)]

[৩১] Pythagoras came to India and studied this philosophy and that was the beginning of the philosophy of the Greeks. Later it formed the Alexandrian School and still later the Gnostic. It became divided into two, one part went to Europe and Alexandria and the other remained in India {*The Complete Works of Swami Vivekananda* (150th Birth Anniversary Ed.), Vol.2 (*A Study of the Sānkhya Philosophy*), p. 435}

[৩২] ব্রিটিশ ভাষাবিদ William Jones এবং জার্মান দার্শনিক Shroeder গ্রীক দর্শনের উপর সাংখ্যদর্শনের প্রভাব স্বীকার করেছেন বলে অনুমান কিন্তু Bertrand Russel এর মতো ব্যক্তিত্ব এজাতীয় প্রভাবের কথা উল্লেখ পর্যন্ত করেননি। তাই উক্ত তথ্যের যথার্থতা প্রশ্নের অপেক্ষা রাখে।

[৩৩] *The Complete Works of Swami Vivekananda* (150th Birth Anniversary Ed.), Vol. 2 (*A Study of the Sānkhya Philosophy*), p. 435

[৩৪] *Ibid*, Vol. 2 (*Sānkhya and Vedānta*), p. 443

[৩৫] In every man there are these three forces. Sometimes, Tamas prevails. We became lazy, we cannot move, we are inactive, bound down by certain ideas or by mere dullness. At other times activity prevails and at still other times that calm balancing of both. [*Ibid*, Vol.1 (Karma-yoga, Ch.2), p.37]

[৩৬] In different men, one of these forces is generally predominant. The characteristics of one man is inactivity, dullness and laziness; that of another, activity, power, manifestation of energy; and in still another we find the sweetness, calmness and gentleness… [Loc.cit]

[৩৭] We all use the word nature. The old Sānkhya philosophers called it by two different names, prakriti, which is very much the same as the word nature, and the more scientific name, Avyakta, undifferentiated, from which everything proceeds…[*Ibid.*, Vol.2 (*Sānkhya and Vedānta*), p. 423]

[৩৮] প্রকাশক্রিযাস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিযাত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্ (*যোগসূত্র*, সাধন পাদ, ২/১৮)

[৩৯] *The Complete Works of Swami Vivekananda* (150th Birth Anniversary Ed.), Vol. 1 (*Rāja-Yoga:Patanjali's Yoga Aphorisms*), p. 245

[৪০] *Ibid.*, Vol. 2 (*A Study of the Sānkhya Philosophy*), p.434

[৪১] Neuroscientists, like all scientists, are quantitatively driven. If you can't measure it, it doesn't exist. Since you can't measure mind, you can't quantify mind- so by definition, it's not physical. (https://goop.com/wellness/spirituality/does-the-mind-exist)

[৪২] *The Complete Works of Swami Vivekananda* (150th Birth Anniversary Ed.), Vol.2 (*A Study of the Sānkhya Philosophy*), p.434

[৪৩] By believing in the teaching that the mind is not separate from the brain, you will be saved from much fighting and struggling. [Loc.cit.]

[৪৪] *Ibid.*, Vol.2 (*Cosmology*), p. 430

[৪৫] *Ibid.*, Vol.2 (*Cosmology*), p. 431

[৪৬] *Ibid.*, Vol.2 (*Cosmology*), p. 427

[৪৭] Loc.cit

[৪৮] *Ibid.*, Vol.2 (*Cosmology*), p. 426

[৪৯] Loc.cit.

[৫০] *Ibid.*, Vol.2 (*Cosmology*), p. 425

[৫১] *Ibid.*, Vol.1 (*The Vedānta Philosophy*), p. 351

[৬২] এই দৃষ্টান্ত টি স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা 'বাণী ও রচনা'র ৩য় খণ্ডে (পৃ. ২৫) থাকলেও ইংরাজি *The Complete Works of Swami Vivekananda* (150th Birth Anniversary Ed.), Vol. 1 (p. 441) তে উপলব্ধ নয়।

[৬৩] *The Complete Works of Swami Vivekananda* (150th Birth Anniversary Ed.), Vol.2 (*A Study of the Sānkhya Philosophy*), p. 441

[৬৪] *Ibid.*, Vol. 1 (*Karma Yoga: The Secret of Work*), p. 57

[৬৫] *Ibid.*, Vol.2 (*A Study of the Sānkhya Philosophy*), p. 441

[৬৬] *বৃহদারণ্যক–উপনিষদ্*, ২/৪/৫

[৬৭] *The Complete Works of Swami Vivekananda* (150th Birth Anniversary Ed.), Vol.2 (*A Study of the Sānkhya Philosophy*), p. 442

[৬৮] *Ibid.*, Vol.2 (*Cosmology*), p. 425

[৬৯] *Ibid.*, Vol. 2 (*Sānkhya and Vedānta*), p. 444

[৬০] *Ibid.*, Vol.2 (*Cosmology*), p. 426

[৬১] অমিত ভট্টাচার্য, *ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা*, পৃ.১২০

[৬২] *The Complete Works of Swami Vivekananda* (150th Birth Anniversary Ed.), Vol.2 (*A Study of the Sānkhya Philosophy*), p. 432

[৬৩] "অবযবধারাযা অনন্তত্বে মেরুসর্ষপযোরপি সাম্যপ্রসঙ্গঃ। অতঃ ক্বচিদ্ বিশ্রামো বাচ্যঃ"। [আশুতোষ ভট্টাচার্য (সম্পা.), *ভাষাপরিচ্ছেদ*, কারিকা–৩৭, বিশ্বনাথকৃত–সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, পৃ. ১০৫]

[৬৪] *The Complete Works of Swami Vivekananda* (150th Birth Anniversary Ed.), Vol.2 (*A Study of the Sānkhya Philosophy*), p. 440

[৬৫] Loc.cit

[৬৬] স্বাং স্বাং প্রতিপদ্যন্তে পরস্পরাকূত–হেতুকাং বৃত্তিং/পুরুষার্থ এব হেতু র্ন কেনচিত্ কার্যতে করণম্ (*সাংখ্যকারিকা*, ৩১)

[৬৭] *The Complete Works of Swami Vivekananda* (150th Birth Anniversary Ed.), Vol. 1 (*Rāja-Yoga: Patanjali's Yoga Aphorisms*), pp. 211-212

[৬৮] *Ibid.*, Vol.2 (*Cosmology*), p. 429

[৬৯] সাংখ্যপ্রবচনসূত্রের প্রামাণ্য নিয়ে প্রশ্ন আছে, তথাপি অনেক প্রাবন্ধিকই ক্ষেত্রবিশেষে ও প্রয়োজনস্থলে সাংখ্যপ্রবচনসূত্রের উদ্ধার করেছেন। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনাতেও সাংখ্যপ্রবচনসূত্রের উল্লেখ উপলব্ধ হয়।

[৭০] Jibananda Vidyasagar (Ed), *Sankhyadarshana or Aphorisms of Atheistic Philosophy*, p.67-68

[৭১] এরূপ শ্রুতির উল্লেখ পাওয়া যায়– পূর্ণং শতসহস্রং তু তিষ্ঠন্ত্যব্যক্তচিন্তকাঃ/নির্গুণং পুরুষং প্রাপ্য কালসংখ্যা ন বিদ্যতে। (Jibananda Vidyasagar (Ed), *Ibid.*, p.68)

[৭২] *ঈশোপনিষদ্*, মন্ত্র–১৪, শাংকরভাষ্য

[৭৩] *The Complete Works of Swami Vivekananda* (150th Birth Anniversary Ed.), Vol.3 (*Bhakti-yoga*), p.42

[৭৪] সম্যগ্‌জ্ঞানাধিগমাত্‌ ধর্মাদীনামকারণপ্রাপ্তৌ/তিষ্ঠতি সংস্কারবশাত্‌ চক্রভ্রমিবদ্‌ধৃতশরীরঃ (*সাংখ্যকারিকা*, ৬৭)

[৭৫] *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা*, ৪/২০, গূঢ়ার্থদীপিকা টীকা (জীবন্মুক্ত পুরুষ ব্যুত্থান দশায় প্রারব্ধকর্মবশে লোকদৃষ্টি অনুসারে বৈদিক ও লৌকিক কর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হলেও তার নিজ দৃষ্টিতে তিনি নিষ্ক্রিয়।)

[৭৬] *সাংখ্যকারিকা* ৬৭, *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* টীকা

[৭৭] *সাংখ্যপ্রবচনসূত্র*, 'জীবন্মুক্তশ্চ' (৩/৭৮), 'উপদেশ্যোপদেষ্টৃত্বাত্‌ তত্সিদ্ধিঃ (৩/৭৯), শ্রুতিশ্চ (৩/৮০), ইতরথান্ধপরম্পরা (৩/৮১), চক্রভ্রমণবত্‌ ধৃতশরীরঃ (৩/৮২)

[৭৮] *The Complete Works of Swami Vivekananda* (150th Birth Anniversary Ed.), Vol.2 (*A Study of the Sānkhya Philosophy*), p. 442

[৭৯] Loc.cit

[৮০] ...গুণবত্যগুণস্য সত স্তস্যার্থমপার্থকং চরতি (*সাংখ্যকারিকা* ৬০)

[৮১] বাণী ও রচনা, ৩য় খন্ড, পৃ. ৩৩ [এই অংশটি ইংরাজি *The Complete Works of Swami Vivekananda* (150th Birth Anniversary Ed.), Vol. 2 (*Sānkhya and Vedānta*) তে উপলব্ধ নয়]

[৮২] *The Complete Works of Swami Vivekananda* (150th Birth Anniversary Ed.), Vol. 2 (*Sānkhya and Vedānta*), p. 448

[৮৩] Loc.cit

[৮৪] *Ibid.*, Vol. 2 (*Sānkhya and Vedānta*), p. 450

[৮৫] শংকরাচার্য, *নির্বাণ-ষটকম্‌*, ১/৬

[৮৬] https://www.britannica.com/biography/Georges-Louis-Leclerc-comte-de-Buffon [...He was elected to the French Academy, where on August 25, 1753, he delivered his celebrated *Discours sur le style* (Discourse on Style), containing the line, *Le style, cest I'homme mĕme* (*The style is the Man himself*)]

[৮৭] প্রণবরঞ্জন ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩৭

[৮৮] *তদেব*, পৃ. ৫৩৭-৫৩৮

[৮৯] *The Complete Works of Swami Vivekananda* (150th Birth Anniversary Ed.), Vol. 7 (*Conversations and Dialogues*), p. 146

[৯০] *Ibid.*, Vol. 3 (*The Common Bases of Hinduism*), p. 390-391

ж ж ж ж ж

পঞ্চম অধ্যায়

তোমার তরুতে নবীন উল্লাসে ফুটিছে নিয়ত কুসুমদাম
রবে চিরলেখা সাহিত্য কাননে অমর অক্ষরে তোমার নাম

–যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, *কুরুক্ষেত্রে দশদিন*, উৎসর্গপত্র

রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান-চিন্তনে সাংখ্যপ্রসঙ্গ

প্রিয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রিয় তুমি তোমাকে আহ্বান করি, নিধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিধি তুমি তোমাকে আহ্বান করি। তোমাকে দীর্ঘজীবনে আহ্বান করি, দেশের কল্যাণে আহ্বান করি, বন্ধুজনের হৃদয়াসনে আহ্বান করি।

প্রিযাণাং ত্বা প্রিযপতিং হবামহে।
নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে।।

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দরকে লেখা শেষ চিঠি

৫.০. ভূমিকা

বিজ্ঞান ও দর্শন– দুটিই মানুষের চিন্তার ফসল। বিজ্ঞানে অবশ্যই পরীক্ষা–নিরীক্ষার জায়গা আছে তবে প্রাথমিক আরোহণে ‘চিন্তা’ই সিঁড়ির জোগান দেয়। এর সাথে যদি সাহিত্যের কথা আসে, তাহলে প্রাথমিকভাবে পাঠক বলবেন সে তো কল্পনা। একেবারে ভুল নয়; আবার সম্পূর্ণ ঠিকও নয়। অলীক হোক বা বাস্তব, কল্পনার স্রোতে উজান আসে চিন্তা থেকেই। একথা অস্বীকার করা চলে না যে বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যের পুষ্প একই বৃন্ত থেকে প্রস্ফুটিত না হলেও চিন্তার সুতোয় একসাথে গ্রথিত হয়ে মালারূপে শোভা পেতে পারে। প্রয়োজন শুধু একজন যোগ্য ‘মালাকারে’র। সেই মালাকারের ভূমিকা যিনি যথাযোগ্যরূপে পালন করেছিলেন তিনি হলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও সাহিত্যিক সত্তার সংমিশ্রণ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। যার ফলস্বরূপ অনেক অব্যক্ত বিষয় সাহিত্যের রসে সিক্ত হয়ে, বিজ্ঞানের তিক্ততা অতিক্রম করে, দর্শনের মুক্ত পরিসরে ব্যক্ত হয়েছিল।

৫.১. ব্যক্তিজীবন ও কর্মজীবন

‘ত্রিবেদী’ এই উপাধি থেকে স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে এরকম উপাধি বাঙালির হয় কী করে? আশঙ্কা অমূলক নয় অবশ্য। তাই রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জন্ম–পরিচয় জানার পূর্বে তাঁর পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে কিঞ্চিৎ অবগত হতে হয়। মধ্যপ্রদেশে বুন্দেলখণ্ডের দক্ষিণাংশে বাস ছিল ‘জিঝোতিয়া’ ব্রাহ্মণ বংশের। পরবর্তীকালে, ‘ফতেসিং রাজবংশ’কে আশ্রয় করে ‘জিঝোতিয়া’ ব্রাহ্মণের পরিবার অবিভক্ত বাংলার মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার ‘টেঁয়া’ গ্রামে এসে উপস্থিত হন। মনোহররাম ত্রিবেদী ছিলেন অবিভক্ত বাংলার ‘ত্রিবেদী’ বংশের আদিপুরুষ। পরবর্তীকালে ‘টেঁয়া’ গ্রাম ছেড়ে ‘জেমোকান্দি’ বা ‘জেমো’তে এসে বসবাস করতে শুরু করেন ত্রিবেদীরা। এই হিসেবে ‘জেমোকান্দি’ই রামেন্দ্রসুন্দরের জন্মভূমি। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পূর্বপুরুষদের পরিচয় একটি ছকে দেওয়া যেতে পারে[১]–

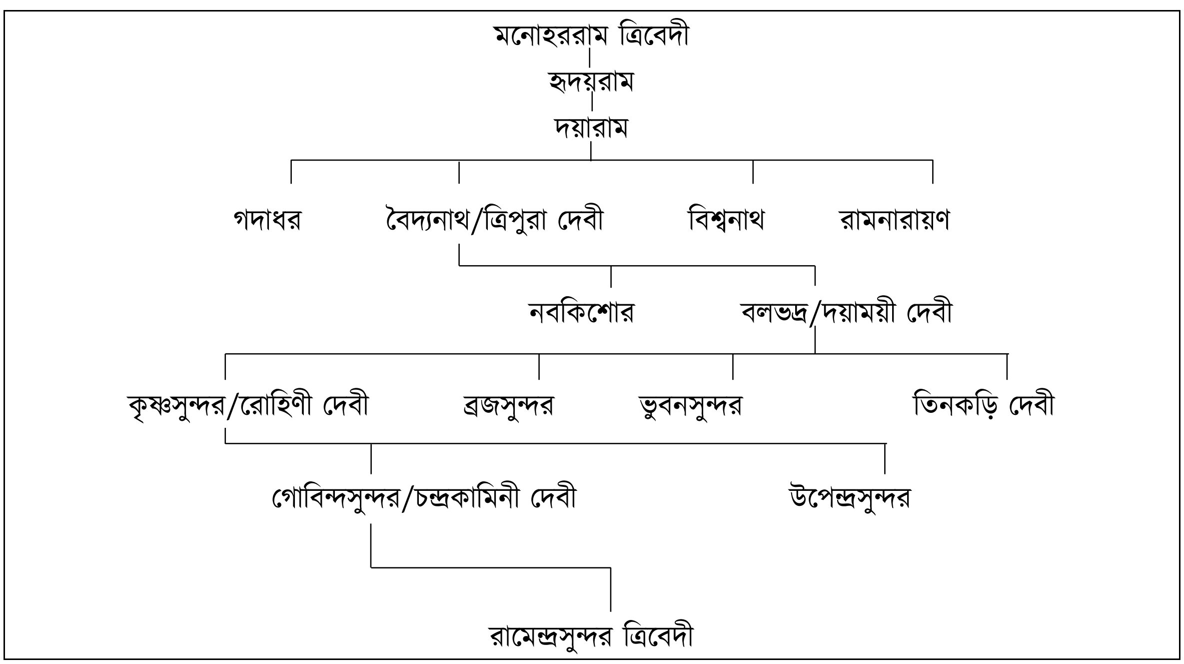

১৮৬৪ সালের ২০শে অগাস্ট, জেমোকান্দিতে গোবিন্দসুন্দর ও চন্দ্রকামিনী দেবীর কোল আলো করে আবির্ভূত হন রামেন্দ্রসুন্দর। তাঁর পিতা ছিলেন একজন যথার্থ সাহিত্য অনুরাগী ও স্বদেশপ্রেমিক। গণিত, বিজ্ঞান ও জ্যোতিষে গোবিন্দসুন্দরের প্রগাঢ় অনুরাগ পরবর্তীকালে রামেন্দ্রসুন্দরে সিঞ্চিত হয়। অন্যদিকে চন্দ্রকামিনী দেবী ছিলেন ভক্তি ও প্রীতির মূর্ত প্রতিমূর্তি।

স্নিগ্ধ ও শান্ত প্রকৃতির বালক ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। তবে অনেক অসুখ-বিসুখের শিকার হন বাল্যকাল থেকেই। নিজ পিতামহ কৃষ্ণসুন্দরকে কাছে না পেলেও পিতামহতুল্য ব্রজসুন্দরের সাথে ছিল তাঁর আত্মিক টান। জীবনীকার আশুতোষ বাজপেয়ী সুমিষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন, "দুঃখের বিষয় বিধাতা পুরুষ কোন মানবকেই সকল সুখ-সম্পদ সৌভাগ্যের অধিকারী করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। রামেন্দ্রসুন্দর বাল্যকাল হইতে দৈহিক সুখে বঞ্চিত ছিলেন। ক্ষীণাঙ্গ শিশু নিত্য নতুন রোগ ভোগ করিয়া শৈশব উত্তীর্ণ করিল। অত্যধিক স্নেহাদর লাভ করিয়া বালক পিতামহের প্রতি অতিমাত্র আসক্ত হইয়া পড়িল, পিতামহের কণ্ঠলগ্ন হইয়া তাঁহার প্রশস্ত পৃষ্ঠোপরি দিবসের অনেক সময় কাটাইয়া দিত। ব্রজসুন্দরের বিশাল দেহে ক্ষীণাঙ্গ ক্ষুদ্র বালককে ঝুলিতে দেখিয়া অনেকে উপহাসচ্ছলে বলিত *বাদুড় ঝুলিছে যেন তেঁতুলের গাছে*"।[২]

১৮৭০ সালে ছয় বছর বয়সে পাঠশালায় বিদ্যাচর্চার শুরু হয়। অসাধারণ ধী-শক্তির অধিকারী রামেন্দ্রসুন্দর অত্যন্ত সাফল্যের সাথে প্রাথমিক শিক্ষার পর্ব সমাপ্ত করেন এবং ১৮৭৬ সালে কান্দি ইংরাজি স্কুলে ভর্তি হন। বিদ্যাচর্চায় তাঁর উচ্চ মাত্রার অনুরাগ ছিল। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে অন্যান্য জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠেও তার অভিরুচি ছিল দেখবার মতো। বিদ্যালয়ে পড়ার সময়েই ১৪ বছর বয়সে ইন্দুপ্রভা দেবীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের দুই পুত্র ও দুই কন্যা সন্তান জন্মলাভ করে। পুত্রদ্বয় জন্মের পর বেশিদিন ইহলোকে থাকেনি। তবে কন্যাদ্বয় চঞ্চলা ও গিরিজা রামেন্দ্রসুন্দরের অত্যন্ত আদরের ছিল।

বিদ্যাচর্চায় যার একান্ত অনুরাগ, তিনি কি আর বিদ্যাদেবীর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত থাকতে পারেন? কখনও পারেন না। বিদ্যালয় পর্ব শেষ করে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করে রামেন্দ্রসুন্দর এবার প্রবেশ করলেন প্রেসিডেন্সির গণ্ডিতে। ১৮৮১ সালের দিকে শুরু হল কলেজ জীবন। উচ্চতর বিদ্যার জগতে প্রবেশের একেবারে প্রথম পদক্ষেপ শুরু করলেন কলেজ জীবনে পাঠ্যবিষয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে। জ্ঞানচর্চার একেবারে সাগরে ডুব দিয়েছিলেন তিনি এইসময়। পরীক্ষায় 'প্রথম স্থান' তার বোধ হয় জন্মগত অধিকার এর পর্যায়ে পড়তো। স্কুলের পরীক্ষায় তিনি বরাবরই প্রথম স্থান অধিকার করতেন। এদিকে কলেজে এসেও ১৮৮৬ সালে বি.এ. পরীক্ষায় ও ১৮৮৭ সালে এম.এ. পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান দখল করেন। তাঁর রসায়ন বিজ্ঞানের অধ্যাপক পেডলার সাহেব রসায়ন বিজ্ঞানে দক্ষতার কারণে রামেন্দ্রসুন্দরকে 'প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি' পরীক্ষায় বসার নির্দেশ দেন। উল্লেখযোগ্যভাবে ১৮৮৮ সালে রামেন্দ্রসুন্দর ঐ বৃত্তিও সম্মানের সহিত লাভ করেন। পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি এই সময়ে তিনি প্রেসিডেন্সির ল্যাবরেটরিতে জীববিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

তিনি কর্মজীবন শুরু করেছিলেন ১৮৯০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার একজন পরীক্ষক রূপে। দীর্ঘ দুই বছর তিনি এই কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করেন। এদিকে অন্যত্র কাজের প্রস্তাব আসলেও, বঙ্গদেশের প্রতি ও বাংলা ভাষার প্রতি অন্তরের টান হেতু তিনি কিছুতেই অগ্রসর হন না। অবশেষে ১৮৯২ সালে রিপন কলেজে (অধুনা সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। অল্পদিনের মধ্যেই অধ্যাপকরূপে

তিনি সুখ্যাতি অর্জন করেন। জ্ঞানীর মধ্যে যখন প্রকৃত অর্থেই জ্ঞানের অহংকার বিন্দুমাত্রও থাকে না; তখনই তিনি সবার সাথে সমান ভাবে মিশে যেতে পারেন। রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন যথার্থ জ্ঞানী পুরুষ। তাই ১৯০৩ সালে যখন তিনি রিপন কলেজের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হলেন, তখন অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকের মধ্যে কোনও দেওয়াল তৈরি করলেন না বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সপেক্টরকে বিনীত প্রত্যয়ে জানিয়েছিলেন, "আমি এতগুলি লোক ছাড়িয়া একা একঘরে কেমন করিয়া থাকিব? আমার ইচ্ছা সবাই একসঙ্গে বসি, আলাপ করি। তাই আমার নিজের জন্য কোন পৃথক্ কামরার আবশ্যক আছে বলিয়া মনে করি না"।[৩] ১৯১৯ সাল অবধি দীর্ঘ ষোলো বছর তিনি রিপন কলেজের অধ্যক্ষের পদে বহাল থাকেন এবং এই সময়ে প্রভূত উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন করেন। তাঁর সুযোগ্য পরিচালনায় রিপন কলেজ অপরিণত অবস্থা থেকে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

তাঁর কর্মজীবনের দুটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রসার ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাণ প্রতিষ্ঠা। আর এই দুই কার্যের মধ্যে দিয়ে তিনি বাংলা ভাষার সকল স্তরের অনুরাগীদের জন্য মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির জয়গান গেয়ে গেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে তিনি এই সারস্বত-ভবনটির একটি 'রূপরেখা' সবার সামনে তুলে ধরেছিলেন- "সেই মন্দিরের এক পার্শ্বে একটি পুস্তকালয় থাকিবে, সেখানে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত, মুদ্রিত, অমুদ্রিত, প্রকাশিত, অপ্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থ সংগৃহীত হইবে। বঙ্গের নানাস্থান হইতে সংগৃহীত হাতে-লেখা প্রাচীন পুঁথি সেইখানে স্তূপাকৃতি হইবে। সহস্র বৎসরের ধারাবাহিক চেষ্টার ফলে বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে কিছু ফসল জন্মিয়াছে, তাহা আমরা এক স্থানে সংগৃহীত ও সংকল্পিত দেখিতে পাইব। গ্রীক ও রোমান হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক মার্কিন ও জাপানি পর্যন্ত যে কোন বৈদেশিক আগন্তুক বাঙ্গালীর সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাও সেই স্থানে দেখিতে পাওয়া যাইবে। ...মন্দিরের অন্যস্থানে আমরা বঙ্গের সাহিত্যিকগণের স্মৃতিচিহ্ন দেখিতে পাইব। ...আর এক স্থানে বাঙ্গালার পুরাতত্ত্বের উপাদান সংগৃহীত হইবে। বাঙ্গালার যেখানে যে তাম্রশাসন বাহির হয়, যেখানে যে মুদ্রা পাওয়া যায়, তাহা সেই স্থানে সজ্জিত হইবে। ...আর এক স্থানে বাঙ্গালার কর্মবীরদের স্মৃতিচিহ্নের সংগ্রহ থাকিবে। বাঙ্গালার বিখ্যাত জমিদারবংশের ইতিবৃত্ত আমরা সেখানে জানিতে পারিব। বাঙ্গালার ফুল-ফল, লতা-পাতা, গাছ-পালা, জীব-জন্তু, শিল্পসম্ভারের নমুনা দেখিয়া আমরা বঙ্গভূমিকে চিনিয়া লইব। ...এই মন্দিরকেই আমি মাতৃমন্দির নাম দিতে পারি ও মন্দির মধ্যে সংগৃহীত দ্রব্যসম্ভারকে আমি মাতৃপ্রতিমা নাম দিতে পারি"।[৪] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বোধ করি তাঁর স্বপ্নের 'প্রজেক্ট' ছিল; নইলে হৃদয়ের অন্তঃস্থলকে ছুঁয়ে যাওয়া এমন পরিকল্পনা কীভাবে তাঁর মুখ হতে নিঃসৃত হতে পারে! বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতি তাঁর এই অকৃপণ অনুরাগকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য উপমায় ভূষিত করেছেন, "পাখির সঙ্গে পাখার সম্বন্ধ যেমন, যেমন সম্বন্ধ রথের সঙ্গে রথীর, সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের সম্বন্ধও ঠিক তেমনি"।[৫]

জীবনের সায়াহ্নে উপস্থিত হয়ে এই অক্লান্ত কর্মবীরকে বহুবিধ ব্যাধি ও পীড়ার সম্মুখীন হতে হয়। মৃত্যুর পূর্বে প্রায় পাঁচ-ছয় বছর জুড়ে চলে এই দীর্ঘ ভোগান্তি। অনেকবার বায়ু পরিবর্তন, চিকিৎসা পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটালেও অবস্থার উন্নতি হয়নি। জীবনব্যাপী কর্মযজ্ঞ চালিয়ে গেলেও বেলাশেষের জীর্ণশরীরে আর কাজ করতে না পারার আক্ষেপ ব্যক্ত হত তাঁর মুখ দিয়ে। ১৯১৯ সালের ৬ই জুন বাগ্‌দেবীর নিষ্ঠাবান মশাল-বাহকের জীবন-মশালের আগুন চিরকালের মতো নিভে যায়। মহাকালের যাত্রাপথে আরও অনেক সাহিত্যকীর্তি ও তাদের স্রষ্টারা এসেছেন বা আসবেন; তবে মাতৃভাষার ও মাতৃভূমির এমন একনিষ্ঠ সাধক জগতে বড়ই দুর্লভ। যে অনুরাগে কোনও ছদ্ম-তোষামোদ নেই, যে প্রয়াসে কোনও লোভ-

লোলুপতা নেই, যে ঘোষণায় কোনও ক্ষুদ্র-আমিত্ব নেই, সেই সমূহের নেতা ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই বলেছিলেন "প্রিযাণাং ত্বা প্রিযপতিং হবামহে/নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে"। অর্থাৎ "প্রিয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রিয় তুমি তোমাকে আহ্বান করি, নিধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিধি তুমি তোমাকে আহ্বান করি। তোমাকে দীর্ঘজীবনে আহ্বান করি, দেশের কল্যাণে আহ্বান করি, বন্ধুজনের হৃদয়াসনে আহ্বান করি"।[৬]

৫.২. রচনাসম্ভার

যদি বলা হয় বাংলা সাহিত্যে 'প্রবন্ধ' দিয়ে ইমারত তৈরি করতে তাহলে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, কারণ প্রাবন্ধিকগণের কলম থেকে প্রবন্ধের অবিরাম-ধারা বয়ে গেছে। কিন্তু যদি বলা হয় কোনও একজন প্রাবন্ধিকের প্রবন্ধ দিয়ে ইমারত তৈরি করতে! তাহলেও চিন্তার কিছু নেই। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে অনুসরণ করলেই হয়। তিনি এমন একজন সাহিত্য সাধক যিনি তাঁর দীর্ঘ সাহিত্য সাধনায় বাংলা ভাষায় একনিষ্ঠভাবে প্রবন্ধের চর্চা করে গেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত ছয় খণ্ডের রামেন্দ্র রচনাবলীতে প্রবন্ধের সংখ্যা আনুমানিক ২১০এর উপরে। এই পরিমাণ বহুবিধ বিষয়ের বহুমুখী আলোচনা কেবলমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। বোধ হয় সেইজন্যই শয্যাগ্রস্ত রামেন্দ্রসুন্দরের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত বিপিনবিহারী গুপ্ত বেদনার্ত চিত্তে আন্তরিক অনুযোগ করেছিলেন, "ভারতবর্ষে প্রবন্ধের উপর প্রবন্ধ সাজিয়ে আপনি যে জিনিস গড়ে তুল্‌চেন, তা এই সমস্তে ভারতবর্ষে আর কেউ শেষ করতে পারবে না; সে জিনিস অসমাপ্ত রেখে সরে পড়া চলবে না"।[৭] শয্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে অনুযোগ করা একেবারেই অসমীচীন, তবে ঐরকম বহুমুখী সমন্বয় সত্যই রামেন্দ্রসুন্দর ব্যতীত অন্য কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁর মধ্যে দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটেছিল। অপূর্বকৃষ্ণ মহাশয় লিখেছেন, "ত্রিবেদী মহাশয় একজন সাহিত্যিক হইয়াও অপূর্ব প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ছিলেন। তাঁহার রচিত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পুস্তকগুলি এমনি সরস ও সুখপাঠ্য যে আজ সেগুলি বাঙালির ঘরে ঘরে অমৃতরস বিতরণ করিতেছে। এই অদ্ভুত প্রতিভার অধিকারী রামেন্দ্রসুন্দরকে তাই বলা হইয়াছে- দর্শনের গঙ্গা, বিজ্ঞানের সরস্বতী ও সাহিত্যের যমুনা"।[৮]

সেই সুবিস্তৃত সাহিত্য-কৃতির উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা চলে এখন-

প্রবন্ধ সংকলন/ পুস্তিকা/ অনুদিত-গ্রন্থ	প্রবন্ধের সংখ্যা	প্রবন্ধের নাম
প্রকৃতি	১৪টি (২য় সংস্করণ, ১৯০৯)	১. সৌরজগতের উৎপত্তি, ২. আকাশ-তরঙ্গ, ৩. পৃথিবীর বয়স, ৪. জ্ঞানের সীমানা, ৫. প্রাকৃত সৃষ্টি, ৬. প্রকৃতির মূর্তি, ৭. ক্লিফোর্ডের কীট, ৮. প্রাচীন জ্যোতিষ, ৯. মৃত্যু, ১০. প্রাচীন জ্যোতিষ-দ্বিতীয় প্রস্তাব, ১১. আর্য্যজাতি, ১২. আলোকতত্ত্ব, ১৩. পরমাণু, ১৪. প্রলয়
জিজ্ঞাসা	২২টি (২য় সংস্করণ, ১৯১৪)	১. সুখ না দুঃখ?, ২. সত্য, ৩. জগতের অস্তিত্ব, ৪. সৌন্দর্য্য তত্ত্ব, ৫. সৃষ্টি, ৬. অতিপ্রাকৃত - প্রথম প্রস্তাব, ৭. অতিপ্রাকৃত - দ্বিতীয় প্রস্তাব, ৮. আত্মার অবিনাশিতা, ৯. কে বড়?, ১০. মাধ্যাকর্ষণ, ১১. এক না দুই?, ১২. অমঙ্গলের উৎপত্তি, ১৩. বর্ণ তত্ত্ব, ১৪. প্রতীত্যসমুৎপাদ, ১৫. পঞ্চভূত, ১৬. উত্তাপের অপচয়, ১৭. ফলিত জ্যোতিষ ১৮. নিয়মের রাজত্ব, ১৯. সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, ২০. মুক্তি, ২১. মায়া পুরী, ২২. বিজ্ঞানে পুতুলপূজা

কর্ম-কথা	১১টি (১ম প্রকাশ, ১৯১৩)	১. মুক্তির পথ, ২. বৈরাগ্য, ৩. জীবন ও ধর্ম, ৪. স্বার্থ ও পরার্থ, ৫. ধর্মপ্রবৃত্তি, ৬. আচার, ৭. ধর্মের প্রমাণ, ৮. ধর্মের অনুষ্ঠান, ৯. প্রকৃতি পূজা, ১০. ধর্মের জয়, ১১. যজ্ঞ
চরিত-কথা	৯টি (১ম প্রকাশ, ১৯১৩)	১. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৩. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ৪. হর্মান্ হেলম্‌হোলৎজ্, ৫. অধ্যাপক মক্ষমূলর, ৬. উমেশচন্দ্র বটব্যাল, ৭. রজনীকান্ত গুপ্ত - ১, ৮. রজনীকান্ত গুপ্ত - ২, ৯. বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিচিত্র প্রসঙ্গ-প্রথম পর্যায়	৬টি প্রসঙ্গ (১ম প্রকাশ, ১৯১৪)	শিরোনামহীন ৬টি প্রসঙ্গ। [শয্যাগ্রস্ত অবস্থায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কর্তৃক উক্ত ও শয্যাপার্শ্বে স্থিত বিপিনবিহারী গুপ্ত কর্তৃক সংকলিত]
বিচিত্র প্রসঙ্গ-দ্বিতীয় পর্যায়	৩টি প্রসঙ্গ (১ম প্রকাশ, ১৯২৭)	১. জীব বিজ্ঞান, ২. হিব্রু, ৩. ইহুদি ও গ্রীক
শব্দ-কথা	১০টি (১ম প্রকাশ, ১৯১৭)	১. ধ্বনি-বিচার, ২. কারক-প্রকরণ, ৩. না, ৪. বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত, ৫. বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ৬. বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, ৭. শরীর-বিজ্ঞান পরিভাষা, ৮. বৈদ্যক পরিভাষা, ৯. রাসায়নিক পরিভাষা, ১০. বাঙ্গালার প্রথম রসায়ন গ্রন্থ
বিচিত্র জগৎ	৯টি (১ম প্রকাশ, ১৯২০)	১. বিজ্ঞান বিদ্যায় বাহ্য জগৎ, ২. ব্যবহারিক ও প্রাতিভাষিক জগৎ, ৩. বাঙ্ময় জগৎ, ৪. জড় জগৎ, ৫. বৈজ্ঞানিকের আকাশ, ৬. প্রাণময় জগৎ, ৭. প্রাণের কাহিনী, ৮. প্রজ্ঞার জয়, ৯. চঞ্চল জগৎ
যজ্ঞ-কথা	৫টি (১ম প্রকাশ, ১৯২০)	১. যজ্ঞ - অগ্ন্যাধান ও অগ্নিহোত্র, ২. ইষ্টিযাগ ও পশুযাগ, ৩. সোমযাগ, ৪. খ্রীষ্ট যাগ, ৫. পুরুষ-যজ্ঞ
নানা-কথা	১২টি (১ম প্রকাশ, ১৯২০)	১. আনি বেসান্ট, ২. ইংরাজী শিক্ষার পরিণাম, ৩. সাহিত্য-কথা, ৪. বর্ণাশ্রম-ধর্ম, ৫. পরাধীনতা, ৬. শিক্ষাপ্রণালী, ৭. রাষ্ট্র ও নেশন্, ৮. সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার, ৯. অরণ্যে রোদন, ১০. মহাকাব্যের লক্ষণ, ১১. আমিষ ভোজন, ১২. মাতৃমন্দির, ১৩. ব্রাহ্মণ কি পৃষ্ট?
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	বঙ্গানুবাদ	আটটি পঞ্চিকা সমন্বিত। ১ম প্রকাশ, ১৯১২
পুণ্ডরীককুলকীর্তি পঞ্জিকা	ইতিবৃত্ত (বঙ্গানুবাদ)	পুণ্ডরীক বংশের ইতিবৃত্ত - মূল সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ। ১ম প্রকাশ-১৯০০
বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা	পুস্তিকা	চলিত গদ্যরীতিতে লিখিত। ১ম প্রকাশ, ১৯০৬
বিদ্যালয়-পাঠ্য রচনাবলী	৯টি	১. ধূলি, ২. আমরা কি খাই?, ৩. মেরুপ্রদেশ, ৪. নিউটনের কীর্তি, ৫. ভূমিকম্প, ৬. গাছের আহার, ৭. উনবিংশ শতাব্দী, ৮. জ্যোতিষের কথা, ৯. চাঁদের কথা
ভূমিকা/মুখবন্ধ রচনা	১২টি	১২টি পুস্তকের ভূমিকা বা মুখবন্ধ অংশ রচনা করেন।
প্রাথমিক রচনা	৫টি	প্রবন্ধ রচনার হাতে-খড়ি অবস্থায় রচিত পাঁচটি প্রবন্ধ। ১. মহাশক্তি ২. বিবর্তন ৩. মহাতরঙ্গ ৪. জড় জগতের বিকাশ ৫. বৈদেশিক সভ্যতা

জগৎ-কথা	৭২টি (১ম প্রকাশ, ১৯২৬)	১. জড় জগৎ, ২. জড় কাহাকে বলে?, ৩. জড়ের তিন অবস্থা, ৪. কঠিন পদার্থ, ৫. আয়তন ও আকৃতি, ৬. পরিমাণ সমস্যা, ৭. স্থিতিস্থাপকতা, ৮. তরল পদার্থ, ৯. তরল পদার্থের চাপ, ১০. প্রাকৃতিক নিয়ম, ১১. অবেক্ষণ ও পরীক্ষণ, ১২. অনিল, ১৩. অনিলের চাপ, ১৪. ভার, ১৫. প্রাকৃতিক নিয়ম, ১৬. বল, ১৭. মাধ্যাকর্ষণ, ১৮. মাধ্যাকর্ষণের জগদ্ব্যাপিতা, ১৯. মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম, ২০. ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, ২১. মিশ্র পদার্থ, ২২. দ্রবণ, ২৩. অর্ক, ২৪. শ্রেণীবিভাগ, ২৫. মূল ও যৌগিক পদার্থ, ২৬. ধাতুভস্ম, ২৭. দহনক্রিয়া, ২৮. জড়ের নিত্যতা, ২৯. কয়লাপোড়া অনিল, ৩০. মূল পদার্থ, ৩১. ধাতু ও অপধাতু, ৩২. পৃথিবী, ৩৩. রাসায়নিক সম্মিলন, ৩৪. পরমাণুবাদ, ৩৫. প্রত্যক্ষ, অনুমান ও কল্পনা, ৩৬. প্রাচীন ও আধুনিক পরমাণুবাদ, ৩৭. পরমাণু ও অণু, ৩৮. ক্ষার, অম্ল ও লবণ, ৩৯. দহনক্রিয়া, ৪০. উত্তাপ, ৪১. উষ্ণতা, ৪২. ঘর্মমান, ৪৩. তাপমান, ৪৪. তাপের ধর্ম, ৪৫. বাষ্প, ৪৬. বাষ্প ও অনিল, ৪৭. জলের অবস্থাবিকার, ৪৮. তাপের পরিচালন, ৪৯. তাপের স্বরূপ, ৫০. শক্তি ও তাপ, ৫১. শক্তির রূপভেদ ও অবিনাশিতা, ৫২. সমানতা ও তুল্যতা, ৫৩. জড়ের গঠনপ্রণালী, ৫৪. কম্প গতি, ৫৫. উপায় কী?, ৫৬. জোয়ার-ভাঁটা, ৫৭. তরঙ্গ, ৫৮. শব্দতরঙ্গ, ৫৯. শব্দজ্ঞান, ৬০. বাদ্যযন্ত্র, ৬১. প্রত্যক্ষ, না অনুমান, ৬২. আলোক, ৬৩. আলোকের স্বরূপ, ৬৪. আকাশ, ৬৫. অদৃশ্য আলোক, ৬৬. জড় পদার্থের গঠন প্রণালী, ৬৭. গণা ও মাপা, ৬৮. তড়িৎ, ৬৯. তড়িৎপ্রবাহ, ৭০. চুম্বক, ৭১. তড়িৎপ্রবাহের চুম্বকত্ব, ৭২. তড়িৎপ্রবাহের চৌম্বক ধর্ম
(বিবিধ) প্রবন্ধ	৩৮টি অমুদ্রিত প্রবন্ধের একত্র সন্নিবেশ মাত্র	১. নিকলা তেসলা, ২. ফটোগ্রাফি, ৩. বৈজ্ঞানিক সংবাদ ১, ৪. বৈজ্ঞানিক সংবাদ ২, ৫. গৌরীমঙ্গল, ৬. কাশীরাম দাসের বংশপরিচয় ও কালনির্ণয়, ৭. অলঙ্কারশাস্ত্র, ৮. একখানি প্রাচীন দলিল, ৯. ভৌগোলিক পরিভাষা, ১০. রাঙ্গামাটি বা কর্ণসুবর্ণ, ১১. আর একখানি প্রাচীন দলিল, ১২. কাশীরাম দাস, ১৩. অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, ১৪. অধ্যাপক বসুর নবাবিষ্কার, ১৫. জড় ও চৈতন্য, ১৬. হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৭. গণেশপূজা, ১৮. গণেশপ্রসঙ্গ, ১৯. রঘুবংশ ও পদ্মপুরাণ, ২০. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, ২১. আজকালকার পাব্লিক উদ্যোগগুলির সঙ্গে প্রাকৃত সাধারণের যোগরক্ষার উপায় কি?, ২২. প্রশ্ন, ২৩. ভারতবর্ষের ইতিহাস, ২৪. স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়, ২৫. গ্রামদেবতা, ২৬. ব্যাধি ও প্রতিকার, ২৭. বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন, ২৮. রমেশ ভবন, ২৯. লোকশিক্ষা, ৩০. যন্ত্রবদ্ধ শিক্ষাপ্রণালী, ৩১. অভিনন্দন, ৩২. চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মেলনে নিবেদন, ৩৩. অভিভাষণ, ৩৪. বাঙ্গালায় কর্তৃক, ৩৫. আমাদের দেশের শিক্ষার আদর্শ, ৩৬. স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী, ৩৭. অম্ল-মধুর, ৩৮. বেদ কথা

৫.৩. প্রবন্ধসাহিত্য ও রামেন্দ্রসুন্দর

প্রবন্ধের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, সংজ্ঞা ও ধারাবাহিক বিকাশ পূর্বেই সবিস্তারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে (পূর্বে ৩.৩ দ্রষ্টব্য)। তবে একটি কথা সবিশেষ বলা যেতে পারে, প্রবন্ধের মাধ্যমেই ঘটনার বহুমুখী ও মনোজ্ঞ পরিস্ফুরণ সর্বতোভাবে সম্পন্ন হয়। আরও কথা এই যে, পাঠকের সাথে অন্তরঙ্গতার কারণেই প্রবন্ধে প্রাবন্ধিকের ভাব ও ভঙ্গিমা স্বচ্ছন্দভাবে প্রকাশ পায়; তাতে বিষয়টি যতই জ্ঞানগর্ভ হোক না কেন। মোটামুটিভাবে আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে চারটি পর্বে ভাগ করা যায়– রামমোহন পর্ব, অক্ষয়-ঈশ্বর পর্ব, বঙ্কিম পর্ব ও রবীন্দ্র পর্ব। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই হিসেবে একজন রবীন্দ্র পর্বের প্রাবন্ধিক। রবীন্দ্র পর্বের প্রবন্ধগুলিতে একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, বিষয়নির্ভরতা থেকে ভাবনির্ভরতাতে উত্তরণ। প্রবন্ধ রচনার কৌশল, বাচনভঙ্গি, বিষয়বস্তুর উপস্থাপনার আঙ্গিক প্রভৃতি এই পর্বের প্রবন্ধগুলিতে প্রাধান্য পেয়েছিল।

একেবারে প্রাথমিক স্তরে, প্রবন্ধকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে– বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধ ও ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। ব্যক্তিগত প্রবন্ধে আত্মগত দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যক্তিহৃদয়েরই প্রাধান্য। অপরদিকে বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধে বিষয়বস্তুর প্রাধান্যই মুখ্য। এবং এই বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধগুলিকে আবার আপাতভাবে চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে– বিবৃতিমূলক (যেমন ঐতিহাসিক বা সাময়িক ঘটনাশ্রিত), বর্ণনামূলক (যেমন রাষ্ট্র, সমাজ বা বিজ্ঞানাশ্রিত), তত্ত্বমূলক (যেমন ধর্ম, দর্শনাশ্রিত) ও ব্যাখ্যামূলক (যেমন শিক্ষা, সাহিত্যাশ্রিত)। রামেন্দ্রসুন্দরের মৌলিক প্রবন্ধের সংখ্যা আনুমানিক দু'শো'র বেশি। এরূপ বললে বোধ হয় অতিরঞ্জন হয় না, রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধরাশি এতই ব্যাপক ও বিস্তৃত যে তা এই বিভাগের অনেক উর্দ্ধে।

বিজ্ঞানের নীরস ও জটিল বিষয়ে কি সরস ও সরল আলোচনা সম্ভব? রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধগুলি পাঠ করলে মনে হবে অবশ্যই সম্ভব। তাঁর প্রবন্ধগুলি গভীর মননশীলতায় পূর্ণ কিন্তু কৌতূক ও প্রসাদময়তা থেকে বঞ্চিত নয়। তথ্যের প্রাচুর্যের মাঝেও সেগুলি উপস্থাপনের গুণে আড়ষ্ট হয়নি। অধীরকুমার দে মনে করেন অক্ষয়কুমার দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পূর্বে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার উপক্রম করলেও প্রকৃত অর্থে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা রামেন্দ্রসুন্দরের হাতেই সম্পন্ন হয়েছে– "রামেন্দ্রসুন্দরের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ লেখকগণ কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রবন্ধ রামেন্দ্রসুন্দরের ন্যায় তত্ত্ব-গভীর ও ব্যাখ্যা-নিপুণ হয় নাই। বিদ্যালয়ের ছাত্র পাঠোপযোগিতার উদ্দেশ্যে বা সাময়িক পত্রিকার প্রবন্ধগত বিষয়-বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রেরণায় তাঁহারা প্রধানতঃ বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যের সুষ্ঠু বিচার-বিশ্লেষণে বা বিজ্ঞানের বিষয়গত বৈচিত্র্যসাধনে রামেন্দ্রসুন্দরের ন্যায় তাঁহাদের গভীর সাধনা ও বৈজ্ঞানিক অনুশীলন ছিল না"।[৯]

অত্যুক্তি বলা চলে কি? সম্ভবত না। দর্শনের উত্তরাধিকার তিনি অত্যন্ত আনন্দের সাথে স্বীকার করেছিলেন এবং আধুনিক পৃথিবীকে সেই উত্তরাধিকারের মূল্য বোঝাতে সেখানেই নোঙর ফেলতে চেয়েছিলেন। এপ্রসঙ্গে Santanu Chacraverti যথার্থই বলেছেন– "He had gladly accepted the Orientalist verdict of the uniqueness and excellence of the vedic-vedantic-sanskritic spiritual legacy and now sought his moorings therein, striving at the same time to adapt this legacy to the challenges of modern world."[১০] বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ হোক বা যুক্তি, তার অবতারণায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর সরস ও সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ রচনাশৈলীর কারণেই নীরস ও জটিল বৈজ্ঞানিক বিষয় সর্বসাধারণের নিকট উপভোগ্য ও উপাদেয় হয়েছে। তিনি ছিলেন যথার্থ অর্থেই 'Pathbreaking Populariser of Science in Bengal'।

৫.৪. রামেন্দ্র-চিন্তনে সাংখ্যের উপাদান

রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। বহু বিষয়ে তাঁর দক্ষতার কারণে, একটি বিষয়ের আলোচনায় তিনি অনায়াসেই বিষয়ান্তরের উপস্থাপনা করতে পারতেন। এরই ফলস্বরূপ তাঁর লেখনী হতে জন্ম নিয়েছে 'প্রকৃতির মূর্তি', 'সৃষ্টি', 'জগতের অস্তিত্ব', 'পঞ্চভূত' ইত্যাদি প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধগুলিতে ব্যাখ্যাত হয়েছে সাংখ্যদর্শনের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ।

রামেন্দ্রসুন্দরের রচনায় অদ্ভুতভাবে দার্শনিকের গুণগত বিশ্লেষণ (Qualitative analysis) ও বৈজ্ঞানিকের মাত্রাগত বিশ্লেষণের (Quantitative analysis) যোগ্য উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তিনি নিজে যেহেতু একাধারে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন তাই মনে করতেন, দার্শনিক তার গুণগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে ধারণা বা কল্পনার আশ্রয়ে যে তথ্যগুলি পরিবেশন করেন, বৈজ্ঞানিক তাতে কখনই বিবাদে প্রবৃত্ত হন না। নিজের বিচারের উৎকর্ষে পৌঁছাতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক মাত্রাগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রত্যয়ে পৌঁছান। তবে কখনও কখনও চর্মচক্ষু মুদ্রিত করে মানসচক্ষু উন্মোচিত করতে হয় বইকি। তাই তাঁর বিশ্লেষণে, তিনি দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে কখনও বিরোধের প্রয়োজন মনে করেননি– "দর্শন ও বিজ্ঞানের বিরোধ নাই, কিন্তু দর্শন যে চোখে দেখেন, যে পথে চলেন, বিজ্ঞান সে চোখে দেখেন না, সে পথে চলেন না'।[১১] একইভাবে বিজ্ঞানের সাথে দর্শনের সমন্বয় সাধনের মরিয়া চেষ্টা তিনি কোনওভাবেই চাননি। এরূপ সমন্বয় সাধনের চেষ্টা তাঁর কাছে ছিল অনভিপ্রেত– "যাঁহারা আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত প্রাচীন বিজ্ঞানের এইরূপে সমন্বয় করিতে যান, তাঁহারা একটা ভুল করেন। বিজ্ঞান বিদ্যাটাই পরিবর্তনশীল, উন্নতিশীল বলিতে চাও ক্ষতি নাই। উহার সিদ্ধান্তগুলি ক্রমশঃ পরিবর্তিত ও পরিণত হইতেছে। বিজ্ঞান কোন দিন একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না; আজ যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছে, কাল সে সিদ্ধান্ত বদলাইয়া লইবে"।[১২]

৫.৪.১. প্রসঙ্গ: প্রকৃতি

সাংখ্যের মূল তত্ত্বদ্বয়ের মধ্যে 'প্রকৃতি'র সম্পর্কে আলোচনার অবতারণা করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী শুরুতেই পাঠকদের প্রতি 'বিধিসম্মত সতর্কীকরণ' দিয়েছেন, "সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির অর্থ লইয়া যথেষ্ট বাগ্‌বিতণ্ডা তুলিয়া একটি সুবৃহৎ ও সুপুষ্ট প্রবন্ধ লেখা চলিতে পারে। সেরূপ বিতণ্ডাক্ষেত্রে প্রবেশ না করিয়া, ব্যক্ত প্রকৃতি অর্থে মোটের উপর সকলে যাহা বুঝেন, তাহাই ধরিয়া লইব"।[১৩]

প্রবন্ধকার আলোচনার প্রারম্ভেই একথা স্বীকার করে নিয়েছেন, ব্যক্ত প্রকৃতির আলোচনাই এখানে কাঙ্ক্ষিত। অব্যক্ত প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি অগ্রসর হতে নারাজ। বিতণ্ডাক্ষেত্রে তিনি প্রবেশে অনিচ্ছুক। অবশ্য প্রথমে ব্যক্ত প্রকৃতির আলোচনা করে তিনি সাংখ্যসম্মত পথেই অগ্রসর হয়েছেন বলে বোধ হয়। সাংখ্যকারিকাকারের মতে 'বিজ্ঞানে'র (বিবেক জ্ঞান) ক্রমটি *ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞ-বিজ্ঞানাত্*। তত্ত্বকৌমুদীকার ব্যাখ্যা করেছেন *ব্যক্তজ্ঞানপূর্বকম্ অব্যক্তস্য তত্কারণস্য জ্ঞানং, তযোশ্চ পারার্থ্যেন আত্মা পরো জ্ঞাযতে ইতি জ্ঞানক্রমেণ অভিধানম্* অর্থাৎ প্রথমে ব্যক্তের জ্ঞান হওয়ার পর তার কারণরূপে অব্যক্তের অনুমান হয়। ব্যক্তের ও অব্যক্তের জ্ঞান হওয়ার পর সবশেষে 'জ্ঞ' বা 'পুরুষে'র অনুমান হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে 'ব্যক্ত প্রকৃতির' আলোচনা শুরু করে প্রবন্ধকার শাস্ত্র নির্দেশিত পথেই অগ্রসর হয়েছেন।

এই অবসরে ব্যক্ত ও অব্যক্ত প্রকৃতি সম্পর্কে দু-চার কথা বলে নেওয়া যেতে পারে। অব্যক্ত অর্থাৎ মূল প্রকৃতি- সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা। অতএব অব্যক্ত হল অপ্রকাশিত অবস্থা। এই অবস্থা থেকে ত্রিগুণের অবস্থার বৈষম্য হলে মহদাদি পঞ্চভূত পর্যন্ত যে প্রকাশিত অবস্থা তাই ব্যক্ত প্রকৃতি। *বৈয়াসিক-মহাভারতে* বলা হয়েছে, মূল প্রকৃতিকে অব্যক্ত বলা হয় তার কারণ জন্ম-বৃদ্ধি-জরা-মৃত্যু এই চারটি লক্ষণ সেখানে নেই। সুতরাং, জন্ম-বৃদ্ধি-জরা-মৃত্যু এই লক্ষণচতুষ্টয়ের বিদ্যমানতা 'ব্যক্তে'র পরিচয় অন্যদিকে অবিদ্যমানতা 'অব্যক্তে'র পরিচয়।[১৪]

এবার প্রবন্ধকারের আলোচনায় দৃষ্টি ফেরান যাক। ব্যক্ত কথার অর্থ প্রকাশিত। অতএব যে ব্যক্তির নিকট জগৎ যেভাবে প্রতীয়মান হয় সেইটিই সেই ব্যক্তির নিকট ব্যক্ত প্রকৃতি। কিন্তু জগতের রূপটি কেমন? জগৎ রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দময়। তবে ভেবে দেখলে বোঝা যাবে রূপ-রসাদি এইগুলি প্রত্যক্ষ জগতের অনুভবের বিষয়। অথচ প্রত্যক্ষ জগতের বাইরেও অনুভবের বিষয় রয়েছে যা ব্যক্তির প্রতীয়মান হয় না। তাই বলে প্রত্যক্ষের অগোচর ঐ বাইরের অংশটিকে বাদ দেওয়া চলে না। প্রবন্ধকার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় উদাহরণ দিয়েছেন, "নেপচুন গ্রহ কখন আমার প্রত্যক্ষের মধ্যে আসে নাই;

ব্যক্ত প্রকৃতির স্বরূপ

তাহার রূপরসগন্ধ কখন আমার ভোগে আসে নাই। শীঘ্র যে আসিবে তাহারও সম্ভাবনা দেখি না। কিন্তু আমার প্রত্যক্ষ নহে বলিয়া তাহাকে আমার জগতের বাহির বলিতে পারি না। কেন না, অন্যে দূরবীন লাগাইয়া উহা দেখিয়াছেন"।[১৫] সুতরাং সারকথা এই যে, জগতের প্রত্যক্ষ অংশটুকু রূপ-রসাদির অনুভবের বিষয় কিন্তু প্রত্যক্ষের বাইরের অংশটি, যা কিনা অতীত, ভবিষ্যৎ, দর্শনাতীত বা সূক্ষ্ম; সেইটি স্মৃতি বা অনুমান বা যুক্তি বা বিশ্বাসের দ্বারা অনুভূত হতে পারে। প্রাবন্ধিক কিঞ্চিৎ কাব্য করে বলেছেন, "সমস্ত ব্যক্ত প্রকৃতির চিত্রের খানিকটার উপর উজ্জ্বল আলোক পড়িয়া আছে; সেইটা আমাদের বর্তমানে প্রত্যক্ষ অংশ। সেই উজ্জ্বল দীপ্ত প্রদেশের চারিপাশে ক্ষীণতর আলোকে, আধ আলোকে আধ আঁধারে, আরও খানিকটা প্রদেশ ঈষৎ অপরিস্ফুট ভাবে দেখা যাইতেছে। সেই প্রদেশটা বর্তমানে প্রত্যক্ষ নহে; তাহার খানিকটার নাম অতীত; খানিকটার নাম ভবিষ্যৎ; খানিকটা দূরগত ও দর্শনাতীত; আর খানিকটা সূক্ষ্ম বা অতীন্দ্রিয়; খানিকটার নাম স্মৃতি শ্রুতি; খানিকটার নাম অনুমান, কল্পনা ও স্বপ্ন; আর খানিকটার নাম আশা ও ভয়"।[১৬] অতএব প্রত্যক্ষজগৎ ও প্রত্যক্ষাতিরিক্ত অবশিষ্ট জগৎ দুটি মিলেই ব্যক্ত প্রকৃতি। যদি প্রকৃতির এই প্রসারিত ক্ষেত্রে কোনও একটি দিকে সীমানার বন্দোবস্ত করা হয় তাহলে অবশ্যই তা ব্যর্থ হবে কারণ "গোচর ও অগোচর উভয়ের মাঝে সীমারেখা অঙ্কিত করা সম্ভব না। গোচর অজ্ঞাতসারে অগোচরে লীন হইতেছে; অগোচর আসিয়া অজ্ঞাতসারে গোচরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে"।[১৭]

ব্যক্ত প্রকৃতির প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষাতিরিক্ত অংশের সাথে ব্যক্তির সম্বন্ধ ঘটে যার মাধ্যমে, সেইটি হল ইন্দ্রিয়। জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। তবে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির ঐ মুখ্য ভূমিকাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে কর্মেন্দ্রিয়সমূহ। এই ভাবে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় ব্যক্ত প্রকৃতির প্রত্যক্ষ অংশটির সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করে।

ইন্দ্রিয়াবস্থা ব্যক্ত প্রকৃতির ভিন্নমূর্তির নির্ণায়ক

আর প্রত্যক্ষাতিরিক্ত অংশটির সাথে সম্বন্ধ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্ভব নয়, তাই এই অংশটির সাথে সম্বন্ধ হয় অন্তরিন্দ্রিয়ের (মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত) দ্বারা। প্রবন্ধকার সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন, "জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় জগতের খানিকটা খুঁজিয়া বেড়ায় ও কুড়াইয়া আনে, অন্তরিন্দ্রিয় সেই আহৃত-অংশটাকে ভাণ্ডারগত করে ও জগতের অবশিষ্ট অপ্রত্যক্ষ অংশটাকে লইয়া নাড়াচাড়া করে"।[১৮] ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা নিয়ে দার্শনিকগণ বহু বাদ-বিতণ্ডার অবতারণা করলেও প্রাবন্ধিক তা নিয়ে চিন্তিত

নন, বরং তাঁর কাছে ইন্দ্রিয়ের অবস্থা ও বিকার অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষাতিরিক্ত অংশের যে অনুভব সেইটি ইন্দ্রিয়কে দ্বার করেই হয় এবং সর্বতোভাবে ইন্দ্রিয়সমূহের অবস্থা ও বিকারের বশবর্তী। তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন, "যাহার ইন্দ্রিয়ের অবস্থা যেমন, প্রকৃতি বা বাহ্যজগৎ তাহার সম্মুখে তদনুযায়ী মূর্তিতে বিরাজমান"।[১৯] মনুষ্য হোক বা মনুষ্যেতর জীব, প্রসারে-পরিমাণে-সূক্ষ্মতায় ইন্দ্রিয়ের ভিন্নতা থাকবেই। আবার কখনও কখনও ইন্দ্রিয়ের অভাব বা অসম্পূর্ণতা ব্যক্ত প্রকৃতির ভিন্ন মূর্তি উপস্থাপিত করে।

মনুষ্যজগৎ থেকে প্রবন্ধকার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। সুস্থ ব্যক্তি ও বর্ণান্ধ ব্যক্তির মধ্যে বিচার করলে বোঝা যায় এক প্রকৃতি কীরূপে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে উভয়ের নিকট উপস্থিত হয়। সুস্থ ব্যক্তির চোখে রঙের গ্রহণের পদ্ধতিটি আশ্চর্যজনক। একটি ক্ষুদ্র চোখের ভেতরের কলকব্জা (mechanism) আরও আশ্চর্যজনক। খুব সোজাভাবে বললে চোখের পিছনের দেওয়ালে একধরনের কোষ থাকে (cone cells) যেগুলি লাল, সবুজ ও নীল এই তিনটি রঙের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল (responsive) হয় এবং ঐ তিনটি রঙ বিভিন্ন পরিমাণে মিশিয়ে নানারকম রঙ উৎপন্ন করে।[২০] অন্যদিকে বর্ণান্ধ ব্যক্তির চোখ সাধারণত লাল রঙের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল হয় না, ফলে তাদের কাছে বর্ণের বৈচিত্র্য তুলনামূলকভাবে কম। সুতরাং, ব্যক্ত প্রকৃতির রূপ-বৈচিত্র্য একজন সুস্থ ব্যক্তি ও বর্ণান্ধ ব্যক্তির নিকট ভিন্ন ভিন্ন। প্রবন্ধকার কৌতুকপূর্ণ আক্ষেপ ব্যক্ত করেছেন, "রঙমাত্রে কাণা এমন ব্যক্তি আছে কিনা, ঠিক জানি না। যদি থাকে, সে বড় দুর্ভাগ্য জীব সন্দেহ নাই। একরঙা একঘেয়ে জগতে বাস করা চলিতে পারে কিনা, সহজে আমাদের ধারণায় আসে না"।[২১]

প্রথম দৃষ্টান্ত

মনুষ্যেতর জগৎ থেকেও দৃষ্টান্ত দিয়েছেন প্রবন্ধকার। দৃষ্টির জন্য অনেক প্রাণীরই দুটি চোখ আছে কিন্তু পাখির দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ; ঘ্রাণের নিমিত্ত অনেক প্রাণীরই নাক আছে কিন্তু কুকুরের ঘ্রাণশক্তি প্রবল। তাহলে ব্যক্ত প্রকৃতির রূপ ও গন্ধের অনুভব কোনও প্রাণীর নিকট অধিক আবার কোনও প্রাণীর নিকট কম বা স্বাভাবিক।[২২] আবার জীব-জগতের বৈচিত্র্যে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে কারও জীবনযাত্রা চোখে দেখে, কানে শুনে নির্বাহিত হয় অন্যদিকে কারও জীবনযাত্রায় দেখার ভূমিকা পালন করে ত্বক ও শোনার ভূমিকা পালন করে চুল। সুতরাং, যে যেমনভাবে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা প্রত্যক্ষাতিরিক্ত অংশকে অনুভব করে তার কাছে ব্যক্ত প্রকৃতির রূপ তেমনই।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত

প্রবন্ধকার দুপ্রকার দৃষ্টান্তের পর একটি গল্পের অবতারণা করেছেন। গল্পটি অধ্যাপক ক্লিফোর্ড (William Kingdon Clifford)[২৩] তাঁর পাঠচলাকালীন অবস্থায় রচনা করেছিলেন বলে প্রবন্ধকার মনে করেন। গল্পটি মোটের উপর অনেকটা এইরকম- মহাসমুদ্রের গভীর জলভাগে থাকা একজাতীয় জীব দলবদ্ধভাবে বাস করে। এদিকে সেই গভীর জলভাগের অনেক উপরে বা বাইরে এক বৃহত্তর জগৎ আছে যেখানে মানুষ-পশু-পাখি অবস্থান করে, সেই সম্পর্কে ঐ গভীর জলভাগে থাকা প্রাণীদের কোনও ধারণাই নেই। গভীর জলভাগের চির অন্ধকারে দীর্ঘকাল বাস করায় তাদের কাছে দিন-রাত্রির কোনও প্রভেদই নেই। কোনও একদিন ঐ গভীর জলতল থেকে কোনও একজন উপরে উঠে আসে ও সূর্যালোকে আলোকিত নূতন জগৎ দেখে। গভীর জলতলে নিজ বাসস্থানে ফিরে গিয়ে সে তার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে- জলতলের উপরে এক বৃহত্তর জগৎ আছে যেখানে একটি প্রকাণ্ড প্রদীপ জ্বলছে এবং সেই প্রদীপের আলোয় সব আলোকিত। অনেকদিন পর আর এক ব্যক্তি হঠাৎ গভীর থেকে উপরে উঠে

ক্লিফোর্ডের গল্প

আসে এবং রাত্রিকালের তারকাখচিত আকাশ দেখে নিজ বাসস্থানে ফিরে গিয়ে জানায়– জলতলের উপরের জগৎ সত্যিই বৃহৎ, তবে সেখানে একটা মাত্র প্রকাণ্ড প্রদীপ নয়, অনেকগুলো ছোট ছোট প্রদীপ টিমটিম করে জ্বলছে। এই অবস্থায় দুই রকম মত উপলব্ধ হওয়ায়, দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে থাকল সেই জীবগোষ্ঠী।

অধ্যাপক ক্লিফোর্ডের উক্ত গল্পটি সাক্ষ্য দেয় কীরূপে এক জগৎ ভিন্নমূর্তিতে উপলব্ধ হয়। যার যেমন ইন্দ্রিয়গত অবস্থা, যার যেমন অনুভূতি তার কাছে প্রকৃতি তেমন ভাবেই উপস্থিত হয়। তবে শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়গত অবস্থাকে দায়ী করলেই চলে না, ইন্দ্রিয়গত সীমাবদ্ধতাও প্রকৃতির ভিন্নমূর্তিতে উপলব্ধির জন্য অনেকাংশে দায়ী। প্রাবন্ধিক যুক্তি দিয়েছেন, আলোর তরঙ্গের সবকটি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। যতটুকু দৃষ্টিগোচর হয়, ঐটুকুই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ক্ষমতা। প্রসঙ্গত, শব্দতরঙ্গের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শব্দতরঙ্গের যে পরিধি তার মধ্যে মানুষের শ্রুতিগোচর হয় **২০** হার্জ (hertz) থেকে **২০** হাজার হার্জ পর্যন্ত। তাই **২০** হার্জ এর নীচের শব্দতরঙ্গ (infrasound) এবং **২০** হাজার হার্জ এর উপরের শব্দতরঙ্গ (ultrasound) মানুষ শুনতে পায় না।[২৪] কিন্তু অন্যান্য প্রাণী যেমন কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি ঐ মনুষ্য–শ্রুতি–অগোচর শব্দ শুনতে পায়। অতএব, ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতা ব্যক্ত প্রকৃতির রূপকে সীমায়িত করে।

ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতা

তাই প্রকৃতির মূর্তির কোনও স্পষ্ট উত্তর হতে পারে না বলে প্রাবন্ধিকের অভিমত। তিনি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় বলেছেন, “আমার কাছে প্রকৃতির যেমন মূর্তি, তোমার কাছে ঠিক তেমন নহে। আবার কুকুর, বিড়াল, পাখী ইহাদের কাছে অন্যরকম; আবার কীটপতঙ্গের কাছে সম্পূর্ণ বিভিন্ন”।[২৫]

ব্যক্ত প্রকৃতির মূর্তির ভিন্নতাতেও সাদৃশ্যের জায়গা থেকেই যায়। যেমন সজাতীয়ের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক গঠনে অনেকটা মিল থাকায় তাদের কাছে ব্যক্ত প্রকৃতির প্রকাশ কমবেশি একরকমের হয়। স্পষ্ট করে বললে, মানুষে–মানুষে শারীরিক ও মানসিক গঠনে অনেকটা সাদৃশ্য থাকায় তারা সজাতীয় এবং ব্যক্ত প্রকৃতির রূপ তাদের কাছে অনেকটা একরকম বলে গণ্য হতে পারে। অন্যদিকে, একটি কীট বা পতঙ্গের সাথে মানুষের বৈসাদৃশ্য অনেকখানি। স্বাভাবিকভাবেই, বিজাতীয় হওয়ায় উভয়ের নিকট প্রকাশিত ব্যক্ত প্রকৃতির রূপে ভিন্নতা অনেক।

সজাতীয়ের মধ্যে থাকা এই সাদৃশ্যের কারণ খুঁজতে তৎপর হয়েছেন প্রাবন্ধিক। উত্তরের অভিমুখে তিনি দ্বারস্থ হয়েছেন ‘প্রাকৃতিক নির্বাচন’ তত্ত্বের নিকট– “এই সাদৃশ্যটুকু কেন? ইহার উৎপত্তি কিসে? ইহাতে তোমার আমার লাভ কি? এই প্রশ্ন স্বতই আসে। সঙ্গত উত্তর দিতে হইলে বোধ করি প্রাকৃতিক নির্বাচনের কাছে দৌড়িতে হয়”।[২৬] প্রবন্ধকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোকপাতের পূর্বে ‘প্রাকৃতিক নির্বাচন’ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ অবগত হওয়া প্রয়োজন।

ব্রিটিশ প্রকৃতিবিদ চার্লস ডারউইন এই প্রাকৃতিক নির্বাচন বা natural selection এর তত্ত্বটি সর্বপ্রথম উপস্থাপন করেন তাঁর বিখ্যাত রচনা *Origin of Species* গ্রন্থে। খুব সহজভাবে বললে, এটি একধরনের পদ্ধতি যার মধ্যে দিয়ে সকল জীব ও তাদের বংশপরম্পরা অগ্রসর হয় এবং প্রয়োজনবশত অভিযোজিত হয় বা পরিবর্তিত হয়।[২৭] অন্যান্য প্রকৃতিবিদরাও এই তত্ত্বটিকে মান্যতা দেন এবং সহমত পোষণ করেন। চার্লস ডারউইন বিষয়টিকে স্পষ্ট করেছেন উদাহরণ দিয়ে। তাঁর মতে একজন ব্যক্তি দুই জায়গার দুই রকম পায়রার মধ্যে মিলন ঘটিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রজাতির এক পায়রা ভূমিষ্ঠ করাতে পারেন যার ডানা, চোখ বা মুখ ভিন্ন রকমের হবে। এখানে বংশপরম্পরা অভিযোজিত ও পরিবর্তিত হচ্ছে

কিন্তু এই পরিবর্তন কৃত্রিম, মনুষ্যকৃত (artificial selection)। ডারউইন এর মতে প্রকৃতির মধ্যে থাকাকালীন জীবের মধ্যেও এই রকমের পরিবর্তন হতে থাকে সময়ের সাথে সাথে এবং সেই পরিবর্তন বা অভিযোজন প্রকৃতির কোলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের (natural selection) মধ্যে দিয়েই হয়।

অতএব, প্রবন্ধকার একেবারে আক্ষরিক অর্থে না হলেও মোটের উপর 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' বলতে যা স্বাভাবিক বা সহজসিদ্ধ তাকেই বোঝাতে চেয়েছেন। সজাতীয়ের নিকট প্রকাশিত ব্যক্ত প্রকৃতির এই ভিন্ন মূর্তির মধ্যে যে সাদৃশ্য, তা তাঁর মতে স্বাভাবিক। কেননা, প্রত্যেকেই যদি প্রত্যেকের থেকে ভিন্ন ভিন্ন উপলব্ধি করতে শুরু করে তাহলে সমাজ-সংসারে নির্বাহ দুষ্কর হয়ে পড়ে। খুব স্পষ্ট দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তিনি, "আমি ক বলিলে তুমি যদি খ বুঝ, দ্বিতীয় বার বলিলে ঙ বুঝ এবং তৃতীয় বারে বুঝ স্ত, তাহা হইলে আমি স্বতই তোমাকে পরিহার করিব। সাম্যে সম্মিলন, সম্মিলনে কল্যাণ আর যাহাতে কল্যাণ, প্রাকৃতিক নির্বাচনে তাহারই অভিব্যক্তি"।[২৮]

৫.৪.২. প্রসঙ্গ: সৃষ্টি

দর্শন হোক বা বিজ্ঞান বা সাহিত্য, সৃষ্টি সম্পর্কে এক একটি শাখার এক একরকম দৃষ্টিভঙ্গি। দর্শন তাত্ত্বিক প্রয়োগের (theoretical practice) মধ্যে দিয়ে ও বিজ্ঞান ব্যাবহারিক প্রয়োগের (practical practice) ধারায় সৃষ্টির ঊষালগ্নে পৌঁছানোর প্রয়াস করে চলেছে। এ যাত্রা বোধ হয় অন্তহীনের! অন্যদিকে, সাহিত্য সৃষ্টিসুখের উল্লাসেই নিবেদিতপ্রাণ। অতএব, সৃষ্টি-প্রক্রিয়া যেমন অদ্ভুত তেমনই অনির্বচনীয়।

জগৎ-সৃষ্টিতে মতামতের অন্ত নেই। অবশ্য, এরকমটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। *নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্* – একথা সর্বৈব সত্য, তাই এক এক জন এক এক মতবাদ রেখে গেছেন সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে। প্রবন্ধকার সুদূর আফ্রিকায় অসভ্য জাতির মধ্যে প্রচলিত সৃষ্টিতত্ত্বের সম্পর্কে জানিয়েছেন, চাঁদ ও ব্যাঙের মধ্যে বিতণ্ডা থেকেই জগতের শুরু। এবার যেহেতু ঐ দুটির মধ্যে বিতণ্ডার সূত্রপাত তাই তদবধি সমগ্র জগতেও সুস্থিরতা নেই।[২৯] আবার ঈশ্বর ও শয়তানের মধ্যে বিরোধ হতে এই ব্যাপক বৈষম্যমূলক সৃষ্টির সূচনা এমনটা পাশ্চাত্য বিদ্বজ্জনের অভিমত।[৩০]

প্রবন্ধকার সৃষ্টিতত্ত্বের এইরূপ অদ্ভুত মতবাদের উল্লেখের পর আপাতভাবে এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে "এক সময় ছিল, যখন কিছুই ছিল না; এই বৈচিত্র্য-মণ্ডিত অপূর্ব জগৎ সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন ছিল। ছিল বোধ করি, কেবল দেশ আর কাল- শূন্য দেশ আর শূন্য কাল; আর ছিলেন সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টিকর্তা নির্গুণ কি গুণময় তাহা লইয়া যতক্ষণ ইচ্ছা তর্ক করিতে পার; কিন্তু অন্ততঃ একটা উপাধি তাঁহাতে বিদ্যমান আছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে, নতুবা সৃষ্টির কল্পনা হয় না; সেটা সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা। স্রষ্টা ইচ্ছা করিলেন, জগৎ উৎপন্ন হউক, আর জগতের সৃষ্টি হইল; নাস্তিত্ব হইতে অস্তিত্ব হইল; কিছুই ছিল না, সবই হইল; দেশের ও কালের শূন্যতা পূর্ণ হইল। এই ঘটনার নাম সৃষ্টি"।[৩১] বিশেষ সংশয় না রেখে বলা চলে প্রবন্ধকারের এই ধারণায় উপনিষদের সৃষ্টিতত্ত্বের প্রভাব স্পষ্ট।

স্রষ্টার ইচ্ছায় সৃষ্টি

অথর্ববেদের অন্তর্গত *প্রশ্নোপনিষদে* ঋষি পিপ্পলাদের প্রতি কাত্যায়ন-পুত্র কবন্ধীর প্রথম প্রশ্নেই সৃষ্টি সম্পর্কে জানার আগ্রহ- "ভগবন্ কুতো হ বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইতি"।[৩২] ঋষি পিপ্পলাদ নিঃসংশয়চিত্তে জানালেন সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি ও তাঁর ইচ্ছার কথা। প্রজাপতি সৃষ্টিকার্যের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আর এইরকম ইচ্ছায় তপস্যা সম্পূর্ণ করে অর্থাৎ গভীর

চিন্তা করে রয়ি ও প্রাণের (চন্দ্র ও সূর্যের) অর্থাৎ ভোগ্য ও ভোক্তার সৃষ্টি করলেন, যাতে ভোগ্য-ভোক্তার সমন্বয়ে বহু সন্তানের সৃষ্টি হয়।[৩৩] অর্থাৎ স্রষ্টা ও তাঁর ইচ্ছা এই দুই সম্মিলিত হলেই সৃষ্টিকার্যের প্রারম্ভ। আবার এই উপনিষদেরই ষষ্ঠ প্রশ্নে ভরদ্বাজপুত্র সুকেশা যখন ঋষি পিপ্পলাদকে ষোলোকলাবিশিষ্ট পুরুষের অবস্থানের কথা জিজ্ঞেস করেন, তখন প্রসঙ্গক্রমে ঋষি ঘোষণা করেন সেই ষোলোকলাবিশিষ্ট পুরুষ 'ঈক্ষা'র মাধ্যমে অর্থাৎ গভীর চিন্তার মাধ্যমেই সবকিছুকে প্রকাশ করেন।[৩৪] *শুক্লযজুর্বেদের* অন্তর্গত *বৃহদারণ্যকোপনিষদেও* সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছার প্রসঙ্গ স্পষ্ট। স্রষ্টা একক অস্তিত্বে তৃপ্ত হতে পারেন না, তাই তিনি দোসর কামনা করলেন। তিনি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পূর্ণতা পেলেন।[৩৫] অতএব, সৃষ্টিকর্তা ও তার ইচ্ছাই এই পূর্ণতার অনুঘটক। আবার *মুন্ডকোপনিষদের* দ্বিতীয় মুন্ডকের প্রারম্ভে উপমার মধ্যে দিয়ে জানানো হচ্ছে, প্রদীপ্ত অগ্নির থেকে যেমন সহস্র স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয় তেমনই অক্ষর পুরুষ হতে বিবিধ জীব ও বস্তুর উদ্ভব হয়। রূপহীন, জন্মরহিত, প্রাণরহিত, মনবর্জিত শুদ্ধ অক্ষরব্রহ্ম থেকে এই দৃশ্যমান জগতের প্রকাশ।[৩৬] গ্রন্থকার পূর্বেই স্বীকার করেছেন সৃষ্টিকর্তা গুণবিশিষ্ট নাকি নির্গুণ এই নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে তবে সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির মাঝে অবশ্য স্বীকার্য 'সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা'। তাই, কৃষ্ণযজুর্বেদান্তর্গত *তৈত্তিরীয় উপনিষদের* ব্রহ্মানন্দবল্লীতে যখন আত্মা বা ব্রহ্ম হতে পরম্পরাক্রমে আকাশ-বায়ু-অগ্নি-জল-পৃথিবী-ওষধি-অন্ন-পুরুষ এর উৎপত্তির বর্ণনা হয়,[৩৭] তখনও সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা অবশ্য স্বীকার্য নচেৎ সমগ্র সৃষ্টিকার্যে সংশয় আপতিত হয়।

উপনিষদের ধারণা

সৃষ্টিকার্যে স্রষ্টার এই কর্তৃত্ব কমবেশি সকলেই স্বীকার করেন কিন্তু যে মুহূর্তে সৃষ্টিকর্তাকে সর্বশক্তিমান বা সর্বব্যাপী বা সৌন্দর্যময়, করুণাময় বলে ভূষিত করা হয়; সেই মুহূর্তে বিবাদ-বিসংবাদের অন্ত থাকে না! (কু)তার্কিক প্রশ্ন তোলেন সৃষ্টিকর্তা সৌন্দর্যময় হলে জগতে এত কুৎসিতের স্থান কেন? তিনি করুণাময় হলেও জগতে দুঃখের অন্ত নেই কেন? আর তিনি সর্বশক্তিমান হলে দুর্বলের উপর সবলের এত পরিমাণ অত্যাচার কেন? প্রাবন্ধিক আক্ষেপ করেছেন "এইরূপে পাঁচজন পাঁচকথা বলেন ও তুমুল কোলাহল করেন। কত হাজার বৎসর ধরিয়া কোলাহল চলিতেছে, কবে নিবৃত্ত হইবে, বলা যায় না"।[৩৮]

অতএব বিবাদ-বিসংবাদ অতিক্রম করতে চাইলে ঈশ্বরকে জগৎস্রষ্টারূপে স্বীকার করে নিলেই হয়। অর্থাৎ নৈয়ায়িকদের যুক্তি অবলম্বন করে এই জগতের কর্তারূপে ঈশ্বরকে মেনে নিতে হয়। তাঁরা বলেন কার্যমাত্রেই সকর্তৃক। দৃশ্যমান এই জগৎ যেহেতু কার্যবস্তু অতএব সেইটিও সকর্তৃক হবে। আবার, কার্যবস্তুর উপাদান কারণের জ্ঞান না থাকলে সেই কার্যের কর্তা হওয়া অসম্ভব। যেমন, তন্তুবায়ের তন্তুর জ্ঞান থাকে বলেই তিনি বস্ত্র তৈরি করতে পারেন। এই একই যুক্তিতে জগতের উপাদান কারণস্বরূপ পরমাণুর কর্তা স্বীকার করতে হয়। আর ইনি হলেন ঈশ্বর। প্রবন্ধকার তাঁর সহজ-স্বভাবসিদ্ধ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন "জগৎ একটা প্রকান্ড যন্ত্র, এই যন্ত্রের উদ্ভাবনে একজন যন্ত্রীর ইচ্ছা আবশ্যক; তাই ঈশ্বর স্বীকার কর্তব্য। এই যন্ত্রচালনেও একজন যন্ত্রীর শক্তি আবশ্যক। ঈশ্বরের ইচ্ছাই সেই শক্তি"।[৩৯]

জগৎস্রষ্টারূপে ঈশ্বরকর্তৃত্ব

যন্ত্র আছে তাই যন্ত্রীও আছে- একথা লৌকিক জগতের দৃষ্টিকোণ থেকে স্বীকার্য, কিন্তু চরাচর এই জগতের জন্যও একজন জগৎকর্তা থাকবে এর কোনও নিশ্চয়তা নেই। অর্থাৎ ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্বে আপত্তির জায়গা থেকেই যায়। প্রবন্ধকার সাংখ্যের সৎকার্যবাদের ধারণার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তন্তুবায় যে বস্ত্র তৈরি করেন, তা কোনও নতুন বস্তু

নয়। তন্তুর মধ্যেই ঐ বস্ত্র অবস্থিত ছিল; তন্তুবায় শুধুমাত্র বুদ্ধির জোগান দিয়ে ঐ বস্ত্রের আকার দান করেছেন। তাহলে সারকথা এই যে, জগৎ তৈরির উপাদান জগতের মধ্যেই অবস্থিত ছিল, সেখান থেকে জগতের উদ্ভব। তবে যে প্রশ্নের মীমাংসা বাকি থেকে গেল তা হলো, জগতের মধ্যেই অবস্থান করা ঐ উপাদানগুলি কোথা থেকে আসে? প্রবন্ধকার সরস আক্ষেপ ব্যক্ত করেছেন, "ব্রহ্মাণ্ড গড়িবার মশলা কোথা হইতে আসিল, এ কথার উত্তর পাওয়া যায় না"।[৪০]

অমীমাংসিত সমস্যা

জগৎ তৈরির মালমশলার হদিস পাওয়া না গেলেও, সেই মালমশলা থেকে জগৎ কীরূপে নির্মিত হল সেই বিষয়ে বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ বিচার করেছেন প্রবন্ধকার। তাঁর সরস মন্তব্য "জগতের মশলা কোথা হইতে আসিল ইহার উত্তর মিলিল না। তবে মশলা দেওয়া থাকিলে জগদ্‌যন্ত্র নির্মিত হইল কীরূপে ইহা যুক্তির বিষয় হইতে পারে। ইহা বিজ্ঞানের বিষয়, বিজ্ঞানেরই বিচার্য্য; বিজ্ঞান কষ্টে-সৃষ্টে যথাসম্ভব উত্তর দিবার চেষ্টা করিতেছে"।[৪১] বিজ্ঞান কষ্টে-সৃষ্টে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা কেন করছে, সে প্রসঙ্গে প্রবন্ধকার নীরব। তবে ধারণা করা চলে, পাঁচজন লোক যেখানে এই সুবৃহৎ জগৎকে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিকাশ বলেই দৃঢ়ভাবে মনে করেন সেই স্থলে বিজ্ঞানের পক্ষে 'প্রাকৃতিক নিয়মে'র যুক্তি দিয়ে জগৎসৃষ্টির ব্যাখ্যা কিঞ্চিৎ কষ্টকরই।

অতএব প্রবন্ধকারের সারকথা এই যে, সৃষ্টির পদ্ধতিতেই বিজ্ঞানের আলোকপাত। কোনওভাবেই সৃষ্টির কারণে নয়। তিনি বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি রেখেছেন, "যে ভাবের ব্যাখ্যায় মন তৃপ্তি লাভ করে সেই ভাবের ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের নিকট মিলিতেছে। অন্য কোনরূপ বুঝিবার ক্ষমতা মনুষ্যের নাই; সে প্রয়াসও বিজ্ঞান করে না"।[৪২] যদিও সর্বান্তকরণে একথা সমর্থন করা যায় না কারণ বিজ্ঞানের লক্ষ্য মনের তৃপ্তি ঘটানো নয় বরং অতৃপ্ত জিজ্ঞাসার সুলুক সন্ধান দেওয়া। স্কটিশ বিজ্ঞানী James Clerk Maxwell পরমাণুর গঠন বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, পরমাণুসকল একপ্রকারের ছাঁচে অবস্থিত। এরূপ অবস্থানে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক নিয়মকেই একমাত্র নিয়ামক বলা যায় না, একজন 'শিল্পী'র আবশ্যকতা স্বীকার করতে হয়। Maxwell এর এই মতামতকে প্রবন্ধকার তাৎপর্যপূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন এবং কিঞ্চিৎ সরস ব্যঙ্গে এই সুবৃহৎ জগৎ-যন্ত্রের একজন যন্ত্রী স্বীকৃতব্য কিনা সেই প্রশ্ন রেখে গেছেন, "মনুষ্যের বুদ্ধি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পথে অগ্রবর্তী হইয়া যেখানেই কিয়ৎক্ষণের জন্য পরাবৃত্ত হইয়াছে, সেইখানেই হাল ছাড়িয়া নিরাশভাবে বলিয়াছে, এইখানে একজন শিল্পীর আবশ্যকতা। পরমাণুর গঠনে শিল্পীর আবশ্যকতা কি না, যাঁহারা মানবচিন্তার বিজয়-বৈজয়ন্তী বহন করিয়া অগ্রণী ম্যাক্সওয়েলের পদানুসরণ করিতেছেন, তাঁহারাই বোধ করি তাহার উত্তর দিবেন"।[৪৩]

যাইহোক, সৃষ্টির পদ্ধতিতে বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ রাখতে গিয়ে তিনি স্পষ্টরূপে জানিয়েছেন "বিজ্ঞানের মতে ঈশ্বর এবং পরমাণু এই দুই মশলাতেই জগৎ নির্মিত"।[৪৪] বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে এই যুক্তির পৃষ্ঠপোষক সংখ্যায় নগণ্য বললেই চলে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে বেলজিয়ান ধর্মযাজক Georges Lemaître তাত্ত্বিকভাবে একটি মাত্র আদিম অণু থেকে "Big Bang" এর মধ্যে দিয়ে এই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি স্বীকার করেন।[৪৫] পরবর্তীকালে বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এই ধারণা অনেকটা বদ্ধমূল হয়। Big Bang থিয়োরি ছাড়াও অপর কয়েকটি ধারণা এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানীদের মধ্যে আলোচিত। যথা Quantum Universe Theory, Pre Big Bang Theory, Ekpyrotic Universe Theory ইত্যাদি। তবে এরকম এক অদ্ভুত রহস্য বস্তুত ব্যাখ্যার অতীত। Ram Brustein এবং Judy Kupferman তাদের প্রবন্ধ *The Creation of the*

সৃষ্টিতে বিজ্ঞানের দৃষ্টি

World – According to Science এ জগৎ সৃষ্টির ব্যাখ্যার এক সুন্দর দৃষ্টিকোণ উপস্থাপন করেছেন, "One interesting possibility is that – there is simply no explanation. We can't explain it because there was no definite reason that it happened. It just did. This is not as outlandish as it sounds. It is perfectly reasonable to think that not everything has a reason! Reasonable people don't enjoy thinking so – but it is still a possibility. Maybe something happens just because it does".[৪৬]

হিসেব কষলে দেখা যাবে, যেকোনও মতবাদ লোকসমক্ষে প্রকাশিত হলে সেই মতবাদের আস্বাদনকালে ব্যক্তির মধ্যেকার দৃঢ়মূল-সংস্কার অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে তার উপস্থিতির জানান দেয়। স্বাভাবিকভাবেই, বদ্ধমূল সংস্কারের মূলোচ্ছেদ সহজ ব্যাপার নয়। সৃষ্টি সংক্রান্ত বিবিধ মতবাদগুলির ক্ষেত্রেও একথা সমানভাবে প্রযোজ্য। জগৎ এক অসীম ও প্রকাণ্ড পদার্থ, যার সামান্যতম অংশই মানুষের সসীম জ্ঞানপরিধিতে আধৃত হয়েছে। জ্ঞানের বিকাশের সাথে সাথে এই পরিধির বাইরের অংশের সাথে অল্পবিস্তর পরিচিতি ঘটে ঠিকই কিন্তু সম্পূর্ণ পরিচয় অধরাই থেকে যায়। প্রবন্ধকার রুক্ষ ব্যঙ্গ করেছেন, "সম্প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের অতি সংকীর্ণ অংশে আমাদের জ্ঞান আবদ্ধ আছে; কিন্তু এই পরিধির বাহিরে আরও সর্বতোভাবে বিশালতর যে অংশ রহিয়াছে তাহার কিয়দংশের সহিত ক্রমশঃ আমাদের চেনা-শুনা ঘটিতে পারে, কিন্তু সমগ্রটা কখনই জ্ঞানের সীমানার ভিতর আসিবে না"।[৪৭]

একথা লৌকিক জগতের প্রেক্ষাপটে বিচার করলে সর্বৈব সত্য। কিন্তু সূক্ষ্ম-পর্যালোচন করলে দেখা যাবে ঐ যুক্তির অসারতা। প্রবন্ধকার নিজেও সেকথা মনে করেন। যাইহোক, সৃষ্ট এই জগতের সাথে একজন ব্যক্তির সম্বন্ধে দুটি সত্তা স্বীকার করা চলে। একটি 'আমি' (অর্থাৎ ব্যক্তি নিজে) এবং অন্যটি 'আমা ভিন্ন বাকি সব কিছু' (অর্থাৎ ব্যক্তি নিজে বাদে জগতের সবকিছু)। এখন, 'আমি'র অস্তিত্বে কোনও প্রমাণ লাগে না। 'আমি' এই সত্তাটি প্রমাণনিরপেক্ষ সত্য। কিন্তু 'আমা ভিন্ন বাকি সব কিছু' প্রমাণনিরপেক্ষ সত্য নয়। আরও কথা এই যে, 'আমি' সত্তাকে বাদ দিয়ে 'আমা ভিন্ন বাকি সব কিছু' রূপী সত্তাকে সপ্রমাণ করা যায় না। সাংখ্যদর্শনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে সেখানে স্বতন্ত্ররূপে জ্ঞাতা পুরুষ ও জ্ঞেয় প্রকৃতির অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। দুটি পৃথক সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে পুরুষ-প্রকৃতির সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে সেখানে সৃষ্ট জগতের অভিব্যক্তি ব্যক্ত হয়েছে (পূর্বে ২.৪.১৬ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু বেদান্তের আশ্রয় নিয়ে প্রবন্ধকারের দৃঢ় নিশ্চয় এই যে প্রকৃতির অস্তিত্ব একটি সম্ভাব্য সূত্র মাত্র (hypothesis)। সৃষ্ট জগৎ ও 'আমি'রূপী সত্তার মধ্যে প্রমাণ-নিরপেক্ষ 'আমি'র অস্তিত্বে পক্ষ নিয়ে প্রবন্ধকার কিঞ্চিৎ স্বীকারোক্তির অবতারণা করেছেন, "জগৎ না থাকিলে আমি থাকিতাম না, বোধ করি ইহা নির্ভয়ে বলা যাইতে পারে না; কিন্তু আমি না থাকিলে জগৎ থাকিত না এটা বোধ হয় কতকটা সাহসের সহিত বলিতে পারি"।[৪৮] এ যেন বেদান্তদর্শনের অধ্যাসভাষ্যের অনুরণন।[৪৯] প্রবন্ধকার এখানে 'চেতনা' বা 'চৈতন্য'র প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন এবং দার্শনিকের কলম হাতে নিয়ে চৈতন্যের অভিব্যক্তিতেই জগতের অভিব্যক্তি সেকথা ব্যক্ত করেছেন, "আমাকে ছাড়িয়া ব্যক্ত জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সপ্রমাণ করা যায় না। উহা আমারই কল্পনা বা কারিগরি। জ্ঞান-বিস্তারের সহিত জগতের একটু, আর একটু, আর একটুর সহিত ক্রমশঃ আমার পরিচয় হইতেছে, ইহা সম্পূর্ণ ঠিক নহে; আমারই চেতনার বিকাশের সহিত আমার জগৎ ক্রমে সৃষ্টি, বিকাশ বা অভিব্যক্তি লাভ করিতেছে, বরং ঠিক"।[৫০]

চেতনার বিকাশ

প্রবন্ধকার মনে করেন চেতনার আত্মবিশ্লেষণ শক্তি আছে। এবং অবস্থাত্রয়ের উপর ভিত্তি করে চৈতন্যের মধ্যেও শক্তির ভিন্নতা স্পষ্ট হয়। যেমন, সুষুপ্ত-অবস্থায় চৈতন্য নিজের নিকট অপরিচিত। কতখানি তার আয়ত্তের অধীন আর কতখানি আয়ত্তে নেই, সে সম্পর্কে চৈতন্য অনবহিত। স্বপ্ন-অবস্থায় চৈতন্য নিজের কাছে কিছুটা পরিচিত হয়েছে। নিজ অস্তিত্বের প্রবাহ সম্পর্কে তার কিছুমাত্র ধারণা হয়েছে। আর জাগ্রত-অবস্থায় চৈতন্য বিকশিত, স্ফুট ও পরিচিত। নিজেকে জানে, নিজেকে চেনে। প্রবন্ধকার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, "স্থূল ভাবে বুঝাইতে হইলে কৃমি-কীটের চেতনাকে বোধ করি সুষুপ্ত, মশা-মাছির চেতনাকে স্বপ্নাবস্থ ও উচ্চতর জীবের চেতনাকে জাগ্রত বলিতে পারা যায়"।[৫১] বলা বাহুল্য, বেদান্তশাস্ত্রের শব্দ কয়টি গ্রহণ করলেও প্রবন্ধকার একেবারে সেই অর্থেই গ্রহণ করেননি।

চেতনার অবস্থাত্রয়

চৈতন্য এই আত্মবিশ্লেষণ-শক্তি দিয়ে নিজেকে দুটি ভাগে বিচ্ছিন্ন করে- একটি অহং বা আমি এবং অন্যটি প্রকৃতি বা বাহ্য জগৎ। অর্থাৎ দুটি ভাগই চিৎ-পদার্থের সমন্বয়, কিন্তু যে চিৎ-পদার্থগুলিকে চৈতন্য নিজের থেকে পৃথকভাবে দেখে সেইটিই বাহ্য প্রকৃতি। এই বাহ্য প্রকৃতিতে চৈতন্য যা কিছু দেখে সেইসব হয়তো একসঙ্গে দেখে বা পর পর দেখে। যথাস্থানে দেখাই হল 'দেশব্যাপ্তি' এবং পর পর দেখাই হল 'কালব্যাপ্তি'। প্রবন্ধকার সহজ অথচ সুগভীর দর্শন উপস্থাপিত করেছেন, "দেশ ও কাল এই চেতনার আত্মনিরীক্ষণের রীতি মাত্র। যে অর্থে আমার বাহিরে অন্য জগৎ নাই, সেই অর্থে আমার বাহিরে দেশও নাই, আমার বাহিরে কালও নাই। আমিই আমার অনুভূতিগুলিকে আমারই আবিষ্কৃত উপায়ে দেশে স্থাপিত করি ও কালে বিন্যস্ত করি..."।[৫২]

দেশব্যাপ্তি ও কালব্যাপ্তি

অতএব চৈতন্যের অভিব্যক্তি যতক্ষণ অবধি পূর্ণ হতে থাকে, ততক্ষণ অবধি প্রকৃতির দেশব্যাপ্তি ও কালব্যাপ্তিও চলতে থাকে। অর্থাৎ প্রকৃতি বা প্রকৃতির দেশব্যাপ্তি ও কালব্যাপ্তি সবই 'আমি'রূপী সত্তার মধ্যে। 'আমি'রূপী এই সত্তার অভিব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি। প্রবন্ধকার বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি পৃথকভাবেই রাখতে চেয়েছেন। তাই জগৎ সম্পর্কে যেখানে যেখানে 'অনাদি' 'অনন্ত' ইত্যাদি বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রবন্ধকার প্রতিবাদ জানিয়েছেন, "অনাদি অনন্ত এই সকল দীর্ঘ বিশেষণ কবিকল্পনা, বাক্যালংকার; উহা কাব্যে শোভা পায়; বিজ্ঞানে উহাদের অস্তিত্ব নাই"।[৫৩] যদিও প্রবন্ধকার সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির উপসংহার করেছেন বলে বোধ হয় না। বেদান্তের মূল তত্ত্বে সর্বদাই আত্মচৈতন্য ব্যতীত অন্য কিছুর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়নি (পারমার্থিক সত্তায়)। এমতাবস্থায়, চেতনার বিকাশ বা অভিব্যক্তিকেই সৃষ্টি বলার মধ্যে দিয়ে প্রবন্ধকার বৈজ্ঞানিক প্রয়োগের থেকে দার্শনিক উপলব্ধির উপরই পক্ষপাত করেছেন বলে মনে হয়, "জগৎ অনন্ত, একথা অর্থহীন; কাল অনাদি, একথা অর্থহীন; দেশ অসীম, একথাও অর্থহীন। আমার জগৎ সান্ত; যেটুকু আমি যখন দেখিতেছি, সেইটুকুই তখন অস্তিত্ববান; তাহা ছাড়িয়া অন্য কিছুর অস্তিত্ব নাই। আমার কালও সাদি ও সান্ত; যেটুকুর সহিত আমার পরিচয়, সেইটুকুই অস্তিত্ববান... আমার আত্মবিকাশের সহিত আমার জগতের পরিধি বাড়িতেছে, দেশের সীমারেখা ও কালের সীমারেখা দূর হইতে আরও দূরে ক্রমে সরিয়া যাইতেছে"।[৫৪]

'অহং'সত্তার অভিব্যক্তিই সৃষ্টি

৫.৪.৩. প্রসঙ্গ: জগতের অস্তিত্ব

'আমি'রূপী সত্তার অভিব্যক্তিই সৃষ্টি একথা একপ্রকার ঘোষিত ও স্বীকৃত হল। কিন্তু সৃষ্টি প্রক্রিয়ার অব্যবহিত পরেই প্রশ্ন ওঠে এই সমুদয় সৃষ্টিকার্যে সৃষ্ট জগতের অস্তিত্ব সম্পর্কে। সৃষ্ট জগৎ বা ব্যক্ত জগৎ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের বিশেষ প্রশ্নের অবকাশ থাকে না কারণ দৈনন্দিন জীবিকা নির্বাহে তারা এতটাই নিবিষ্ট যে, চারপাশে বিদ্যমান জগৎ সম্পর্কে তাদের মনে সন্দেহের বিশেষ জায়গা নেই কিন্তু দার্শনিকেরা অত সোজা-সাপ্টা বুদ্ধি নিয়ে চলেন না। জগৎ তাদের কাছে অস্তিত্বের বা নাস্তিত্বের বিষয়। প্রবন্ধকার সরস ব্যঙ্গ করেছেন, "সাধারণ মানবগণ অন্ন-পানাদির আহরণে এত নিবিষ্টভাবে ব্যাপৃত আছে যে, জগতের অস্তিত্ববিষয়ে তাহাদের মনোমধ্যে কস্মিন্ কালে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইতে পায় না। কিন্তু কতকগুলি অতিবুদ্ধি লোকে জগতের অস্তিত্বটা একেবারে লোপ করিতে বসেন"।[৫৫]

নাস্তিক পরম্পরায় 'জগৎ'

ভারতীয় দর্শনপরম্পরায় নাস্তিক দর্শনগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে প্রথমেই পাওয়া যায় চার্বাকের কথা। জড়বাদী চার্বাকের কাছে জগতের সকল বস্তু অকস্মাৎ উৎপাদিত। দৃশ্যমান এই জগৎ পৃথিবী-জল-তেজ-বায়ু এই চতুর্ভূতের সংযোগেই সৃষ্ট। অতএব জগতের প্রত্যক্ষ অংশটির অস্তিত্ব নিয়ে চার্বাকের কোনও সন্দেহ নেই। শূন্যবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিকট আপেক্ষিক কোনও কিছু চরম সত্তার অযোগ্য অর্থাৎ লোকব্যবহার নির্বাহের জন্য এক একটি বস্তুকে এক একটি নামে বলা হয় ঠিকই কিন্তু আপেক্ষিক কোনও কিছু যেহেতু চরম সত্তা নয়, তাই প্রতিক্ষণে পরিবর্তনশীল রূপান্তরিত জগৎ কল্পনামাত্র। অপরদিকে জৈন সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত হল জগৎ যেহেতু বিভিন্ন দ্রব্যের সমষ্টি তাই নিত্যগুণের আঙ্গিকে বিচার করলে জগৎ নিত্য এবং আগন্তুক গুণের আঙ্গিকে বিচার করলে জগৎ পরিবর্তনশীল।

আস্তিক পরম্পরায় 'জগৎ'

আস্তিক দর্শনগুলির মধ্যে বেদান্ত বাদে প্রায় সবকটি দর্শনই জগতের অস্তিত্ব নিয়ে বিশেষ প্রশ্ন তোলেনি। বেদান্ত দর্শন জগৎকে মিথ্যা বলেছেন। যদিও ব্যাবহারিক সত্তায় জগৎকে স্বীকার করা হয়েছে, তবে পারমার্থিক সত্তায় অর্থাৎ ব্রহ্মের উপলব্ধিতে জগৎ বাধিত হয়, জগতের অস্তিত্ব থাকে না। প্রবন্ধকার যথার্থ আক্ষেপ ব্যক্ত করেছেন, "প্রচলিত তর্কশাস্ত্রের পন্থা এতই বিভিন্নমুখ যে, সেই পথ ধরিয়া একটা স্থির মীমাংসায় উপস্থিত হওয়া একরকম দুঃসাধ্য ব্যাপার। এক সম্প্রদায়ের মতে জগতের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ সত্য, অন্য সম্প্রদায়ের মতে ইহা একেবারে কাল্পনিক। প্রচলিত বিচারপ্রণালী উভয়বিধ সিদ্ধান্তেই নিরীহ মানুষকে টানিয়া লইয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বিধান বড় ভরসার স্থল নহে"।[৫৬]

'আমা'র অস্তিত্ব

জগতের অস্তিত্বে প্রবন্ধকারের কোনও সংশয় নেই। জাগতিক ঘটনাসমূহের নিরবচ্ছিন্নতা বোঝাতে তিনি 'রাজপথ পার্শ্বস্থ অট্টালিকা'র উপমা প্রয়োগ করেছেন। রাজপথের দুপাশে যেমন অট্টালিকার সারি পর পর অবস্থান করে তেমনই জাগতিক ঘটনাগুলিও পর পর অবস্থান করছে মাত্র। কেউ মনে করেন এই ঘটনাপ্রবাহ নিরবচ্ছিন্নভাবে বহমান, কেউ মনে করেন 'জোনাকি পোকার আলো' কিংবা 'মনুষ্য-হৃদয়ের স্পন্দনে'র মতো এই ঘটনাপ্রবাহে কিছু সময়ের অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব পরম্পরাক্রমে আছে। সমগ্র বিষয়টি অনেকটা 'বায়োস্কোপের ছবি'র মতো, যেখানে একটির পর আর একটি চিত্রের এত দ্রুত পরিবর্তন ঘটে, যা সাধারণ দৃষ্টিতে উপলব্ধ হয় না।[৫৭] প্রবন্ধকারের মতে, জগতের অস্তিত্ব মূলত দুটি বিষয়ের অস্তিত্ব- একটি 'আমার অস্তিত্ব' এবং অন্যটি 'আমা-ছাড়ার অস্তিত্ব'। তিনি স্পষ্টরূপে ইঙ্গিত করেছেন, জগৎ-বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে প্রাপ্ত এই দুটি অংশের মধ্যে 'আমি' অর্থে

চৈতন্য। 'চৈতন্য'র অস্তিত্ব অস্বীকারের কোনও জায়গা নেই কারণ চৈতন্য স্বতঃসিদ্ধ। প্রবন্ধকার অকপট যুক্তি রেখেছেন "যদি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া কোন সত্য বা সিদ্ধান্ত থাকে, 'আমার অস্তিত্ব' সেই স্বতঃসিদ্ধ সত্য। ইহা অন্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না"।[৫৮]

কিন্তু 'আমা-ছাড়া' জগতের অস্তিত্ব নিয়েই বিবাদের সূত্রপাত। প্রবন্ধকার ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছেন। 'আমি' অর্থাৎ চৈতন্যকে বাদ দিলে, ভৌতিক শরীর থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ বহির্জগৎ- কিছুটা প্রত্যক্ষের বিষয় ও কিছুটা অনুমানের। এই প্রত্যক্ষ অংশটুকুর মধ্যে আবার যাবতীয় কাজ-কারবার রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ এই 'সংকেত'গুলিকে নিয়ে হয়। সাংখ্যের পরিভাষায় ঐগুলি পঞ্চতন্মাত্র, তবে প্রাবন্ধিক 'সংকেত' বলেই উল্লেখ করেছেন। তিনি সংকেতের কার্যকারিতা বর্ণনা করেছেন, "তোমার শরীর হইতে চারি দিকে আকাশে ধাক্কা লাগে। সেই ধাক্কা আসিয়া চক্ষুর পটে লাগে। স্নায়ুযোগে সেই ধাক্কা মস্তিষ্কে নীত হইয়া মস্তিষ্কের স্থান বিশেষে বিশেষ একরকম আন্দোলন

'আমা' ছাড়ার অস্তিত্বে সংশয়

উপস্থিত করে। সেই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে তোমার রূপবিষয়ে আমার অনুভূতি জন্মে"।[৫৯] এই কথাগুলি সাংখ্যের মনস্তত্ত্বের অনুরূপ। প্রবন্ধকারের যুক্তি এই যে, অনুভূতি রূপ বিষয়টি চৈতন্যের অংশ, অতএব ঐ হিসেবে ঐটি সত্য কিন্তু অনুভূতি থেকে 'তোমার অস্তিত্ব' এক ধরনের অনুমান তথা কল্পনা- "অনুভূতিটা আমার অংশ, আমার মানস শরীরের এক কণিকা, উহাই আমার প্রত্যক্ষ বিষয়। এই হিসাবে উহা সত্য। তোমার অস্তিত্ব আমার অনুমান, আমার বুদ্ধিশক্তির একটা কারিগরি, একটা সৃষ্টি, একটা কল্পনা"।[৬০] অতএব মূল কথা এই যে 'আমি-ছাড়া' যে বাহ্য জগৎ তা সবই আমার কল্পনা, চিন্তা, অনুভূতি ইত্যাদির যোগফল। প্রবন্ধকার এই স্থলে উল্লেখ না করলেও নিশ্চিতভাবেই বেদান্তদর্শনকে স্মরণ করেছেন এবং বেদান্তের 'জগৎ মিথ্যা' এই ধারণাকে স্বার্থপর সিদ্ধান্ত বলে উল্লেখ করেছেন, "এক কথায় সবটাই আমার ভিতর। আমিই সব। ফলে যুক্তিশাস্ত্র এই ঘোর স্বার্থময় সিদ্ধান্তে আনয়ন করে, আমিই সব, তুমি আবার কে? ইহার ফল হয় বৈরাগ্য। জগৎ মিথ্যা, মায়া..."।[৬১]

বেদান্তের এইরূপ সিদ্ধান্তকে প্রবন্ধকার 'স্বার্থময়' সিদ্ধান্ত বলে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য তিনি একটি জোরালো যুক্তির অবতারণা করেছেন এই প্রসঙ্গে। 'আমি' সর্বদাই উত্তম পুরুষ, 'তুমি' সর্বদাই মধ্যম পুরুষ এবং এই দুটি বাদে বাকি সবই প্রথম পুরুষ। সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্রের দৃষ্টিতেও একথা একেবারে সঠিক। এখন উত্তম পুরুষের অস্তিত্বে কোনওভাবেই সন্দেহের জায়গা নেই কিন্তু এই উত্তম পুরুষের কল্যাণসাধনার্থে মধ্যম পুরুষ 'তুমি'র অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হয় নচেৎ জীবনযাত্রা চলে না। প্রবন্ধকারের মতে এই বিষয়ে অন্য কোনও যুক্তির জায়গা নেই, একমাত্র যুক্তি

লাঠির যুক্তি

'প্রকৃতির লাঠি'। বিষয়টি তিনি স্পষ্ট না করলেও ধারণা করা চলে, স্বাভাবিক জীবনযাত্রার নির্বাহের মধ্যে দিয়েই প্রকৃতির বহমানতা। এমতাবস্থায় শুধুমাত্র উত্তম পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করে বাকি সবকিছুর অস্তিত্ব অস্বীকার করলে ভারসাম্যের হানি হয়। তাই প্রকৃতি স্বয়ং লাঠি হাতে দণ্ডায়মানা হন, যাতে উত্তম পুরুষের সাথে মধ্যম পুরুষের অস্তিত্বকেও মান্যতা দিতে হয়। এইরূপ অনুমান করলে বোধ হয় বিশেষ ভুল হবে না যে, প্রবন্ধকার শংকরাচার্যের অধ্যাসভাষ্যের[৬২] 'অস্মত্-প্রত্যয়' ও 'যুস্মত্-প্রত্যয়' সম্পর্কে সম্যক্ অবগত ছিলেন এবং 'অস্মত্-প্রত্যয়' ও 'যুস্মত্-প্রত্যয়' এর বিরুদ্ধস্বভাবের প্রতিযুক্তি খুঁজতে অসমর্থ হয়ে প্রকৃতিকে 'লগুড়হস্তে' আনয়ন করলেন, "এই স্বার্থপর বৈরাগ্যজনক ধর্মের বিরুদ্ধে অন্য যুক্তি নাই; একমাত্র যুক্তি লাঠি। প্রকৃতি স্বয়ং লগুড়হস্তে দণ্ডায়মানা"।[৬৩]

মধ্যম পুরুষের অস্তিত্ব যদি স্বীকার করা হয়, তাহলে প্রথম পুরুষের অস্তিত্বও স্বীকার করে নিতে হয় কারণ চৈতন্যের বিভাগ বা বিভেদ নির্দেশ করা অসম্ভব। প্রবন্ধকার মোক্ষম যুক্তির অবতারণা করেছেন, "তোমাকে চেতন স্বীকার করিলে সকলকেই চেতন মানিতে হইবে। জীবশ্রেণীর পরম্পরায় পরস্পরের এমনই সম্বন্ধ কাহাকে ছাড়িয়া কাহার চৈতন্য স্বীকার করিব? তোমার যদি চৈতন্য থাকে তবে নিকট জ্ঞাতি হনুমানেরও আছে, দূর জ্ঞাতি মৎস্য কুম্ভীরের আছে, দূরতর কৃমি কীটের ও দূরতম কীটাণুরও আছে, প্রোটোপ্লাজমেরও আছে। চৈতন্যের সীমানা নির্দেশ অসম্ভব। এই সীমার উর্দ্ধে সমুদয় জীব চৈতন্যবিশিষ্ট, ইহার নীচে চৈতন্য নাই, কে সাহস করিয়া বলিবে"?[৬৪] বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়স্থ *ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বং চ শব্দাৎ* (২/১/৪) সূত্রের শাংকরভাষ্যের প্রতিফলন প্রবন্ধকারের ধারণায় স্পষ্ট।[৬৫] জীব হোক বা জড়, চৈতন্যের প্রকৃতিগত বা আকৃতিগত পার্থক্য হয় না, যেটুকু পার্থক্য তা শুধুমাত্র অভিব্যক্তিতে বা প্রকাশে। প্রবন্ধকারের কথায় তারই প্রতিধ্বনি, "তোমার চৈতন্যে এবং কীটাণুর চৈতন্যে পার্থক্য আছে, কিন্তু সে প্রকৃতিগত পার্থক্য নহে, মৌলিক পার্থক্য নহে, কেবল অভিব্যক্তির মাত্রাগত পার্থক্য"।[৬৬]

'আমা' ছাড়ার অস্তিত্ব

অতএব, একথাতে সর্বসম্মত হওয়া চলে যে, 'আমা-ছাড়া' অংশ (বাহ্য জগৎ) এবং 'আমি' এই উভয় সত্তাই চৈতন্যময়। আর, জগৎ যেহেতু 'আমি' ও 'আমা-ছাড়া বাকি সব' এই দুই অংশকে নিয়ে সম্পূর্ণ তাই এই দুই মিলে জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয় বইকি। দর্শনশাস্ত্রগুলি তাদের সুদীর্ঘ পরম্পরায় ও পর্যালোচনায় একটি 'সদ্বস্তু'র খোঁজে ব্যাপৃত। এই খোঁজে বস্তুজগৎকে তাঁরা সদ্বস্তু বলতে নারাজ। কিন্তু জড় জগতের যে একটা স্বরূপ আছে সেকথা অনেকে স্বীকার করলেও অনেকে স্বীকার করেন না। প্রবন্ধকার সাংখ্যের 'অব্যক্ত-প্রকৃতি' তত্ত্বকে সামনে রেখে বাহ্য জগতের বা জড় জগতের পটচিত্রটি উপস্থাপন করেছেন, "একটা কিছু আছে, উহা অনির্দেশ্য- স্পেন্সারের ভাষায় অজ্ঞেয়-Unknowable; সাংখ্যদর্শনের ভাষায় উহার নাম অব্যক্ত প্রকৃতি। এই অব্যক্ত, অনির্দেশ্য, অজ্ঞেয়ন্ প্রকৃতি, চেতপুরুষের- যাঁহার সাংখ্যদর্শনসম্মত নাম জ্ঞাতা বা 'জ্ঞ', তাঁহার সম্মুখে আসিয়া প্রতীয়মান, অনুভূয়মান ব্যক্ত প্রকৃতির বা প্রত্যক্ষ জগতের মূর্তি গ্রহণ করে; কেন করে তাহা কেহ জানে না, করে এই মাত্র- করে বলিয়াই এই 'সৃষ্টি' ব্যাপার। করে (বলিয়াই) আমি, তুমি, তিনি- মৎস্য, কুম্ভীর ও প্রোটোপ্লাজম্, গিরি-নদী সমাকীর্ণা বসুন্ধরা ও তারকাখচিত নভোদেশ- বাহ্য জগতের এই পট"।[৬৭]

৫.৪.৪. প্রসঙ্গ: পঞ্চভূত

সৃষ্টিতত্ত্ব বা জগদ্ব্যাপারের সাথে সাথে জগতের অস্তিত্ব নিয়ে সংশয়শূন্য হওয়ার পর প্রবন্ধকার জগতের উপাদানের বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়েছেন। সমগ্র জগতে যা কিছু বিষয়-বস্তু আছে, তার মৌলিক উপাদান কী কী- এই প্রশ্ন সেই সুদূর অতীত থেকে আজও বিদ্যমান।

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রগুলির দিকে চোখ রাখলে দেখা যাবে, দার্শনিকেরা স্থূল জড় জগৎকে 'ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোম' এই পাঁচটি মহাভূতে নির্মিত বলেই মনে করেন। আধুনিক বিজ্ঞানের কাছে বিশেষত রসায়ন বিজ্ঞানের দোরে উপস্থিত হলে, মৌলিক উপাদান বা element বলতে তারা সেই সমস্ত উপাদানকে বোঝেন, যা সংখ্যায় শতাধিক, যেগুলির আর বিশ্লেষণ হয় না। অতএব, রসায়ন শাস্ত্রের element ও দর্শন শাস্ত্রের মহাভূত এক অর্থে প্রয়োগ করার কোনও কারণ নেই। প্রবন্ধকার স্পষ্ট তবে শক্ত কথায় শুরুতেই তা জানিয়ে দিয়েছেন, "বিধাতা সৃষ্টির দিনে মানুষকে সর্ববিধ জাগতিক তথ্যের

উপদেশ দেন নাই। মানুষ আপন চেষ্টায় কাল সহকারে ঐ সকল তথ্য নির্ণয় করিতেছে। কাজেই আমরা বহু বৎসর পরে জন্মিয়া সেকালের লোকের অপেক্ষা অধিক জানিয়া ও শিখিয়া ফেলিয়াছি, ইহাতে বিস্ময়ের বা স্পর্ধার হেতু নাই"।[৬৮] তাহলে কি ক্ষিতি শব্দে শুধুমাত্র মাটি নয়, সকল প্রকার কঠিন পদার্থকেই বুঝতে হবে? বা অপ্ শব্দে শুধুমাত্র জল নয়, সমস্ত তরল পদার্থ মাত্রই বুঝতে হবে? দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে 'ক্ষিতি' নামক মহাভূতে রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ এই পাঁচটি ধর্ম থাকে। আবার 'অপ্' নামক মহাভূতে রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ এই চারটি ধর্ম থাকে। কিন্তু বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে কঠিন পদার্থের মত তরল পদার্থেও ঐ পাঁচটি ধর্ম দেখা যায়। প্রবন্ধকারের অভিনব অভিমত, ঐ পাঁচটি এক একটি concept বা ধারণামাত্র।

দর্শনের মহাভূত
ও
বিজ্ঞানের Element

মোটকথা, দার্শনিকের পঞ্চমহাভূতকে কোনওভাবেই জড় জগতের মূল উপাদানরূপে বোঝা উচিত নয়। তাই দর্শন শাস্ত্রে যে অর্থে 'মহাভূতের' প্রয়োগ, আধুনিক বিজ্ঞানের element কে সেই অর্থে সমন্বয় করাতে চাইলে প্রতি পদে বিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। প্রবন্ধকার তাই এরূপ সমন্বয়ের অপ্রয়োজনীয়তা উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, "আমার বিবেচনায় যাঁহারা আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত প্রাচীন বিজ্ঞানের এইরূপ সমন্বয় করিতে যান, তাঁহারা একটা ভুল করেন। বিজ্ঞান বিদ্যাটাই পরিবর্তনশীল, উন্নতিশীল বলিতে চাও ক্ষতি নাই। উহার সিদ্ধান্তগুলি ক্রমশঃ পরিবর্তিত ও পরিণত হইতেছে। বিজ্ঞান কোন দিন একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না; আজ যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছে, কাল সে সিদ্ধান্ত বদলাইয়া লইবে... কাজেই আজি যদি প্রাচীন মতে ও আধুনিক মতে সমন্বয় কল্পনা করিয়া আনন্দ লাভ কর, কালি সে আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। তখন বিজ্ঞান নূতন কথা কহিতে আরম্ভ করিবে, তখন আর সমন্বয় সাধন চলিবে না"।[৬৯]

মহাভূত ও element এর
সমন্বয়ের অপ্রয়োজনীয়তা

দর্শনের দৃষ্টিকোণ ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণে সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা যেমন নেই, তেমনই বিরোধেরও প্রয়োজনীয়তা নেই বলেই প্রবন্ধকার মনে করেন। একথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে, রামেন্দ্রসুন্দরের চিন্তাভাবনা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ছিল তাই নয়, তা ছিল প্রগতিশীল। তিনি দর্শন ও বিজ্ঞান এই দুটিকে তাদের স্বতন্ত্র স্থান দেবার কথা সর্বদাই বলে গেছেন, "দর্শন ও বিজ্ঞানের বিরোধ নাই; কিন্তু দর্শন যে চোখে দেখেন, যে পথে চলেন, বিজ্ঞান সে চোখে দেখেন না, সে পথে চলেন না"।[৭০] তাই কট্টরপন্থীর বিরোধ আর উদারবাদীর সমন্বয় এই দুই পথের মাঝ বরাবর তিনি 'স্বতন্ত্রতা'র যুক্তি রেখে গেছেন। এক সুন্দর ও সহজ দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি এই দুই দৃষ্টিকোণ তুলে ধরেছেন, "মিহিদানার মত উপাদেয় দ্রব্য তাঁহার (বৈজ্ঞানিকের) হাতে পড়িলে তিনি নিতান্ত নির্মমভাবে উহাকে খলে পিষিবেন, জলে গুলিবেন, কাচের শিশিতে পুরিয়া যত অকথ্য জিনিষ উহাতে ঢালিবেন এবং শেষ পর্যন্ত উহাকে একটা লম্বা নলে পুরিয়া পোড়াইয়া দেখিবেন যে, পুড়িয়া কত রকমের বায়ু বাহির হইল, কতটুকু ছাই পাওয়া গেল। তিনি হয়ত জানেন যে, উহাতে ছিল খানিকটা ছোলার বেশম, কিঞ্চিৎ ঘি, কিঞ্চিৎ চিনি ইত্যাদি। কিন্তু ঐগুলাও যৌগিক দ্রব্য, উহা বিশ্লেষণ করিয়া তিনি পাইবেন এতটা কয়লা, এতটা অক্সিজেন, এতটা হাইড্রোজেন, এতটা নাইট্রোজেন ইত্যাদি। এই কয়লা, অক্সিজেন প্রভৃতি পদার্থ এলিমেন্ট; উহাদিগকে বিশ্লেষণ করিয়া তিনি আর কিছু বাহির করিতে পারিবেন না, অন্যেও পারিবে না। অতএব, সিদ্ধান্ত হইবে যে, ঐ কয়েকটি মূল উপাদানে ঐ মিহিদানাটি নির্মিত হইয়াছে। কিন্তু দার্শনিকের নিকট গেলে তিনি আদৌ সে পথে চলিবেন না। তিনি দেখিবেন, উহার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ... তিনি দেখেন আহা, ঐ যে মনমোহন মিহিদানা- উহা কেমন বর্তুলাকার, তাহার পৃষ্ঠদেশে দানাগুলি কেমন সৌষ্ঠব সম্পাদন করিতেছে; উহার

দর্শন ও বিজ্ঞানের
দৃষ্টিকোণ স্বতন্ত্র

বর্ণে চোখ জুড়ায়, উহার কিবা ভঙ্গী, কিবা রূপ; আর স্পর্শ– সেই বা কেমন কঠিনে কোমলে মিশ্রিত– ত্বগিন্দ্রিয়ের সান্নিধ্যে আসিলে বস্তুতই লোমহর্ষ হয়। উহার শব্দে বিশেষ মহিমা নাই, নয়ত উহা মাটিতে পড়িলে ধব্ করিয়া সাড়া দেয় মাত্র। কিন্তু উহার গন্ধ– তাহাতে রসনা আপনা হইতে আর্দ্র হইয়া আসে– দূরে থাকিতেই লালা নিঃসরণ করে; সর্বোপরি উহার রস– উহা বর্ণনাতীত– জ্ঞাতাস্বাদঃ কো বিহাতুং সমর্থঃ”।[৭১]

যাইহোক, পুরানো প্রশ্নেই ফেরা যাক। দর্শনশাস্ত্রের পঞ্চমহাভূত প্রকৃত অর্থেই জগতের উপাদান কিনা? সাংখ্যদর্শন রূপ–রস–গন্ধ–স্পর্শ–শব্দ এই পঞ্চ তন্মাত্র হতে পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি স্বীকার করেছেন। তন্মাত্রগুলি আসলে সূক্ষ্মরূপ তথা অবিশেষ বা উপভোগযোগ্যহীন। পৃথক পৃথক তন্মাত্র হতে অথবা বিশেষ বিশেষ তন্মাত্রের অংশ নিয়ে এই ভূতসকলের নির্মাণ বলেই সাংখ্যের অভিমত (পূর্বে ২.৪.১০ দ্রষ্টব্য)। প্রবন্ধকার এই স্থলে এক অভিনব মন্তব্য করেছেন। তিনি মনে করেন সাংখ্যের তথা দর্শনশাস্ত্রের এই মহাভূতগুলি আসলে এক একটি পারিভাষিক নাম তথা ধারণা (concept) মাত্র– “ক্ষিতি–অপ্–তেজ–মরুৎ–ব্যোম্ এই পাঁচটি নামে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচিত জগতের কোন দ্রব্যকেই বুঝায় না। ঐগুলি কাল্পনিক সংজ্ঞা মাত্র– ইংরাজীতে যাহাকে concept বলে, মনঃকল্পিত নাম বলে তাহাই”।[৭২] প্রবন্ধকারের মতে বেদান্তদর্শনেও এই একইরূপে পাঁচটি সূক্ষ্ম ভূত হতে বিভিন্ন মাত্রায় যুক্ত হয়ে যে পঞ্চ স্থূলভূতের উৎপত্তি; সেইটিও ধারণা (concept) মাত্র– “বলা বাহুল্য, এই পাঁচটি স্থূল ভূতও সংজ্ঞা মাত্র, নাম মাত্র বা concept মাত্র। কেন না, ভৌতিক জগতে এমন কোন সামগ্রী পাওয়া যাইবে না, মাটি কাঠই বল, আর সোনা রূপাই বল, যাহার সম্বন্ধে জোর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, ইহাতে ঘ্রাণগুণ ঠিক আট আনা আর অন্যান্য গুণ ঠিক দুই আনা করিয়া আছে। তন্মাত্রগুলির মাত্রাপরিমাণ যখন দুঃসাধ্য বা অসাধ্য তখন কে বলিতে পারিবে যে দুধের ভিতর এতটা রূপ, এতটা রস, এতটা গন্ধ, এতটা স্পর্শ, এতটা শব্দ রহিয়াছে”।[৭৩]

পঞ্চমহাভূত– একটি Concept

ভূতসকলকে এইরূপে concept বলার পিছনে প্রবন্ধকারের দৃঢ় যুক্তি রয়েছে। তাঁর মতে, আকাশকে শব্দগুণাত্মক বলা হয় দর্শনে। এবার যদি এমন একটি পদার্থ কল্পনা করতে বলা হয় যেটি শুধুমাত্র শব্দই তৈরি করে, যার মধ্যে রূপ–রস–গন্ধ–স্পর্শ নাই– জগতে তা সত্যিই দুর্লভ। তথাপি দর্শনে যখন শব্দতন্মাত্রকেই আকাশ বলা হয়, তখন বুঝতে হবে শব্দের সাথেই আকাশের সম্পর্ক। এখানে মন্তব্য করা যেতে পারে, আকাশ বলতে অনেকে space এই বিষয়টিকেও বোঝেন এবং শব্দের সাথে এই space এর সম্পর্ক সুপরিচিত। তবে, প্রাবন্ধিকের যুক্তি এখানেও সমান বলবৎ হয় কেননা, space ও একপ্রকার ধারণাই, কোনও স্থূল বা প্রত্যক্ষলব্ধ পদার্থ নয়। মরুত্ বা বায়ুর ক্ষেত্রে এই যুক্তি আরও দৃঢ় হয়। দর্শনে শব্দ ও স্পর্শ তন্মাত্রই বায়ুর পরিচয়। অথচ বায়ু যে গন্ধও বহন করে সেকথা সকলেরই জানা। এস্থলে কেউ যদি আপত্তি তোলে, বায়ুর মধ্যে ঐ গন্ধ অন্য দ্রব্যের গন্ধ, তা মৃত্তিকা বা জল বা অন্য কণিকার থেকে জাত; তাহলে পরীক্ষাগারে ‘ক্লোরিন’ নামক গ্যাস তৈরি করে বৈজ্ঞানিক দেখিয়ে দেবেন ঐ ‘ক্লোরিন’ বায়বীয় পদার্থ, তার বিকট গন্ধ অথচ তাতে মৃত্তিকা বা জলের কণিকা মাত্র নেই। সুতরাং দর্শনের পারিভাষিক শব্দ হিসেবে স্বীকার করলেই দার্শনিকের সাথে আর বিবাদের প্রয়োজন থাকে না বলে প্রবন্ধকারের ধারণা– “আমি পরিভাষা তৈয়ার করিতে বসিয়াছি– আমার ইচ্ছামত শব্দ গড়িব ও তাহার যাহা ইচ্ছা নাম দিব– ইহাতে কারও আপত্তি ঘটিলে তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর”।[৭৪]

প্রবন্ধকারের যুক্তি

সাংখ্যের পঞ্চমহাভূত: Concept মাত্র –প্রবন্ধকারের hypothesis

প্রবন্ধকারের দৃঢ়বিশ্বাস সাংখ্যপ্রণেতাও এই পঞ্চমহাভূতকে ধারণা বা concept রূপেই সর্বপ্রথম উপস্থিত করেন। তাঁর সম্ভাব্য সূত্র (hypothesis) এইস্থলে উপস্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত হবে– "সাংখ্যদর্শনের পঞ্চ মহাভূতও বিধাতার সৃষ্টিতে নাই; উহা কপিল মুনি বা অন্য কোন মুনির মনে প্রথম সৃষ্ট হইয়াছিল। সেই মুনি কামনা করিলেন 'তাহারা হউক'– অমনি তাহারা বিনা বাক্যব্যয়ে 'হইল' এবং মুনি চাহিয়া দেখিলেন 'তাহারা উত্তম হইয়াছে'। উত্তম হইয়াছে, কেন না, ঐ কয়টি মশলা লইয়া তিনি স্থূল ভৌতিক জগৎ নির্মাণ করিতে বসিয়াছিলেন এবং তাহাতে সফল হইয়াছেন। স্থূল জগৎ রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দেরই সমষ্টি। এই পাঁচটি তন্মাত্র ভিন্ন আর কোন সামগ্রী জড় জগতে নাই; থাকিলেও তাহা জ্ঞানগম্য নহে এবং যাহা জ্ঞানগম্য নহে, তাহা নাস্তি। আর ক্ষিত্যাদি কল্পিত মহাভূতও তন্মাত্রের সমষ্টি; তবে কোন মহাভূতে একটি, কোন মহাভূতে দুটি, কোনটায় তিনটি, কোনটায় চারটি, কোনটায় বা পাঁচটি তন্মাত্র বিদ্যমান। অতএব, এই পাঁচটি মহাভূতকে উপাদানস্বরূপ গ্রহণ করিয়া বিবিধ পরিমাণে মিলাইয়া মিশাইয়া যাবতীয় ভৌতিক পদার্থ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। অত্র সন্দেহো নাস্তি"।[৭৫]

মনঃকল্পনা– বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক উভয়েরই

তাহলে কয়েকটা প্রশ্ন খুব স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসে যে, ধারণা বা মনঃকল্পনা কি শুধুমাত্র দার্শনিকেরই জায়গা? বৈজ্ঞানিক কি এই মনঃকল্পনার ধার ঘেষেন না? আর, ধারণা বা মনঃকল্পনা মানে কি সেটা অচল? প্রবন্ধকার এই সবকটি প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছেন। ভৌতিক জগতের কোনও প্রকার বিবরণ দিতে হলে সেক্ষেত্রে এই ধারণা বা মনঃকল্পনা নিয়েই বৈজ্ঞানিক হোক বা দার্শনিক সকলকেই কারবার করতে হয়। তিনি পদার্থবিজ্ঞান থেকে কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করেছেন যথা perfect solid, perfect fluid, frictionless surface, perfect rigid, inextensible string ইত্যাদি। তাঁর মতে, ঐগুলি এই জড় জগতে দুর্লভ তথাপি বৈজ্ঞানিককে জগদ্ব্যাপারে আলোচনায় ঐগুলির আশ্রয় নিতে হয়। একটি মজার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তিনি এই প্রসঙ্গে– "একখানি Statics এর বহিতে দেখিতেছিলাম, আঁক দেওয়া হইতেছে, suppose that an weightless elephant is sliding down a perfectly smooth hill surface– (অর্থাৎ) মনে কর, একটা ওজনহীন হাতী একটা তেলচুক্‌চুকে মসৃণ পাহাড়ের গা দিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে। এই ওজনহীন হাতী আর তেলচুক্‌চুকে গিরিগাত্র-বিধাতার সৃষ্টিতে কুত্রাপি মিলিবে না; ইহা বৈজ্ঞানিকরূপ বিশ্বামিত্রের মানস সৃষ্টিতে বিদ্যমান"।[৭৬]

মাত্রাগত ও গুণগত বিশ্লেষণ

অতএব, স্থূল জড় জগৎ বা পাঞ্চভৌতিক জগৎ পঞ্চভূতে নির্মিত– এটি সম্পূর্ণরূপে দার্শনিক বিশ্লেষণ। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাথে এর বিরোধ বা সমন্বয় নেই, তবে পার্থক্য আছে। বৈজ্ঞানিক মাত্রাগত বিশ্লেষণে (quantitative analysis) গুরুত্ব আরোপ করলেও দার্শনিক গুণগত বিশ্লেষণেই (qualitative analysis) তার বিচার অব্যাহত রাখেন। তার ফল হয় এই যে, প্রত্যক্ষলব্ধ একটি ভৌতিক পদার্থ পঞ্চভূত দ্বারা নির্মিত হলেও সেই দ্রব্যে ঠিক কতটা পরিমাণ (exact measure) ক্ষিতি, তেজ, বা বায়ুর অংশ আছে তা দার্শনিক তার গুণগত বিশ্লেষণে (qualitative analysis) নির্ধারণ করতে পারেন না। অপরদিকে বৈজ্ঞানিক তার মাত্রাগত বিশ্লেষণে (quantitative analysis) একটি ভৌতিক দ্রব্যের মোটা বিশ্লেষণে কখনই ক্ষান্ত হন না। ঐ দ্রব্যের মৌলিক উপাদানের নির্দিষ্ট মাত্রা নিরূপণেই তার শান্তি। প্রবন্ধকার আরও একবার

সতর্ক করেছেন, "উভয়ের (দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের) উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র- উভয়ের রীতি স্বতন্ত্র। বৈজ্ঞানিকের এলিমেন্ট আর দার্শনিকের ভূত উভয় শব্দের এক অর্থ, এক তাৎপর্য নহে। অতএব একালের পন্ডিতেরা আশিটা এলিমেন্ট আবিষ্কার করিয়াছেন (প্রবন্ধকারের সময়ে রসায়ন বিজ্ঞান ৮০টি মৌলিক পদার্থের সন্ধান করতে সক্ষম হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়) ও আরও করিতেছেন, আর সেকালের পন্ডিতেরা পাঁচটা ভূতেই সন্তুষ্ট ছিলেন, ষষ্ঠ ভূত কল্পনার চেষ্টা মাত্র করেন নাই, ইহাতে বিস্মিত, ক্ষুব্ধ, পরিতপ্ত বা শোকগ্রস্ত হইবার কোনই হেতু নাই"।[৭৭]

৫.৫. উপসংহার

কর্মী-পুরুষ যখন নীরবে ভীড় হতে দূরে নির্জনস্থলকে নিজের কর্মক্ষেত্ররূপে স্থির করেন তখন সেই স্থলে তিনি তার সবকিছু নিবেদন করে থাকেন। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক তথা সাহিত্যিক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ছিলেন বঙ্গজননীর এমনই একজন একনিষ্ঠ সেবক, যিনি সমস্ত প্রলোভন তুচ্ছ করে মাতৃভাষার প্রেমে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন।

প্রাবন্ধিক রামেন্দ্রসুন্দর দর্শনের তর্ক-বিতর্কে নাকি বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নাকি সাহিত্যের প্রসাদ-মাধুর্যতায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তা নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা হতে পারে। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না, বিজ্ঞানকে তিনি উপরের খোলস থেকে দেখেননি; দেখেছেন নিজ বিশ্বাস-অবিশ্বাস তথা আনন্দ-নিরানন্দের সাথে মিলিয়ে। অন্যদিকে দর্শন তাঁর কাছে কেবল 'কথার মারপ্যাঁচ' নয়, তা বৈজ্ঞানিক সত্যবিচারের মঞ্চ (platform)। আর এই দুই পথে তিনি হেঁটে গেছেন সাহিত্যসুধা বর্ষণের মধ্যে দিয়ে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যথার্থ বলেছেন, "দর্শনই হউক বা বিজ্ঞানই হউক, ইতিহাসই হউক বা প্রত্নতত্ত্বই হউক- রামেন্দ্রবাবু যাহা লিখিতেন, তাহা যে শুধু প্রাঞ্জল হইত এমন নয়, সত্য সত্যই তাহার মধুরতায় প্রাণকে জল করিয়া দিত, পড়িতে কবিতার মত বোধ হইত, কল্পনায় মাখামাখি থাকিত, রসে ও ভাবে ভোর করিয়া দিত"।[৭৮]

চর্চায় অভিনবত্ব ও সূক্ষ্মতা থাকলে যেকোনও মাপের চর্চা যেকোনও ভাষায় সম্ভব- এর দৃষ্টান্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়। বিশেষত আজকের মাতৃভাষা অবহেলার যুগে, আজীবন বাংলা ভাষার চর্চায় অসামান্য প্রবন্ধরাশির প্রস্তুতকারক, মাতৃভাষার এমন বিরল একনিষ্ঠ সাধক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে নতমস্তকে প্রণাম।

@@@@@

উল্লেখপঞ্জি

[১] বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, *পথিকৃৎ রামেন্দ্রসুন্দর*, পৃ. ১৮৬

[২] আশুতোষ বাজপেয়ী, *রামেন্দ্রসুন্দর*, পৃ. ৩২

[৩] অপূর্বকৃষ্ণ ঘোষ, *আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর*, পৃ. ১৪

[৪] বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৮

[৫] তত্রৈব

[৬] অপূর্বকৃষ্ণ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১

[৭] রামেন্দ্র রচনাবলী (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সং), ২য় খন্ড, ভূমিকা, পৃ. ২

[৮] অপূর্বকৃষ্ণ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩

[৯] অধীর দে ,*বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা*, পৃ. ৭৭৩

[১০] He had gladly accepted the Orientalist verdict of the uniqueness and excellence of the vedic-vedantic-sanskritic spiritual legacy and now sought his moorings therein, striving at the same time to adapt this legacy to the challenges of modern world. (Santanu Chacraverti, "Ramendrasundar Trivedi: A Pathbreaking populariser of Science in Bengal", *Uncharted Terrains*, p. 76)

[১১] রামেন্দ্র রচনাবলী (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সং), ১ম খন্ড, পৃ. ৩৩০

[১২] *তদেব*, পৃ. ৩২৯

[১৩] *তদেব*, পৃ. ৪৪

[১৪] প্রোক্তং তদ্ব্যক্তমিত্যেব জায়তে বর্ধতে চ যত্।

জীর্যতে ম্রিয়তে চৈব চতুর্ভির্লক্ষণৈর্যুতম্।।

বিপরীতমতো যত্তু তদব্যক্তমুদাহৃতম্। (*বৈয়াসিক-মহাভারতম্* ১২/২৩৬/৩০-৩১)

[১৫] রামেন্দ্র রচনাবলী (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সং), ১ম খন্ড, পৃ. ৪৫

[১৬] তত্রৈব

[১৭] *তদেব*, পৃ. ৪৬

[১৮] *তদেব*, পৃ. ৪৭

[১৯] তত্রৈব

[২০] Cones are one type of photoreceptor, the tiny cells in the retina that respond to light. Most of us have six to seven million cones…Not all of these cones are alike. About sixty-four percent of them

respond most strongly to red light, while about a third are set off the most by green light. Another two percent respond strongest to blue light. (www.livescience.com/amp/32559-why-do-we-see-in-color.html)

[২১] রামেন্দ্র রচনাবলী (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সং), ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮

[২২] https://www.scientificamerican.com/article/seeing-without-eyes/

[২৩] একজন ব্রিটিশ দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ। জন্ম–১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ, মৃত্যু–১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ। উল্লেখযোগ্য রচনা– *Elements of Dynamic, Seeing and Thinking, The Common Sense of Exact Sciences* ইত্যাদি। [www.britannica.com/biography/William-Kingdon-Clifford]

[২৪] https://global.widex.com/en/blog/human-hearing-range-what-can-you-hear

[২৫] রামেন্দ্র রচনাবলী (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সং), ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০

[২৬] *তদেব,* পৃ. ৫১

[২৭] Natural selection is the process through which populations of living organisms adapt and change. (www.nationalgeographic.org/encyclopedia/natural-selection)

[২৮] রামেন্দ্র রচনাবলী (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সং), ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২

[২৯] আফ্রিকা–নিবাসী কোন অসভ্য জাতির মধ্যে অদ্ভুত সৃষ্টিতত্ত্ব প্রচলিত আছে। চাঁদ ও ব্যাঙের মধ্যে বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়া জগতের সৃষ্টি–ঘটনাটা সমাহিত হইয়া যায়; তবে উভয়ের বিরোধের ফলে সৃষ্ট জগৎটা সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। [রামেন্দ্র রচনাবলী (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সং), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৯]

[৩০] চাঁদের ও ব্যাঙের স্থলে আর দুইটা প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করিলে এই সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত বিজ্ঞানানুমোদিত আর একরকম সৃষ্টিতত্ত্বের বড় বৈষম্য দেখা যায় না। বিবাদ ঘটিয়াছিল ঈশ্বরে আর শয়তানে; ফলভাগী হইয়াছে দুর্ভাগা মানুষ। (তত্রৈব)

[৩১] তত্রৈব

[৩২] *প্রশ্নোপনিষদ্* ১/৩

[৩৩] তস্মৈ স হোবাচ প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা স মিথুনমুৎপাদযতে। রযিং চ প্রাণং চেত্যেতৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি। (*প্রশ্নোপনিষদ্* ১/৪)

[৩৪] *প্রশ্নোপনিষদ্* ৬/২–৪

[৩৫] সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, *উপনিষদের কথা*, পৃ.৫৬

[৩৬] *মুণ্ডকোপনিষদ্* ২/১/৩ (এতস্মাজ্জাযতে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ/খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী)

[৩৭] *তৈত্তিরীয় উপনিষদ্* ২/১/১ (তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সংভূতঃ। আকাশাদ্বাযুঃ। বাযোরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্‌ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধযঃ। ওষধীভ্যোঽন্নম্। অন্নাত্ পুরুষঃ।)

[৩৮] রামেন্দ্র রচনাবলী (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সং), ১ম খন্ড, পৃ. ১৯০

[৩৯] *তদেব,* পৃ. ১৯২

[৪০] তত্রৈব

[৪১] তত্রৈব

[৪২] তত্রৈব

[৪৩] *তদেব,* পৃ. ১৯৩

[৪৪] তত্রৈব

[৪৫] Belgian priest named Georges Lemaître first suggested the big bang theory in the 1920s, when he theorized that the universe began from a single primordial atom [Michael Greshko, *Origins of the universe, explained*, National Geographic, published Jan 18, 2017 (https://www.nationalgeographic.com/science/space/universe/origins-of-the-universe.html)]

[৪৬] Ram Brustein and Judy Kupferman, History and Philosophy of the Life Sciences, Vol. 34, No. 3, pp. 361-372

[৪৭] রামেন্দ্র রচনাবলী (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সং), ১ম খন্ড, পৃ. ১৯৩

[৪৮] *তদেব,* পৃ. ১৯৪

[৪৯] অস্মত্প্রত্যযগোচরে বিষযিণি চিদাত্মকে যুষ্মত্প্রত্যযগোচরস্য বিষযস্য তদ্ধর্মাণাং চ অধ্যাসঃ, তদ্বিপর্যযেণ বিষযিণঃ তদ্ধর্মাণাং চ বিষযে অধ্যাসঃ... (*বেদান্তদর্শন*, ১/১/১, অধ্যাসভাষ্য)

[৫০] রামেন্দ্র রচনাবলী (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সং), ১ম খন্ড, পৃ. ১৯৪

[৫১] *তদেব,* পৃ. ১৯৫

[৫২] *তদেব,* পৃ. ১৯৬

[৫৩] *তদেব,* পৃ. ১৯৭

[৫৪] *তদেব,* পৃ. ১৯৮

[৫৫] *তদেব,* পৃ. ১৬৫

[৫৬] *তদেব,* পৃ. ১৬৬

[৫৭] তত্রৈব

[৫৮] *তদেব,* পৃ. ১৬৭

[৫৯] *তদেব,* পৃ. ১৬৮

[৬০] তত্রৈব

[৬১] *তদেব,* পৃ. ১৭১

[৬২] যুষ্মদস্মত্প্রত্যযগোচরযোঃ বিষযবিষযিণোঃ তমঃপ্রকাশবদ্বিরুদ্ধস্বভাবযো ইতরেতরভাবানুপপত্তৌ সিদ্ধাযাং তদ্ধর্মাণামপি সুতরাম্ ইতরেতরভাবানুপপত্তিঃ... [*ব্রহ্মসূত্র,* ১/১/১, অধ্যাসভাষ্য]

[৬৩] রামেন্দ্র রচনাবলী (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সং), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭১

[৬৪] *তদেব,* পৃ. ১৭২

[৬৫] সকল বস্তু চেতন হইলেও, অন্তঃকরণের মাধ্যমেই চৈতন্যের উপলব্ধি (অভিব্যক্তি) হয়, ইহাই বস্তুর স্বভাব। ঘটাদি বস্তুতে অন্তঃকরণ নাই, সেইহেতু সেইসকলে চৈতন্যের উপলব্ধি হয় না, যদিও তাহারা চেতন। যেমন পুরুষ চেতন হইলেও সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাতে তাহার অন্তঃকরণ বিলীন হইয়া যায় বলিয়া তাহার চৈতন্য (জ্ঞান) ইচ্ছা ও প্রযত্ন প্রভৃতি উপলব্ধ হয় না। কাষ্ঠাদিতেও এইপ্রকার বুঝিতে হইবে। [স্বামী বিশ্বরূপানন্দ (সম্পা.), *বেদান্তদর্শনম্,* ২য় অধ্যায়, ভাবদীপিকা ব্যাখ্যা, পৃ.৩৩]

[৬৬] রামেন্দ্র রচনাবলী (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সং), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭২

[৬৭] *তদেব,* পৃ. ১৭৪

[৬৮] *তদেব,* পৃ. ৩২৭

[৬৯] *তদেব,* পৃ. ৩২৯

[৭০] *তদেব,* পৃ. ৩৩০

[৭১] *তদেব,* পৃ. ৩৩১

[৭২] *তদেব,* পৃ. ৩৩৭

[৭৩] *তদেব,* পৃ. ৩৪০

[৭৪] *তদেব,* পৃ. ৩৩৬

[৭৫] *তদেব,* পৃ. ৩৩৮

[৭৬] তত্রৈব

[৭৭] *তদেব,* পৃ. ৩৪১

[৭৮] নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, *আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর,* পৃ. ২৭

ж ж ж ж ж

ষষ্ঠ অধ্যায়

ষড়্‌দর্শনের মধ্যে সাংখ্যের ন্যায় গভীর যুক্তিপূর্ণ মূলতত্ত্বসম্বন্ধীয় বিচার অন্য কোন দর্শনশাস্ত্রে নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাংখ্যের প্রকৃত মত বুঝেন বা বুঝাইতে পারেন, এমন পণ্ডিত বিরল। – উমেশচন্দ্র বটব্যাল, *সাংখ্যদর্শন*

বাঙালির সাংখ্যচর্চার ইতিবৃত্ত

The Sāṁkhya holds a unique place in the history of Hindu thought, and is in many ways remarkable for the depth and subtlety of its criticism of human experience, besides possessing a peculiar terminology of its own.
– Nandalal Sinha, Forward, *The Sāṁkhya-Pravachana-Sūtram*

৬.০. ভূমিকা

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে দেখা যাবে প্রায় সবকটি প্রধান সারির দর্শনের একজন প্রবর্তক রয়েছেন। যেমন, সাংখ্যদর্শনের প্রবর্তকরূপে মহর্ষি কপিল, যোগদর্শনের প্রবর্তকরূপে মহর্ষি পতঞ্জলি, ন্যায়দর্শনের প্রবর্তকরূপে মহর্ষি গৌতমের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ এইসব মহান চিন্তাবিদ্‌দের এক একজনের চিন্তা থেকেই এক একটি দর্শনের মূল চিত্রপটটি উপস্থাপিত হয়েছে। তবে মজার ব্যাপার এই যে, ঐসকল প্রবর্তকেরা তাদের প্রাথমিক খসড়াতে 'কপিরাইট' বসিয়ে যাননি। ফলত পরবর্তীকালে, অনুগামী, আলোচক, সমালোচক, পক্ষ, প্রতিপক্ষ সকলেই বিন্দু বিন্দু করে মতের আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়ে এই সুবিশাল দর্শন-সিন্ধু নির্মাণ করেছেন।

সাংখ্যদর্শনের ক্ষেত্রে একথাটি খুবই প্রযোজ্য। মহর্ষি কপিলকেই এই দর্শনের প্রবর্তক বলে মনে করা হয়। একথা সত্য যে, তাঁর চিন্তাসূত্রের প্রকৃত সুগ্রথিত রূপ অদ্যাবধি উপলব্ধ হয়নি। কিন্তু তাতে কী? ভারতীয় দর্শন কোনও ব্যক্তিদর্শন নয়; এ হল পরম্পরা বা সম্প্রদায় এর দর্শন। তাই সাংখ্যপ্রবর্তকের চিন্তার সূত্র পরবর্তীকালে সম্প্রদায়ের বিবিধ প্রাণপুরুষগণ যুক্তি-তর্কের মধ্যে দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন এবং কালের পরম্পরায় কারিকা, টীকা, টিপ্পনী, ভাষ্য, অনুবাদ, আলোচনা, সমালোচনা, প্রবন্ধ, উদ্ধৃতি ইত্যাদি বহু শাখা-প্রশাখা-পুষ্প-পল্লবে বিকশিত হয়ে উঠেছে সাংখ্যতরুটি।

৬.১. ধারণার ধারাভাষ্যে উত্তরণ

সুপ্রাচীন উপনিষদের সময় থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সময় জুড়ে সাংখ্যের মূল ধারণাটির উত্তরণ ঘটেছে ধারাভাষ্যের মধ্যে দিয়ে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কারিকাকার, টীকাকার, ভাষ্যকার, প্রবন্ধকার, সমালোচক তাদের ভাষ্যস্রোতে সাংখ্যধারাকে বহমান রেখেছেন। সাংখ্যদর্শনের ঐ প্রবাহে যে সমস্ত বাঙালি মনীষা তাদের মূল্যবান যোগদান রেখে গেছেন টীকা, টিপ্পনী, ভাষ্য, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনার মধ্যে দিয়ে; তাঁদের সাংখ্যচর্চার পরিধিটির উপর আলোকপাতের প্রয়াস হয়েছে এই অধ্যায়ে।

সাংখ্যের প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে ঈশ্বরকৃষ্ণপ্রণীত *সাংখ্যকারিকা*ই সর্বাধিক স্বীকৃত। তবে *সাংখ্যপ্রবচন সূত্র* বা *তত্ত্বসমাস সূত্র*কেও কেউ কেউ প্রামাণ্য স্বীকার করেছেন। অবশ্য ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের থেকে বঙ্গদেশের বেশির ভাগ পন্ডিত সাংখ্যসূত্রকে সাংখ্যদর্শনের প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে স্বীকার করেন না। *Encyclopedia of Indian Philosophies* এর চতুর্থ খন্ডে এই বিষয়ে স্পষ্টতই উল্লেখ করা হয়েছে "This is true everywhere in India in recent centuries but especially so in Bengal, where many pandits refuse to take the *Sāṁkhyasūtra* or Vijñānabhikṣu's work as a serious Sāṁkhya Text"।[১]

অবশ্য এরকমটি হওয়ার অন্যতম কারণ সম্ভবত বাচস্পতি মিশ্রের *সাংখ্যকারিকার* উপর টীকা প্রণয়ন। বাচস্পতি মিশ্র অন্যান্য দর্শনের মতো সাংখ্যদর্শনের উপরও টীকা রচনা করেন। এতে সাংখ্য পরম্পরাটি একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন দর্শনরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য এই যে, যেহেতু বাচস্পতি মিশ্র সাংখ্যসূত্রের উপর টীকা প্রণয়ন করেননি; *সাংখ্যকারিকার* টীকা রচনা করেছিলেন, সেই দৃষ্টিকোণ থেকেও অনেক পন্ডিত বাচস্পতি মিশ্রকে আপ্ত স্বীকার করে *সাংখ্যকারিকার* প্রামাণ্যেই সওয়াল করেছেন।

স্বাভাবিক ভাবেই, বঙ্গদেশের পন্ডিতেরা সাংখ্যচর্চা করতে গিয়ে ঈশ্বরকৃষ্ণের *সাংখ্যকারিকা* ও বাচস্পতি মিশ্রের *তত্ত্বকৌমুদীর* উপর বিশ্লেষণী ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে এরসাথে *সাংখ্যসূত্র* বা *তত্ত্বসমাস সূত্রের* উপরও আলোচনা করেছেন। তাই বাঙালি মনীষার সাংখ্যচর্চায় টীকা-অনুবাদ-প্রবন্ধ-মৌলিকগ্রন্থ রূপ যে ফসল, তা সবই কারিকা-সাংখ্য, কৌমুদী-সাংখ্য ও সূত্র-সাংখ্যের জমির উপর ভিত্তি করে।

এই রচনাগুলিকে মোটামুটিভাবে তিনটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে-

- সংস্কৃত ভাষায় রচিত ভাষ্য, টীকা, টিপ্পনী, ও মৌলিক গ্রন্থ
- বাংলা ভাষায় রচিত অনুবাদ, ব্যাখ্যা, প্রবন্ধ, ও সম্পাদিত গ্রন্থ
- ইংরাজি ভাষায় রচিত অনুবাদ, প্রবন্ধ ও আলোচনামূলক গ্রন্থ

৬.১.১. সংস্কৃত ভাষায় রচিত ভাষ্য, টীকা, টিপ্পনী ও মৌলিক গ্রন্থ

প্রথমেই আসা যাক সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলির সম্পর্কে। বেশির ভাগ গ্রন্থই টীকা-টিপ্পনী মূলক। ঈশ্বরকৃষ্ণের *সাংখ্যকারিকা*, ও বাচস্পতি মিশ্রের *তত্ত্বকৌমুদীর* উপরই অধিকাংশ টীকা রচিত। এর যথাযথ কারণ বলা না গেলেও, অনুমান করা চলে, ঈশ্বরকৃষ্ণের 'সাংখ্যকারিকা' ও তার উপর রচিত বাচস্পতি মিশ্রের 'তত্ত্বকৌমুদী' টীকাকেই বঙ্গদেশের বেশির ভাগ টীকাকার 'অথেন্টিক' বলে মনে করতেন। *Encyclopedia of Indian Philosophies* এর চতুর্থ খন্ডে এই প্রসঙ্গে সম্ভাব্য দিগ্‌নির্দেশের প্রচেষ্টা করা হয়েছে- "Vacaspati, of course, composed a variety of commentaries, on many of the older schools of Indian philosophy (including Nyāya, Mīmāṁsā, Yoga, and Vedānta), but his work on Sāṁkhya is especially significant in the sense that it triggered a subsequent commentarial Sāṁkhya tradition that reaches down to the present day…"।[২] অবশ্য *সাংখ্যসূত্র* ও *সাংখ্যসূত্রবৃত্তির* উপরও বেশ কিছু টীকা-টিপ্পনী রচিত হয়েছিল।

সাংখ্যকারিকার উপর রঘুনাথ তর্কবাগীশ রচনা করেন *সাংখ্যতত্ত্ববিলাস* বা *সাংখ্যবৃত্তিপ্রকাশ* নামের টীকাটি। *সাংখ্যার্থসংখ্যায়িকা* নামেও এই টীকাটি পরিচিত। এই টীকার প্রারম্ভে তিনি *তত্ত্বসমাসসূত্র* সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন ও তারপর *সাংখ্যকারিকার* ব্যাখ্যা আরম্ভ করেছেন। সম্ভবত, সাংখ্য পরম্পরাটিকে তিনি নির্দেশ করতে চেয়েছেন।[৩] উনবিংশ

রঘুনাথ তর্কবাগীশ

শতকেই টীকাটির রচনা বলে অনুমান করা হয়। পন্ডিত রঘুনাথ তর্কবাগীশের ব্যক্তিপরিচয় বিশেষ কিছু উপলব্ধ হয় না। তবে, *আগম-তত্ত্ব-বিলাসঃ* নামে তন্ত্রের একটি অসামান্য গ্রন্থের রচয়িতা হিসেবেও তাঁর নাম প্রসিদ্ধ। পঞ্চানন শাস্ত্রী মহাশয় *আগম-তত্ত্ব-বিলাসঃ* সম্পাদনা করতে গিয়ে ভূমিকাংশে লিখেছেন "এই গ্রন্থকার নপাড়া গ্রাম বাস্তব্য। মৈমনসিংহের সুষঙ্গ পরগণায় অনেক নপাড়া আছে। তাঁহার কোনটিকে তিনি অলংকৃত করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। আমি বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারি নাই"।[৪] অবশ্য *আগম-তত্ত্ব-বিলাস* গ্রন্থে, রঘুনাথ তর্কবাগীশ তাঁর পূর্ব পুরুষদের নামোল্লেখ করেছেন, তিনি ছিলেন সর্বানন্দ বংশীয় ও শিবরামের পুত্র।

বাচস্পতি মিশ্রের *তত্ত্বকৌমুদীর* উপর তারানাথ তর্কবাচস্পতি রচনা করেন *উপোদ্‌ঘাত* নামের টিপ্পনী। *New Catalogus Catalogorum* এ এই টিপ্পনীর উল্লেখ রয়েছে *বৃত্ত্যুপোদ্‌ঘাত* নামে। নাম থেকেই বোঝা যায় এটি উপোদ্‌ঘাত স্বরূপ, সম্পূর্ণ টীকা নয়। তর্কবাচস্পতি মহাশয় সম্ভবত তার পাঠার্থীদের প্রয়োজনেই এই উপোদ্‌ঘাতের (introductory notes) রচনা করেছিলেন। অসৎকার্যবাদ, বিবর্তনবাদ, বুদ্ধিন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, পুরুষ সম্পর্কে আলোচনা আছে এই অংশে।[৫]

তারানাথ তর্কবাচস্পতি

তারানাথ তর্কবাচস্পতি তৎকালীন বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কালনার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমকালীন একজন যথার্থ পন্ডিত ব্যক্তি। ব্যাকরণ, ন্যায়, কাব্য সবেতেই ছিল তাঁর দক্ষ বিচরণ। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকের পদও অলংকৃত করেছিলেন তিনি। সেখানেই তিনি 'তর্কবাচস্পতি' উপাধি লাভ করেন। প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার মানুষ ছিলেন বলেই তৎকালীন সময়ে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। অবশ্য কেবলমাত্র বিদ্যাচর্চায় তিনি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, পাশাপাশি ব্যবসাতেও তাঁর দক্ষতা ছিল সমান রকম। অনেকেই তাঁকে 'বিদ্যাবণিক' সম্বোধন করতেন তাঁর এই বিদ্যাবত্তা ও বণিকসত্তার অপূর্ব মেলবন্ধনের দিকে দৃষ্টি রেখে।

তত্ত্বসমাসসূত্রের উপর নরেন্দ্রনাথ তত্ত্বনিধি রচনা করেন *তত্ত্বসমাসভাষ্য*। ঊনবিংশ শতকের শেষদিক এই ভাষ্য রচনার কাল বলে অনুমান করা চলে। যোগের ধারণার সাথে যে তিনি অত্যন্ত সুপরিচিত ছিলেন, সেই বিষয়টি তাঁর ভাষ্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয়।[৬] লেখকের ব্যক্তিপরিচয় বিশেষ উপলব্ধ নয়।

নরেন্দ্রনাথ তত্ত্বনিধি

অনিরুদ্ধের *সাংখ্যসূত্রবৃত্তির* উপর প্রমথনাথ তর্কভূষণ রচনা করেন *অমলা* নামের ভাষ্যটি। মূলত পাঠার্থীদের প্রাথমিক জ্ঞানের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে এই ভাষ্য বিন্যস্ত হয়েছিল। যেকারণেই, নব্য–ন্যায়ের শৈলী থেকে এই ভাষ্য ছিল মুক্ত।[৭] তর্কভূষণ মহাশয় ভাষ্য রচনার প্রারম্ভে পঞ্চদশ শতাব্দীকেই অনিরুদ্ধের সময়কাল রূপে নির্দেশ করেছেন ও তারপর ভাষ্য রচনায় অগ্রসর হয়েছেন।

প্রমথনাথ তর্কভূষণ

প্রমথনাথ তর্কভূষণ ছিলেন প্রখ্যাত পন্ডিত তারাচরণ তর্করত্নের পুত্র ও অবিভক্ত বাংলার চব্বিশ পরগণার বাসিন্দা। ন্যায়, বেদান্ত, মীমাংসা, সাংখ্য দর্শনের সবকটি শাখাতেই তাঁর ছিল অগাধ পান্ডিত্য। কর্মজীবনে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক রূপে যোগদান করেছিলেন ও পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথেও যুক্ত হন। বহু সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ করেন ও অনেক বাংলা গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন। বিদ্যাবত্তার কারণে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত হন।

বাচস্পতি মিশ্রের *তত্ত্বকৌমুদীর* উপর কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন রচনা করেন *আবরণবারিণী* নামের টিপ্পনী। *তত্ত্বকৌমুদীর* উপর রচিত এই টিপ্পনীতে অতিরিক্ত কথা নেই, তবে শৈলীটি ন্যায়ের। সাংখ্যের পাঠার্থীদের প্রাথমিক জ্ঞানের প্রয়োজন মেটাতে সরল সংস্কৃতে লেখা এটি একটি উপাদেয় টিপ্পনী।[৮] বিংশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে এই টিপ্পনীর রচনাকাল।

কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন

কৃষ্ণনাথ পঞ্চানন ছিলেন নবদ্বীপের স্বনামধন্য পন্ডিত। ব্যাকরণ, কাব্য, মীমাংসা, স্মৃতি ইত্যাদি শাস্ত্রে ছিল তাঁর অগাধ পান্ডিত্য। বহুকাল অবধি তিনি নবদ্বীপের প্রধান স্মার্ত রূপে বিবেচিত হয়েছেন। বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা টিপ্পনী সহ সংস্করণ প্রকাশে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য।

পঞ্চানন তর্করত্ন

বাচস্পতি মিশ্রের *তত্ত্বকৌমুদীর* উপর পঞ্চানন তর্করত্ন রচনা করেন *পূর্ণিমা* নামের টিপ্পনী। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিক এই টিপ্পনীর রচনাকাল। বাচস্পতি মিশ্রের বক্তব্যের পুনর্কথনই এই টিপ্পনীর বৈশিষ্ট্য তবে নব্য ন্যায়ের ভাষার মধ্যে দিয়ে। অন্যান্য দার্শনিকদের মতো তিনিও সাংখ্যসূত্র ও সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যকে সাংখ্যের প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে স্বীকার করেননি।[৯] পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় ভাটপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন। অতি অল্প বয়স থেকেই তিনি সংস্কৃতে বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দেন। পরবর্তীকালে ভাটপাড়া চতুষ্পাঠী ও বঙ্গবাসী কলেজে তিনি অধ্যাপনা করেন। দর্শনশাস্ত্রের বহু গ্রন্থের অনুবাদ যেমন করেছেন তেমনই অনেক গ্রন্থ রচনাও করেছেন। শাক্তদর্শনে তার বিশেষ দক্ষতা ছিল। বেদান্তদর্শনের *শক্তিভাষ্য* প্রণয়ন করে তিনি বেদান্ত ব্যাখ্যায় এক নতুন দিকের সূচনা করেন।

কুঞ্জবিহারী তর্কসিদ্ধান্ত

শ্রীমৎ অনিরুদ্ধের *সাংখ্যসূত্রবৃত্তির* উপর কুঞ্জবিহারী তর্কসিদ্ধান্ত রচনা করেন *তত্ত্ববোধিনী* নামক টীকা। প্রথাগত হলেও এই টীকা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। *সাংখ্যসূত্রবৃত্তিতে* যে স্থলগুলি অপেক্ষাকৃত কম ব্যাখ্যা হয়েছে, সেই ক্ষেত্রগুলি ব্যাখ্যাত হয়েছে *তত্ত্ববোধিনী* টীকায়।[১০] কুঞ্জবিহারী তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় ঢাকা, বাংলাদেশের মেদিনীমণ্ডলের বাসিন্দা ছিলেন। কাব্য, ব্যাকরণ ও ন্যায়ের প্রাথমিক পাঠ সম্পূর্ণ করে তিনি কাশী গমন করেন ও প্রাচীন ন্যায় এবং নব্য ন্যায়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ঢাকার সারস্বত সমাজে ন্যায়ের পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে 'তর্কসিদ্ধান্ত' উপাধি লাভ করেছিলেন। ভাষা পরিচ্ছেদ, সাংখ্যদর্শন ইত্যাদি গ্রন্থসমূহ সুযোগ্য হস্তে সম্পাদন করেন।

রমেশচন্দ্র তর্কতীর্থ

বাচস্পতি মিশ্রের *তত্ত্বকৌমুদীর* উপর রমেশচন্দ্র তর্কতীর্থ রচনা করেন *গুণময়ী* নামক টিপ্পনী এবং বিজ্ঞানভিক্ষুর *সাংখ্যসারের* উপর রচনা করেন *বিবেকপ্রদীপ* টীকা। *গুণময়ী* টিপ্পনীটি তাঁর মায়ের নামানুসারে দেওয়া বলে মনে করা হয়। *তত্ত্বকৌমুদীর* উপর রচিত এই টিপ্পনী নব্য–ন্যায়ের ভাষাতেই লেখা।[১১] রমেশচন্দ্র তর্কতীর্থ মহাশয় ত্রিপুরার বাসিন্দা ছিলেন। পিতা ছিলেন চন্দ্রকুমার ও মাতা গুণময়ী দেবী। কলাপ ব্যাকরণ, কাব্য ও ন্যায়শাস্ত্রের প্রাথমিক পাঠের পর তিনি সাংখ্য, বেদান্ত ও মীমাংসা শাস্ত্রের পরীক্ষাতেও সাফল্য লাভ করেন। ন্যায়রত্ন, সিদ্ধান্তবাগীশ, বেদান্তবাগীশ ইত্যাদি বিবিধ উপাধিতে ভূষিত হন অসামান্য পাণ্ডিত্যের জন্য।

কালীপদ তর্কাচার্য

বিজ্ঞানভিক্ষুর *সাংখ্যসারের* উপর কালীপদ তর্কাচার্য রচনা করেন *সারপ্রভা* টীকা। টীকাকার টীকা রচনাকালে পূর্বভাগের বিভাগটি নিজের মতো করেছেন তবে উত্তরভাগের বিভাগটিতে বিজ্ঞানভিক্ষুকে অবলম্বন করেছেন।[১২] কালীপদ তর্কাচার্য ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও সংস্কৃত ভাষা–সাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ গবেষক। সরল সংস্কৃতে বার্তালাপে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বহু কাব্য, নাটক ও শাস্ত্রগ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলির সংস্কৃতে অনুবাদ নিঃসন্দেহে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

হরিহরানন্দ অরণ্য

সাংখ্য মত অবলম্বনে স্বামী হরিহরানন্দ অরণ্য রচনা করেন মৌলিক গ্রন্থ *সাংখ্যতত্ত্বালোক*। সাংখ্য যোগ পরম্পরায় ৭২টি পরিচ্ছেদে রচিত হয়েছে এই মৌলিক গ্রন্থটি। গ্রন্থের প্রারম্ভেই চন্দ্রের উজ্জ্বল দীপ্তি ও রাহুর গ্রাসের অসাধারণ একটি উপমার সাহায্যে, তিনি কালের করালগ্রাস প্রাপ্ত সাংখ্যশাস্ত্র ও তার প্রণেতা মহর্ষি কপিলকে বন্দনা করেছেন–

যথা কলাবশিষ্টোঽপি শশী রাজত্যুপপ্লুতঃ।
তারকাদখিলাত্ সম্যক্ প্রোজ্জ্বলশ্চ তমোপহঃ।।
কালরাহুসমাক্রান্তমপি তদ্বদ্বিভাতি যত্।
সর্বতীর্থেষু শাস্ত্রস্য বক্তারং কপিলং নুমঃ।।

অর্থাৎ অন্ধকার নাশক চন্দ্র যেমন রাহুর গ্রাসে গ্রসিত হয়েও আকাশের সমস্ত তারার চেয়ে উজ্জ্বলরূপে প্রতীত হয়, তেমনই কাল রূপ রাহুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েও যে শাস্ত্র অন্য সকল শাস্ত্রাপেক্ষা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে, সেই সাংখ্যশাস্ত্র ও তার বক্তা মহর্ষি কপিলকে নমস্কার।[১৩] স্বামী হরিহরানন্দকে মোটামুটিভাবে স্বামী বিবেকানন্দের সমকালীন বলা চলে। স্বচ্ছল বাঙালি পরিবারে জন্মালেও 'মাছে-ভাতে'র সুখী বাঙালিজীবন তার অভীষ্ট ছিল না, তাই তিনি বেছে নেন সন্ন্যাসের পথ। কাশীতে মোক্ষ শাস্ত্রে গভীর অধ্যয়নের পর বিহারের 'বরাবর গুহা'তে (Barabar Cave) সাধনায় রত হন। সাংখ্যের চর্চায় যে ঋষিরা নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন, তিনি ছিলেন সম্ভবত শেষ পুরুষ। J. N. Farquahar তাঁর *The Religious Quest of India* গ্রন্থে লিখেছেন "Samkhya Sannyasins are so rare that it is of interest to know that as early as 1912 a learned Samkhya-Yogi named Hariharananda was alive and teaching in Calcutta"।[১৪]

এমনকি সাংখ্যদর্শনের বিবিধ দিক অবলম্বন করে যারা সংস্কৃত ভাষায় তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ রচনা করেছেন, তাদের মধ্যে বিধুভূষণ ন্যায়তর্কতীর্থ (ভট্টাচার্য), বেণুধর তর্কতীর্থ, আশুতোষ ন্যায়াচার্য, শরচ্চন্দ্র খাঁ, নিখিলেশ চক্রবর্তী, দীননাথ ত্রিপাঠী, সুরমা মিত্র প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিধুভূষণ ন্যায়তর্কতীর্থ তাঁর রচিত "দার্শনিকসিদ্ধান্তে ভেদবীজত্রযম্" প্রবন্ধে সাংখ্যের পরিণামবাদ ও সত্কার্যবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কার্য-কারণ সম্বন্ধ বিচার করার সময় প্রতিপক্ষরূপে ন্যায় ও বেদান্তকে উল্লেখ করেছেন। আলোচনার শেষে সাংখ্যের পরিণামবাদেই উপসংহার করেছেন।[১৫] বেণুধর তর্কতীর্থ তাঁর রচিত "প্রকৃতিলক্ষণম্" প্রবন্ধে জগদীশ তর্কালংকারের *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা* গ্রন্থে উল্লিখিত প্রকৃতির দুটি লক্ষণ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।[১৬] আশুতোষ ন্যায়াচার্য তাঁর রচিত "জৈনদর্শনে সাংখ্যাদিদর্শনসাম্যম্" প্রবন্ধে সাংখ্যাচার্যদের কার্য-কারণ ব্যবস্থাটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন।[১৭] শরচ্চন্দ্র খাঁ রচিত "বেদান্তে সাংখ্যাধিক্ষেপ-পরতানিরাসঃ" প্রবন্ধে[১৮], দীননাথ ত্রিপাঠী রচিত "বিভিন্নশাস্ত্রপ্রস্থানানাং মুক্তিতদুপাযৌ" প্রবন্ধে[১৯] ও সুরমা মিত্র রচিত "সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ" প্রবন্ধে[২০] সাধারণভাবে সাংখ্য ও সাংখ্য-সম্পর্কিত আলোচনার অবতারণা হয়েছে। নিখিলেশ চক্রবর্তী তাঁর রচিত "অনেকপুরুষব্যবস্থা সাংখ্যদিশা কিং সমীচীনা?" প্রবন্ধে সাংখ্যের বহুপুরুষবাদের যুক্তিগুলিকে পর্যালোচনা করেছেন। প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকজ্ঞানই মোক্ষের উপায়- এই তত্ত্বটিকে ভূমিকারূপে উপস্থাপন করে তিনি সাংখ্যের বহুপুরুষবাদে প্রবেশ করেছেন।[২১]

আবার দীননাথ ত্রিপাঠী তাঁর রচিত "পণ্ডিতকুলপতীনাং জানকীনাথ-শাস্ত্রি-পাদানাং স্মৃতিশ্রদ্ধাঞ্জলিঃ" নামক একটি কবিতায় *যুক্তিদীপিকার* উপর জানকীনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন। এরই সাথে জানকীনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বিজ্ঞানভিক্ষুর তত্ত্ব ও সাংখ্যশাস্ত্র সম্পর্কে যে প্রশ্নগুলির আলোচনা করেছেন, সেগুলিরও উল্লেখ করেছেন কবিতায়।[২২]

৬.১.২. বাংলা ভাষায় রচিত অনুবাদ, ব্যাখ্যা, প্রবন্ধ ও সম্পাদিত গ্রন্থ

এবারে আসা যাক বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলির সম্পর্কে। বেশির ভাগ গ্রন্থই অনুবাদ ও ব্যাখ্যামূলক। তাছাড়া, সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যাও অনেকগুলি। আবার, বেশ কিছু প্রবন্ধ সংকলনে কোনও একটি প্রবন্ধেও সাংখ্যের আলোচনা উপলব্ধ হয়। বস্তুত, যে সমস্ত বাঙালি বাংলা ভাষায় ভারতীয় দর্শন নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা সাংখ্যদর্শনের আলোচনার গুরুত্ব যথার্থ অর্থেই উপলব্ধি করেছিলেন।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ধর্ম ও দর্শনতত্ত্ব সমন্বিত দশটি সংবাদ দিয়ে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেন প্রবন্ধ গ্রন্থ *ষড়্দর্শন সংবাদ*। উক্তি প্রত্যুক্তির মধ্যে দিয়ে দর্শনসমূহের ব্যাখ্যায় তিনি প্রবৃত্ত হয়েছেন। জটিল তত্ত্বদর্শনকে তিনি অতি সহজ ও সুকৌশলে পরিবেশন করার দক্ষতা রাখতেন। সত্যকাম ও কাপিল এইরূপ দুটি কল্পিত চরিত্রের অবতারণা করে তাদের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে সাংখ্যদর্শনের বিবিধ দিক ব্যাখ্যাত হয়েছে।[২৩] কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, বহুভাষাবিদ ও খ্রিস্টধর্ম-প্রচারক। তিনি নিজে খ্রিস্টধর্মান্তরিত হন ও তাঁর নিকট-সম্পর্কীয় বেশ কয়েকজনকে ধর্মান্তরিত হতেও সাহায্য করেন। অনেককটি সভা ও সংঘটনের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

সাংখ্যদর্শনের প্রাঞ্জল অনুবাদ করেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। অত্যন্ত পন্ডিত ও সংযত ভাবাপন্ন মানুষ ছিলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। অবিভক্ত বাংলার চব্বিশ পরগণাতে ছিল তাঁর নিবাস। সংস্কৃত কলেজের শেষ পরীক্ষায় তিনি 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি লাভ করেন।

উমেশচন্দ্র বটব্যাল

সাংখ্যের বিবিধ তত্ত্বের উপর বহুবিধ প্রবন্ধের একত্র সংকলন গ্রন্থ উমেশচন্দ্র বটব্যাল এর *সাংখ্য দর্শন*। গ্রন্থটি তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি। গ্রন্থের বিজ্ঞাপন অংশে তা স্পষ্ট হয়, "পূজ্যপাদ স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল পিতাঠাকুর মহাশয়, সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে কতিপয় প্রবন্ধ রচনা করিয়া 'সাধনা' নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন। পরে তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিবার অভিপ্রায়ে পূর্বোক্ত প্রবন্ধমালা একত্র গ্রথিত করিয়া স্থানে স্থানে টীকা সংযোজিত করেন...। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রন্থপ্রকাশের সংকল্প করিয়াই তিনি স্বর্গারোহণ করেন"।[২৪] সাংখ্যের বিবিধ বিষয় যেমন মহৎ, তন্মাত্র, ইন্দ্রিয়, প্রকৃতি, পুরুষ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে এই গ্রন্থে। উমেশ্চন্দ্র বটব্যাল ছিলেন হুগলী নিবাসী। সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপত্তির জন্য তিনি 'বিদ্যালংকার' উপাধি লাভ করেছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় দর্শনেই ছিল তাঁর সমান দক্ষতা। প্রাঞ্জল ভাষার গুণে দর্শনশাস্ত্রের অতি জটিল বিষয়কেও তিনি সহজ ও সুখবোধ্য রূপে উপস্থাপন করেছেন।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সাংখ্যের বহুবিধ বিষয়ে প্রদত্ত বক্তৃতার উপর ভিত্তি করে এক প্রবন্ধধারার সংকলন গ্রন্থ হীরেন্দ্রনাথ দত্তের *সাংখ্য পরিচয়*। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আহ্বানে পরিষদ্-মন্দিরে তিনি সাংখ্যের উপর কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই বক্তৃতার বিষয়গুলিই পুনরায় প্রবন্ধাকারে সজ্জিত করে প্রকাশিত হয় সাংখ্য পরিচয়। বিজ্ঞপ্তি অংশে গ্রন্থকারের অকপট স্বীকারোক্তি "ঐ প্রবন্ধ ধারার নামকরণ করিয়াছিলাম 'সাংখ্য পরিচয়' (বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয়ের অনুকরণে); কারণ ঐ প্রবন্ধাবলী আদৌ পান্ডিত্য বিজৃম্ভিত ছিল না, উহা দ্বারা সাধারণ শিক্ষিত পাঠক সাংখ্য-জ্ঞানের সহিত পরিচয় লাভ করিবেন, ইহাই উদ্দেশ্য ছিল"।[২৫] হীরেন্দ্রনাথ

দত্ত তৎকালীন কলিকাতার বাসিন্দা ছিলেন। পাশ্চাত্য দর্শন, ইতিহাস ও সাহিত্যে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। সক্রিয় রাজনীতিতেও যুক্ত ছিলেন।

সর্বসাধারণের বোধের সুবিধার জন্য গুরু ও শিষ্যের প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দিয়ে সাংখ্যের তত্ত্বগুলি অত্যন্ত সহজ ও সরল ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি প্রণীত *সাংখ্য রহস্য* গ্রন্থে। দর্শনসমূহের আর্ষ তাৎপর্য উপলব্ধিতে যাতে কেউ বঞ্চিত না হন, তাই প্রশ্নোত্তরচ্ছলে গ্রন্থকারের এই প্রয়াস। গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে তিনি জানিয়েছেন "বোধসৌকর্য্যার্থে গুরুশিষ্য প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বাঙ্গালা ভাষায় ন্যায় রহস্য, বৈশেষিক রহস্য, সাংখ্য রহস্য, যোগ রহস্য, মীমাংসা রহস্য, বেদান্ত বা ব্রহ্মসূত্র রহস্য লিখিয়াছি। এই সকলের পৃথগ্‌ভাবে হিন্দী এবং ইংরাজীতে অনুবাদও হইয়াছে। তন্মধ্যে বিশ্বনাথের কৃপায় সাংখ্য রহস্য প্রকাশিত হইল"।[২৬] অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি মহাশয় নোয়াখালির বাসিন্দা ছিলেন। সংস্কৃতে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। স্কুলের হেড পণ্ডিত রূপে কর্মজীবন শুরু করেন ও পরে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন। কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি 'ধর্মশাস্ত্রকোষ' নামে একটি মহৎ গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। দর্শন, ব্যাকরণ এমনকি কাব্যের উপরও অনেককটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি

প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত ভাষ্যের ভাবার্থ গ্রহণ করে সাংখ্যের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সুস্পষ্টরূপে উপন্যস্ত করেছেন কালীবর বেদান্তবাগীশ তাঁর *সাংখ্য দর্শন* গ্রন্থে। বিষয়ে প্রবেশের পূর্বে বেদান্তবাগীশ মহাশয় কর্তৃক পরিবেশিত 'দর্শনশাস্ত্রের লক্ষণ ও সংক্ষিপ্ত সংবাদ' অংশটি যে কোনও দর্শন জিজ্ঞাসুর কাছে অতীব উপাদেয়। নিশিকান্ত সাংখ্যতীর্থ মহাশয় এই গ্রন্থের বিজ্ঞাপন অংশে মন্তব্য করেছেন "আমার মনে হয়, সাংখ্যশাস্ত্রাধ্যয়নেচ্ছু ছাত্রগণ প্রথমতঃ এই বাঙ্গালা সাংখ্য-দর্শন খানি পড়িয়া লইলে তাঁহাদের দর্শনশাস্ত্রে প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত হইয়া যাইবে। অধিকন্তু ইহাতে অন্যান্য দর্শনের এরূপ সকল সার সিদ্ধান্ত সংগৃহীত হইয়াছে, যদ্দ্বারা ইহাকে সর্বদর্শন-সার-সংগ্রহ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না"।[২৭] বেদান্তবাগীশ মহাশয় ছিলেন সর্বদর্শনেই সুপণ্ডিত। তাঁর সম্পাদিত 'বেদান্তদর্শন' সুধীজনের নিকট গ্রাহ্য ও সমাদৃত। এছাড়াও পাতঞ্জল দর্শন ও ন্যায় দর্শনের উপরও তিনি গ্রন্থ রচনা করেন।

কালীবর বেদান্তবাগীশ

ঈশ্বরকৃষ্ণের *সাংখ্যকারিকার* প্রাঞ্জল অনুবাদ যাতে সর্বজনের নিকট সহজেই বোধগম্য হয়, তার প্রয়াস করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ রায় তাঁর *সাংখ্য দর্শন* (কারিকা) গ্রন্থে। সপ্তরটি কারিকার অন্বয়ার্থ সহ সরল অনুবাদ এই গ্রন্থে উপলব্ধ। তাছাড়া গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে 'সাংখ্যতত্ত্বসমাস সূত্র' গুলির উল্লেখ ও অনুবাদও আছে। গ্রন্থে সুরেন্দ্রনাথ রায়ের পরিচয় আছে 'ব্যারিস্টার' রূপে। তবে বিভিন্ন প্রশাসনিক পদেও তিনি কাজ করেছিলেন, এমন পরিচয় পাওয়া যায়।

সুরেন্দ্রনাথ রায়

বিজ্ঞানভিক্ষু প্রণীত সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্যের প্রাঞ্জল অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেন মহেশ চন্দ্র পাল তাঁর *সাংখ্যদর্শন* গ্রন্থে। ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন "আমি পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি অনুসারে 'পাতঞ্জলদর্শন' খানি সম্পূর্ণ করিয়া শ্রীশ্রীমদাচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে অধুনা 'সাংখ্যদর্শন' খানিও অনুবাদ সহিত প্রকাশিত করিলাম"।[২৮] অনুবাদক তথা সম্পাদক মহেশ চন্দ্র পালের ব্যক্তি পরিচয় বিশেষ উপলব্ধ নয়

মহেশ চন্দ্র পাল

তবে তাঁর গ্রন্থ অনুবাদ ও প্রকাশের উদ্দেশ্যটি ছিল মহৎ। 'পাতঞ্জল দর্শনে'র ভূমিকায় তিনি লিখেছেন "আমি যে বহু পরিশ্রম, অর্থব্যয় ও যথাসাধ্য যত্ন এবং উৎসাহ সহকারে ক্রমশঃ আমাদিগের প্রাচীন লুপ্তপ্রায় শাস্ত্রসমূহ...বঙ্গানুবাদ সহিত প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা আমার ব্যবসার নিমিত্ত নহে, কিংবা ইহার আয়দ্বারা যে আমাদিগের সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিব, ইহাও আমার উদ্দেশ্য নহে। ইহার মূল উদ্দেশ্য... সঙ্কট সময়ে যাহাতে প্রত্যেক ধর্মানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেই আর্য্য ঋষিদিগের প্রাণধন উপনিষৎ, বেদান্ত ও দর্শনশাস্ত্রাদির প্রকৃত মর্ম গ্রহণপূর্বক পরমার্থতত্ত্ব লাভ করিতে পারেন..."।[২৯]

আভাস, বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্যার্থ সহ সাংখ্যপ্রবচন সুত্র আলোচনা করেন উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় *সাঙ্খ্যদর্শন* গ্রন্থে। ছয়টি অধ্যায়ে সবকটি সূত্রের একটি প্রসঙ্গ বা আভাস উল্লেখ পূর্বক সেই সূত্রের বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য আলোচিত হয়েছে। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সর্বাধিক পরিচিতি 'বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে'র প্রতিষ্ঠাতা রূপে। সুলভ সংস্করণের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় শাস্ত্রকে সবার মধ্যে পৌঁছে দিতেই তিনি এই মহৎ উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মূলত ছাত্র ও সাধারণ পাঠকের কথা মাথায় রেখে পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু মহাশয় *সাংখ্যকারিকা* নামেই ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত 'সাংখ্যকারিকা'র অনুবাদ করেন। অবশ্য এই গ্রন্থে বাচস্পতি মিশ্রের 'তত্ত্বকৌমুদী' টীকা ও তার বঙ্গানুবাদও উপস্থাপন করেছেন বেদান্তচুঞ্চু মহাশয়। গ্রন্থের বিজ্ঞাপন অংশে তিনি সর্বাগ্রে এই কথা স্বীকার করেছেন, সাংখ্যদর্শনই পাতঞ্জল দর্শনের সোপান এবং সেই সাংখ্যের তত্ত্ব যথাযথভাবে বুঝতে হলে 'সাংখ্যকারিকা'র দ্বারস্থ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাঁর অনুদিত গ্রন্থের মূল লক্ষ্য যে ছাত্রগণ, সেটি তাঁর বয়ানেই স্পষ্ট হয়– "স্থিরচিত্তে মন্তব্য ও অনুবাদের সাহায্যে তত্ত্বকৌমুদীর পড়ার কার্য চলিবে এইরূপ বিশ্বাসেই লেখা হইল, যে ভাবে টোলে ছাত্রগণকে পড়ানো যায় তদনুসারেই অনুবাদ প্রভৃতি করা হইয়াছে, চিন্তাশীল পাঠকগণ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন"।[৩০]

পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু

সাংখ্যশাস্ত্রের প্রমাণ ও প্রমেয়সমূহের যথাযথ বিচার-বিশ্লেষণ ও অন্যান্য শাস্ত্রের সাথে সাংখ্যদর্শনের সম্পর্ক নিরূপণ পূর্বক সাতটি অধ্যায়ে *সাংখ্যদর্শন* নামে একটি অতি উচ্চমানের গবেষণা গ্রন্থ উপস্থাপন করেন ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। অন্যান্য দর্শনগুলির সাথে সাংখ্যমতের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য যেমন আলোচনার প্রয়াস করেছেন গ্রন্থকার, তেমনই মহাভারত, ভাগবৎ, মনুসংহিতা ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লিখিত সাংখ্যমতের সাথে সামঞ্জস্য ও বিরোধ প্রদর্শনেরও ব্যবস্থা করেছেন। গ্রন্থের অবতরণিকায় গ্রন্থকার স্পষ্টতই একথা জানিয়েছেন, "বর্তমান প্রবন্ধে আমরা সাংখ্যসিদ্ধান্তসমূহ আলোচনা করিয়াছি। প্রসঙ্গক্রমে পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, বেদান্ত, বৌদ্ধ ও চার্বাক দর্শনের সহিত সাংখ্যমতের সাদৃশ্য ও পার্থক্য প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। মহাভারত, শ্রীমদ্‌গীতা, শ্রীমদ্‌ভাগবত, মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, চরকসংহিতা এবং বুদ্ধচরিতে সাংখ্যমত বর্ণিত হইয়াছে। এই সমস্ত গ্রন্থে উল্লিখিত সাংখ্যমতের সহিত প্রচলিত সাংখ্যসিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য এবং বিরোধ আলোচনা করিয়াছি"।[৩১]

ভূপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য

সাংখ্যের পশ্চাৎপট পর্যবেক্ষণ পূর্বক প্রমেয় ও প্রমাণ তত্ত্বের আলোচনার মধ্যে দিয়ে বিধুভূষণ ভট্টাচার্য *সাংখ্যদর্শনের বিবরণ* নামক একখানি অপূর্ব গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। তিনটি অধ্যায়ে বিস্তৃত এই গ্রন্থটিকে গ্রন্থকার বিনয়বশত

'সাংখ্যচিন্তার দিগ্‌দর্শনমাত্র' বলে মনে করেছেন। সাংখ্যের পশ্চাৎপট সম্পর্কে সুবিস্তৃত আলোচনার পর প্রমেয় ও প্রমাণ তত্ত্ব সম্পর্কে গ্রন্থকারকে সংক্ষেপে আলোচনা করতে হয়েছে। এই কারণে কিঞ্চিৎ খেদ তার কথায় স্পষ্ট হয়, "প্রমাণ এবং প্রমেয় এই দ্বিবিধ তত্ত্বের আলোচনা সাংখ্যকারিকায় রহিয়াছে। কিন্তু উহা অতি সংক্ষিপ্ত। বিভিন্ন বিষয়ের নানা প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে ঐ সংক্ষিপ্ত কারিকার বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক। কিন্তু নির্দিষ্ট পৃষ্ঠাসংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ এই গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব হয় নাই। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও এই গ্রন্থের প্রথমপর্বের আলোচনা নানাভাবে সংক্ষেপে করা হইয়াছে"।[৩২]

বিধুভূষণ ভট্টাচার্য

বিদ্যানুরাগী অধ্যাপক ও বিদ্যার্থিবৃন্দের কথা মাথায় রেখে শ্রীমৎ ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত *সাংখ্যকারিকার* উপর বাচস্পতি মিশ্র রচিত *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* টীকা অবলম্বনে এক বিশ্লেষণধর্মী ও অতীব উপাদেয় ব্যাখ্যা পরিবেশন করেন নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী মহোদয়। *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* এই নামেই তিনি তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থটির নাম রাখেন এবং পরিশীলিত তথ্যসমৃদ্ধ বিশ্লেষণের নাম দিয়েছিলেন 'অধ্যাপনা'। *সাংখ্যকারিকার* উপর *যুক্তিদীপিকা* ও *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* এই দুটি টীকা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। তবে 'অধ্যাপনা'র জন্য গ্রন্থকার *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* টীকাটিকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। ব্যাখ্যাগ্রন্থের 'প্রাথমিক কথা'য় তিনি এবিষয়ে যুক্তি দিয়েছেন– "বর্তমান সময়ে সাংখ্যকারিকা বা সাংখ্যসপ্ততিই সাংখ্যদর্শনের প্রাচীনতম প্রামাণিক গ্রন্থরূপে গণ্য ও সর্বমান্য। সাংখ্যকারিকার অনেক ব্যাখ্যা থাকিলেও যুক্তিদীপিকা ও সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী প্রমেয়বাহুল্যে ও বিশ্লেষণে সর্বাতিশায়ী গৌরবের দ্বারা সম্মানিত। 'সাংখ্যদর্শনের একটি গ্রন্থের অধ্যাপনা করিব' এইরূপ সংকল্প হইলে প্রথমে যুক্তিদীপিকার কথাই মনে হয়। কিন্তু যুক্তিদীপিকার সকল বাক্য অবিকল না থাকায় অধ্যাপনার সাফল্যে প্রবল শঙ্কা হয়। এইজন্য সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীর অধ্যাপনা করিতে প্রবৃত্ত হই"।[৩৩] তিনি বেনারসে বহুকাল বিদ্যাভ্যাস করেন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ অলংকৃত করেছিলেন। পরম কৃষ্ণভক্ত এই বিদ্বান তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের ব্যাখ্যাও (যেমন, অন্নংভট্ট রচিত *তর্কসংগ্রহের* ব্যাখ্যা) 'অধ্যাপনা' নামে প্রকাশ করেছিলেন।

নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী

৬.১.৩. ইংরাজি ভাষায় রচিত অনুবাদ, প্রবন্ধ ও আলোচনামূলক গ্রন্থ

এখন দেখা যাক ইংরাজি ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলির সম্পর্কে। এক্ষেত্রেও বেশির ভাগ গ্রন্থই অনুবাদ ও ব্যাখ্যামূলক। বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলি অত্যন্ত সমৃদ্ধ হলেও সর্বভারতীয় স্তরে সেগুলির পরিচিতির সীমাবদ্ধতা থেকেই যায়। তুলনামূলকভাবে, ইংরাজি ভাষায় রচিত গ্রন্থের ব্যাপ্তি অনেকটাই বেশি।

সাংখ্য পরম্পরা ও চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ নিয়ে সুদীর্ঘ ও তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করেন পুলিনবিহারী চক্রবর্তী মহাশয় তাঁর *Origin and Development of the Sāṁkhya System of Thought* গ্রন্থে। সাংখ্য পরম্পরাটির কীভাবে ক্রমবিকাশ হয়েছে সেইটি দেখানোর চেষ্টা করেছেন গ্রন্থকার। গ্রন্থের মুখবন্ধ অংশে স্বীকার করেছেন সেকথা, "an attempt has been made in this volume to trace the origin of Sāṁkhya and specially the development which the system underwent in the different stages of its growth and evolution".[৩৪] গ্রন্থকারের ব্যক্তিপরিচয় বিশেষ উপলব্ধ হয় না।

পুলিনবিহারী চক্রবর্তী

সাংখ্যের পুরুষতত্ত্ব সম্পর্কে এক অভিনব ব্যাখ্যার প্রয়াস করেন অভয় কুমার মজুমদার তাঁর *The Sāṅkhya Conception of Personality* গ্রন্থে। উক্ত গ্রন্থটি অবশ্য গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র যতীন্দ্র কুমার মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। একেবারে ভিন্ন আঙ্গিকে পুরুষতত্ত্ব সম্পর্কে মতামত রাখেন অভয় কুমার মজুমদার। সেকারণেই গ্রন্থের প্রাস্তাবিকে শ্রদ্ধেয় রাধাকৃষ্ণন মহোদয় বলেছেন "The work gives us a fresh interpretation of the Sāṁkhya system. Whether or not we agree with the many textual interpretations of the writer, there is no doubt that the book offers us a deeper understanding of the problems which the Sāṁkhya attempted to solve".[৩৫] গ্রন্থকারের ব্যক্তিপরিচয় বিশেষ উপলব্ধ হয় না।

অভয় কুমার মজুমদার

সাংখ্যকারিকার উপর একটি ভিন্ন আঙ্গিকের ব্যাখ্যা পরিবেশন করেছেন জে.এন.মুখার্জি তাঁর *Sāṁkhya or The Theory of Reality* গ্রন্থে। *সাংখ্যকারিকাকে* তিনি ব্যাখ্যা করেছেন দুটি দিক থেকে। 'দুঃখ' শব্দটিকে বাদ দিলে প্রথম ৫২টি কারিকা যথার্থ সাংখ্য এবং পরবর্তী ১৬টি কারিকা মিথ্যা সাংখ্য- "The two Sāṁkhyas in Sāṁkhya-Kārikā may be separated from each other. The first fifty-two kārikās without the term Duḥkha contain the genuine Sāṁkhya, while the sixteen kārikās from 53 to 68 propound the false Sāṁkhya".[৩৬] সাংখ্য একটি আস্তিক দর্শনশাস্ত্র, স্বাভাবিকভাবেই মোক্ষ শাস্ত্র রূপেই পরিচিত। যদিও গ্রন্থকার এক ভিন্ন যুক্তির অবতারণা করেছেন এখানে। তাঁর মতে, দুঃখ ও মোক্ষ শব্দের মধ্যে দিয়ে বন্ধ ও মুক্তির একটা যোগসাজশে এরূপ মোক্ষ শাস্ত্র প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। সাংখ্য প্রকৃত অর্থে বাস্তব দর্শন বা জীবন দর্শন- "We have noticed in Sāṁkhya-Kārikā a doctrine of Duḥkha and Mokṣa trying to yoke a demonstrative philosophy of Reality and Life developing round the concepts of Bandha and Siddhi".[৩৭]

জে. এন. মুখার্জি

সাংখ্যের তত্ত্ব ও তথ্যের উপর ভিত্তি করে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে যজ্ঞেশ্বর ঘোষ আলোচনা করেছেন তাঁর *Sāṁkhya and Modern Thought* গ্রন্থে। কারিকা বা সূত্রকে সরাসরি অনুসরণ করেননি গ্রন্থকার বরং তত্ত্বগুলির পর্যালোচনা করেছেন নিজস্ব ব্যাখ্যাশৈলীতে। গ্রন্থের অধ্যায়গুলিতে লক্ষ্য করলেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা, 'The Scope of the Sāṁkhya', 'Bondage and the Soul', 'The mind and the Soul' প্রভৃতি। গ্রন্থকার দেখানোর চেষ্টা করেছেন সাংখ্য ও বেদান্ত এই দুই দর্শনই 'ভোগ'কে সর্বাধিক মূল্য দেওয়া হতে বিরত থেকেছে এবং সমস্ত প্রকার অনর্থের সোনালি সূচক রূপে 'ভোগ'কে নির্দেশ করেছে - "The Sāṁkhya and the Vedānta… refuse to take enjoyment at its face value but would regard it on the other hand as the gilded index of far-reaching mischief".[৩৮]

যজ্ঞেশ্বর ঘোষ

অনিরুদ্ধের বৃত্তি ও বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষ্য সহ *সাংখ্যপ্রবচনসূত্রের* ইংরাজিতে অনুবাদ করেছেন নন্দলাল সিনহা মহাশয়। *The Sāṁkhya-Pravachana-Sūtram* - এই নামেই গ্রন্থটি উপলব্ধ। সূত্র, ভাষ্য ও বৃত্তি সবকটির ইংরাজিতে অনুবাদ আছে এই গ্রন্থে। কারিকা সাংখ্যের চেয়ে সূত্রসাংখ্যের দিকটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন নন্দলাল সিনহা মহাশয় এবং শুধুমাত্র সূত্রের নয়; বৃত্তি ও ভাষ্যের অন্তর্ভুক্তি

নন্দলাল সিনহা

করেছেন ঐদুটির গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে - "by the help of the Vṛtti readers will be able to form a fair and accurate general acquaintance with the principal doctrines of Kapila, the founder of the school, and the Bhāṣya will enable them to traverse the whole field of Hindu philosophical speculation, and thereby to acquire a deeper and wider knowledge of the Sāṁkhya Philosophy…"।[৩৯]

গৌড়পাদ–ভাষ্য ও নারায়ণ তীর্থের টীকা সহ *সাংখ্যকারিকার* অনুবাদ করেছেন সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জী মহাশয় *Sankhya Philosophy* নামের গ্রন্থটিতে। অবশ্য এই গ্রন্থটি শুধু অনুবাদ নয়; তার সাথে গ্রন্থকারের বিস্তৃত ব্যাখ্যাও উপলব্ধ।

সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জী

গৌড়পাদ ও নারায়ণ তীর্থের টীকাকে গ্রন্থকার প্রাধান্য দিয়েছেন কারণ তিনি দেশজ টীকাকারের ব্যাখ্যা সমেত অনুবাদ করতে চেয়েছেন– "I also decided that a translation of the text should be accompanied with a translation of some of the best native commentaries".[৪০] অনুবাদের জন্য সূত্র সাংখ্য নয়, কারিকা সাংখ্যকেই তিনি প্রামাণ্য বলে স্বীকার করেছেন– "I selected the Sānkhya Kārikā because oriental scholars seem to be now agreed that in it we possess the oldest work of authority on the subject".[৪১]

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের আঙ্গিক থেকে সাংখ্যের প্রকৃতি তত্ত্বের ব্যাখ্যার প্রয়াস করেছিলেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁর *The Positive Sciences of the Ancient Hindus* গ্রন্থে। তাৎপর্যপূর্ণ এই যে, আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও তিনি প্রকৃতি তত্ত্বের তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। স্বীকার–অস্বীকারের প্রশ্ন থেকে সরে আসলে এই

ব্রজেন্দ্র নাথ শীল

প্রয়াস নিঃসন্দেহে অভিনব। ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত উচ্চমানের ধারণা পোষণ করতেন এবং গ্রীক দর্শনের চাইতে যে কোনও অংশে কম নয়; সেকথা গ্রন্থের প্রস্তাবনাতেই স্বীকার করেছেন– "The Hindus no less than the Greeks have shared in the work of constructing scientific concepts and methods in the investigation of physical phenomena, as well as of building up a body of positive knowledge which has been applied to industrial technique…"।[৪২] সাংখ্যদর্শন যেখানে প্রকৃতিকে বিভু, অবিনাশী, অনাদি, অপরতন্ত্র বলে স্বীকার করেছেন, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় সেখানে প্রকৃতিকে বহু স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে প্রকৃতি কখনই এক হতে পারে না।[৪৩] আবার সাংখ্যের সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়কে তিনি আধুনিক জড়বিজ্ঞানের আঙ্গিক থেকে Essence, Energy ও Mass রূপে বিচার করেছেন।[৪৪] জড়বিজ্ঞানের ঐরূপ আঙ্গিক থেকে তুল্যমূল্য বিচার করেও সাংখ্যের গুণত্রয়কে তিনি গুণ বলার পক্ষেই যুক্তি রেখেছেন, দ্রব্য বলেননি। ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন একনিষ্ঠ জ্ঞানসাধক। ১৮৯৯ সালের দিকে রোমে অনুষ্ঠিত International Congress of Orientalists এ তাঁর নিবন্ধ উপস্থাপন করেন। ভারতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও জ্ঞান যা ঐ সময় পর্যন্ত পাশ্চাত্য বাসীর নিকট অনাস্বাদিত ছিল; তার পূর্ণ পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল ব্রজেন্দ্রনাথের অসামান্য প্রতিভায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনবিশারদদের মধ্যে তিনি আজও অগ্রগণ্য।

দর্শনের সবদিকেই বিচরণ করে নির্যাস স্বরূপ অমূল্য কিছু প্রবন্ধ রচনা করেন মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়। *Aspects of Indian Thought* এবং *Selected Writings of M M Gopinath Kaviraj* এই দুটি গ্রন্থে দর্শনের

বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অনেককটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। সেখানে সাংখ্যের উপর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধটি "The Problem of Causality-Sāṁkhya Yoga view"। কার্য-কারণ সম্পর্কের অমীমাংসিত সমস্যাটি কিভাবে সময়ের সাথে সাথে কয়েকটি প্রশ্ন অবিকল রেখে গেছে সে ব্যাপারে প্রবন্ধে তিনি নির্দেশ করেছেন- " What is the relation between the cause and effect? Does the cause contain the effect in its implicit form or is the effect a new thing altogether? What are the presuppositions of the genetic process? Does it imply simply a gradual unfoldment of what lies within, as eternally existing, or is it a creation *ex nihilo*?"[৪৫] প্রবন্ধটিতে সাংখ্য ও যোগের দৃষ্টিকোণ থেকে সৎকার্যবাদের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

গোপীনাথ কবিরাজ

সাংখ্যের তত্ত্ব ও তথ্য নিয়ে প্রমাণ-প্রমেয় ভিত্তিক আলোচনা উপস্থাপন করেছেন অণিমা সেনগুপ্ত তাঁর *Classical Sāṁkhya: A Critical Study* গ্রন্থে। মুক্তির বিষয়ে পাশ্চাত্যের ধারণার কথা উল্লেখ করে তিনি দেখিয়েছেন সামান্য পরিবেশগত বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে ঐগুলি সম্ভব; কিন্তু মনুষ্য সত্তার চরম প্রাপ্তিরূপ যে মুক্তির অবস্থা, তার প্রাপ্তিতে প্রয়োজন মনুষ্য সত্তা ও এই জগতের মৌলিক নীতিগুলির সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা- "A thorough analysis of the consecutive principles of human personality as well as of the phenomenal world has become the subject-matter of the Classical Sāṁkhya because without a clear grasp of these principles, one cannot have a vision of the ever shining beyond, which is in us and which alone is the inexhaustible truth and peace".[৪৬] অণিমা সেনগুপ্ত ছিলেন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা। ভারতীয় দর্শনে বিশেষত সাংখ্যদর্শনে তাঁর বিশেষ অধ্যয়ন ও আগ্রহের পরিণাম স্বরূপ সাংখ্যচর্চায় আরও কয়েকটি গ্রন্থের স্মৃতি বহন করেছিল। সেই গ্রন্থগুলির মধ্যে *The evolution of the Sāṁkhya School of thought, Chāndogyo Upaniṣad: Sāṁkhya point of view, Kaṭha Upaniṣad: Sāṁkhya point of view* এই কয়েকটি বিশেষ উল্লেখ্য।

অণিমা সেনগুপ্ত

৬.২. উপসংহার

সাংখ্যচর্চায় যেসব বাঙালি নিজেদের নিয়োজিত করেছেন তার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তান্ত এরমধ্যে আলোচিত হয়েছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে আনতে হলেও, সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরাজি ভাষায় বাঙালির সাংখ্যের চর্চার দলিল স্পষ্টতই উপলব্ধ। তবে আধুনিক বাঙালির দর্শনচর্চার একটু গোড়ার কথা যদি বলতে হয়, তাহলে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে উনিশ শতককে বিশেষভাবে মনে করতে হয়। সুশীল কুমার গুপ্ত মনে করেছেন নবজাগরণের আন্দোলনগুলি বাঙালির চরিত্রের 'ভাবাবেগের আতিশয্যতা'কে প্রকট করেছিল, যার প্রভাব দেখা যায় সাহিত্যেও। এই প্রভাব ভালো নাকি খারাপ? তিনি বলেছেন, "এই যুগের পরিব্যাপ্ত ভাবাবেগের একটি সুফল ফলিয়াছিল। এই ভাবাবেগে সমাজ নিজের অবস্থার দুর্দশাকে অতিক্রম করিয়া নূতন আশা ও আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই অবস্থায় সে সাহিত্যে আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিয়াছিল। সেইজন্য নবযুগের সাহিত্যে যে উদ্দীপনা, প্রাণপ্রাবল্য ও বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়, সেইরূপ পূর্বে আর দেখা যায় নাই"।[৪৭]

যদিও বাঙালির দর্শন চিন্তার ও চর্চার প্রসঙ্গে অধ্যাপক রামদুলাল রায় তাঁর "বাঙালির দর্শন: প্রাচীন কাল থেকে সাম্প্রতিক কাল" গ্রন্থে জনৈক সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধার করেছেন, "বাঙালির ধর্মকর্মে ঐতিহ্য আছে, বর্ণাঢ্য কাব্যসাহিত্য ও শিল্পকলা আছে; কিন্তু উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কোন দর্শন নেই। বাঙালি সংকর জাতি। জলবায়ুগত কারণে বাঙালি মাত্রেই আবেগপ্রবণ, জীবনবিরাগী, কর্মবিমুখ ও পরলোকমুখী। তাছাড়া দর্শনচর্চার জন্য যে দৃঢ় মানসিকতা ও যুক্তিনিষ্ঠতা থাকা দরকার বাঙালির তা নেই। বাঙালির দর্শন চিন্তায় শুদ্ধ চর্চার ঐতিহ্য বিশেষ পরিপুষ্ট নয়"।[৪৮] তবে এই অভিযোগ সর্বৈব সত্য নয়।

বস্তুত, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব বাঙালির চিন্তাজগতে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল, সেই ভাব ও চিন্তাধারাকে আত্মসাৎ করে বাঙালি তার সূক্ষ্ম ভাবকল্পনা ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতিরসে দার্শনিক চর্চার পৌরোহিত্য করেছিল। মোহিতলাল মজুমদার বাঙালির এই সূক্ষ্ম ভাবকল্পনা ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতিরসের উপলব্ধির প্রশংসা করেছেন, "বাঙ্গালী যেমন সূক্ষ্ম ভাবকল্পনা ও অতীন্দ্রীয় অনুভূতিরসের রসিক, তেমনই, সে সেই রসকে বস্তু বা বিষয়নিরপেক্ষরূপে ভোগ করিতে ইচ্ছুক নয়; সে এই দেহেরই সূক্ষ্মতর অধিষ্ঠানে, সহস্রদল নাড়ীপদ্মে তত্ত্বমধু ভুঞ্জনের পক্ষপাতী..."।[৪৯]

প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় বাংলার দিকে দৃষ্টিপাত করলে যেমন ভারতীয় দর্শন বিশেষত আস্তিক দর্শনের উপর অনেক সুচিন্তিত ব্যাখ্যা ও আলোচনা দেখতে পাওয়া যায় তেমনই নবজাগরণের পর প্রাচ্য দর্শনের সাথে সাথে পাশ্চাত্য দর্শনেও আধুনিক বাঙালির দর্শন চিন্তা ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। শ্রদ্ধেয় অনন্তলাল ঠাকুর তাঁর "ভারতীয় দর্শনে বাঙালীর প্রাধান্য সংশয়াতীত" প্রবন্ধে দৃঢ়ভাবে মনে করেছেন, বাঙালির দর্শনচর্চা দেশ-কালের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে দেশান্তরে জ্ঞানের আলোকরশ্মি বিস্তার করেছিল- "দর্শনের বিস্তীর্ণ পদে হাঁটাচলায় একাধিক কারণে বাঙালী হিসেবে গর্ববোধ হয়, আনন্দোচ্ছ্বাস মনকে আপ্লুত করে। বাঙালীর দর্শনচর্চা শুধুমাত্র এদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল - এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। দর্শনে তার জ্ঞানদ্যুতি দেশ-কালের মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। অতি প্রাচীন কালেই জ্ঞান-বিজ্ঞান, শাস্ত্রচর্চার বিস্তার ঘটাতে বিভিন্ন দেশ থেকে এদেশের, দক্ষিণ দেশের পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ আসতো"।[৫০] আগামী দিনে এই দর্শন চিন্তার প্রবাহ কোন দিকে- তার উত্তর অবশ্য আগামীর জন্য তোলা থাক; তবে যুক্তিশীল বাঙালির দর্শন চিন্তা ও চর্চা অত্যন্ত ক্ষীণস্রোতা হয়েও যে প্রবহমান থাকবে, সেকথা প্রায় নিশ্চয়তার সাথে বলা চলে।

উল্লেখপঞ্জি

[১] Larson & Bhattacharya, *Encyclopedia of Indian Philosophies*, Vol. IV, p. 31

[২] *Ibid.*, Vol.IV, p. 30

[৩] *Ibid.*, Vol.IV, p. 459

[৪] পঞ্চানন শাস্ত্রী (সম্পা.), *আগম-তত্ত্ব-বিলাসঃ*, ভূমিকা, পৃ. ৪

[৫] *Ibid.*, Vol.IV, p. 463

[৬] Larson & Bhattacharya, *Op.cit.*, Vol.IV, p. 466

[৭] *Ibid.*, Vol.IV, p. 473

[৮] *Ibid.*, Vol.IV, p. 487

[৯] *Ibid.*, Vol.IV, p. 521

[১০] *Ibid.*, Vol.IV, p. 545

[১১] *Ibid.*, Vol.IV, p. 563

[১২] *Ibid.*, Vol.IV, p. 577

[১৩] হরিহরানন্দ আরণ্য, *কপিলাশ্রমীয় পাতঞ্জল যোগদর্শন*, *সাংখ্যতত্ত্বালোকঃ*, পৃ. ৩১১

[১৪] http://kapilmath.com/swami-hariharananda-aranya/

[১৫] Sanskrit-Sāhitya-Pariṣat-Patrikā, Vol. 25, pp. 62-64

[১৬] *Ibid.*, Vol. 16, pp. 210-213

[১৭] *Ibid.*, Vol. 27, pp. 28-32

[১৮] *Ibid.*, Vol. 12, p. 77

[১৯] *Ibid.*, Vol. 54, pp. 40-41

[২০] *Ibid.*, Vol. 13, p. 372

[২১] *Ibid.*, Vol. 72, pp. 30-32

[২২] *Ibid.*, Vol. 55, pp. 18-22

[২৩] অধীর দে, *আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা*, পৃ. ৬৫

[২৪] উমেশ চন্দ্র বটব্যাল, *সাংখ্যদর্শন*, বিজ্ঞাপন, পৃ. ১

[২৫] হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, *সাংখ্যপরিচয়*, বিজ্ঞপ্তি, পৃ. ১

[২৬] অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি, *সাংখ্য রহস্য*, বিজ্ঞাপন, পৃ. ১

[২৭] কালীবর বেদান্তবাগীশ, *সাংখ্যদর্শন*, বিজ্ঞাপন, পৃ. ২

[২৮] মহেশ চন্দ্র পাল, *সাংখ্যদর্শন*, ভূমিকা, পৃ. ১

[২৯] মহেশ চন্দ্র পাল, *পাতঞ্জলদর্শন*, ভূমিকা, পৃ. ২

[৩০] পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু, *সাংখ্যকারিকা*, বিজ্ঞাপন, পৃ. ৫

[৩১] ভূপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, *সাংখ্যদর্শন*, অবতরণিকা, পৃ. ২৪

[৩২] বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, *সাংখ্যদর্শনের বিবরণ*, মুখবন্ধ, পৃ. ১১

[৩৩] নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী (সম্পা.), *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী (অধ্যাপনাসহিতা)*, প্রাথমিক কথা, পৃ. ক

[৩৪] Pulinbihari Chakravarti, *Origin and Development of the Sāṁkhya System of Thought*, Preface, p. I

[৩৫] Abhay Kumar Majumdar, *The Sāṅkhya Conception of Personality*, Forward, p. xii

[৩৬] J N Mukerji, *Sāṁkhya or The Theory of Reality*, Preface, p. vi

[৩৭] Loc.cit.

[৩৮] J. Ghosh, *Sāṁkhya and Modern Thought*, p. 112

[৩৯] Nandalal Sinha, *The Sāṁkhya-Pravachana-Sūtram*, Forward, p. i

[৪০] Suresh Chandra Banerji, *Sankhya Philosophy*, Preface, p. viii

[৪১] Loc.cit.

[৪২] Brajendranath Seal, *The Positive Sciences of the Ancient Hindus*, Forward, p. 3

[৪৩] *Ibid.*, p. 2

[৪৪] *Ibid.*, p. 3

[৪৫] Gopinath Kaviraj, "The Problem of Causality-Sāṁkhya Yoga view", *Selected Writings of M M Gopinath Kaviraj*, p. 108

[৪৬] Anima Sen Gupta, *Classical Sāṁkhya: A Critical Study*, Prelude, p. xv

[৪৭] সুশীল কুমার গুপ্ত, *উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ*, পৃ. ২৩৮

[৪৮] রামদুলাল রায়, *বাঙালির দর্শনঃ প্রাচীন কাল থেকে সাম্প্রতিক কাল*, পৃ. ৪১

[৪৯] সুশীল কুমার গুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪০

[৫০] অনন্তলাল ঠাকুর, "ভারতীয় দর্শনে বাঙালীর প্রাধান্য সংশয়াতীত", *নিবন্ধাবলী* , পৃ. ৩৬৩

ж ж ж ж ж

সপ্তম অধ্যায়

যথা কলাবশিষ্টোঽপি শশী রাজত্যুপপ্লুতঃ/তারকাদখিলাত্ সম্যক্ প্রোজ্জ্বলশ্চ তমোপহঃ।।
কালরাহুসমাক্রান্তমপি তদ্বদ্বিভাতি যত্/সর্বতীর্থেষু শাস্ত্রস্য বক্তারং কপিলং নুমঃ।।

'অন্ধকার নাশক চন্দ্র যেমন রাহুর গ্রাসে গ্রসিত হয়েও আকাশের সমস্ত তারার চেয়ে উজ্জ্বলরূপে প্রতীত হয়, তেমনই কাল রূপ রাহুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েও যে শাস্ত্র অন্য সকল শাস্ত্রাপেক্ষা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে, সেই সাংখ্যশাস্ত্র ও তার বক্তা মহর্ষি কপিলকে নমস্কার'।

–হরিহরানন্দ আরণ্য, *সাংখ্যতত্ত্বালোকঃ*, পৃ. ৩১১

উপসংহার

"The influence of Kapila is everywhere seen throughout the world. Whereever there is a recognised system of thought, there you can trace his influence; even if it be thousands of years back, yet he stands there, the shining, glorious, wonderful Kapila".

- Swami Vivekananda (*The Complete Works of Swami Vivekananda*, Vol. 3)

সমগ্র ভারতভূমি জুড়ে দার্শনিক আলোচনা-পর্যালোচনার যে ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল, সেখানে সব স্তরের ব্যাখ্যাতা ও আলোচকেরা অংশ নিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে কেউ যদি মনে করেন, সেই 'দর্শন' রূপ 'যজ্ঞে' বাঙালি ঋত্বিকগণের 'চর্চা' রূপ 'আহুতি'র পরিমাণ খুব সামান্য ছিল, তাহলে তেমন ভাবার কোনও প্রয়োজন নেই। শ্রদ্ধেয় অনন্তলাল ঠাকুর তাঁর "ভারতীয় দর্শনে বাঙালীর প্রাধান্য সংশয়াতীত" প্রবন্ধে দৃঢ়ভাবে মনে করেছেন, বাঙালির দর্শনচর্চা দেশ-কালের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে দেশান্তরে জ্ঞানের আলোকরশ্মি বিস্তার করেছিল- "দর্শনের বিস্তীর্ণ পদে হাঁটাচলায় একাধিক কারণে বাঙালী হিসেবে গর্ববোধ হয়, আনন্দোচ্ছ্বাস মনকে আপ্লুত করে। বাঙালীর দর্শনচর্চা শুধুমাত্র এদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল – এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। দর্শনে তার জ্ঞানদ্যুতি দেশ-কালের মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। অতি প্রাচীন কালেই জ্ঞান-বিজ্ঞান, শাস্ত্রচর্চার বিস্তার ঘটাতে বিভিন্ন দেশ থেকে এদেশের, দক্ষিণ দেশের পন্ডিতদের আমন্ত্রণ আসতো"।[১]

আধুনিক বাঙালির দর্শনচর্চার গোড়ার কথা যদি বলতে হয়, তাহলে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে উনিশ শতককে বিশেষভাবে মনে করতে হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব বাঙালির চিন্তাজগতে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল, তারই প্রভাব লক্ষ্য করা যায় দার্শনিক চর্চার মধ্যে। সুশীল কুমার গুপ্ত মনে করেছেন নবজাগরণের আন্দোলনগুলি বাঙালির চরিত্রের 'ভাবাবেগের আতিশয্যতা'কে প্রকট করেছিল, যার প্রভাব দেখা যায় সাহিত্যেও। এই প্রভাব ভালো নাকি খারাপ?-সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "এই যুগের পরিব্যাপ্ত ভাবাবেগের একটি সুফল ফলিয়াছিল। এই ভাবাবেগে সমাজ নিজের অবস্থার দুর্দশাকে অতিক্রম করিয়া নূতন আশা ও আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই অবস্থায় সে সাহিত্যে আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিয়াছিল। সেইজন্য নবযুগের সাহিত্যে যে উদ্দীপনা, প্রাণপ্রাবল্য ও বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়, সেইরূপ পূর্বে আর দেখা যায় নাই"।[২]

দার্শনিক চিন্তাভাবনার গোড়াপত্তনের কথা বললে অবশ্য উপনিষদের প্রসঙ্গই প্রথম আপতিত হয়, তবে যুক্তিনির্ভর আলোচনার দিক থেকে সাংখ্যই একপ্রকার প্রথম পদক্ষেপ। পরবর্তী অন্বীক্ষায় তার অবদান সুদূরপ্রসারী। মোক্ষশাস্ত্ররূপ এই সাংখ্যের চর্চায় বাঙালির নিযুক্তি প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় অনন্তলাল ঠাকুরের একটি মন্তব্য মনে করা চলে, "সাংখ্যদর্শন এবং যোগদর্শন নিয়ে বাঙালী সম্ভবত খুব একটা নাড়াচাড়া করেনি। দর্শনের এই দুই অংশের ওপর বাঙালীর নামকরা তেমন কোনো গ্রন্থ নেই"।[৩] যদি সাংখ্যশাস্ত্রের উপর প্রত্যক্ষরূপে 'ভাষ্য-টীকা-টিপ্পনী' প্রণয়ণের প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করা হয়ে থাকে, তাহলে কিছুদূর সমর্থন করা গেলেও; সাংখ্যদর্শনের উপর আনুষঙ্গিক ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা প্রসঙ্গে এই মন্তব্যে সহমত পোষণ করা যায় না একেবারেই।

নবজাগরণের চিন্তাধারার পরিবর্তনকে সাক্ষ্য রেখে, দর্শন চর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন যেসব বাঙালি, তাঁদের মধ্যে এমনই এক বিশিষ্টজন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পরিপূর্ণরূপে গৃহী হওয়ায় প্রবৃত্তির একেবারে ধ্বংস তিনি চাননি বরং এমন তাৎপর্য খুঁজে পেতে চেষ্টা করেছেন যা জীবনের গতিপথকে ঊর্ধ্বায়িত করে। তত্ত্ব (theory) ও প্রয়োগ (application) এই দুই ধারার মধ্যে তিনি দৃঢ়ভাবে দ্বিতীয় মার্গের কথা বলেছেন। তাঁর স্পষ্ট জবাব, "ভারতবর্ষে দেখতে পাই মনীষার এমন একটি ধারা যাতে শিক্ষণীয় অনেক কিছু আছে কিন্তু সে ধারা রুদ্ধগতি ও ক্ষয়িষ্ণু। এখনো টোলে দর্শন শিক্ষার ব্যবস্থা আছে কিন্তু সে শিক্ষা অনুর্বর নিষ্ফল। হিন্দু দর্শনকে দুভাবে পড়া যেতে পারে- শুধুই তত্ত্বের জন্য অথবা ভারতীয় ইতিহাসের গতিকে বোঝার জন্য। যে চিন্তা জাতীয় সমাজের পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করছে, সেটাই জানা এখন আমাদের দরকার হয়ে পড়েছে। নিছক তত্ত্বের জন্য হিন্দু দর্শন পড়ার দরকার আছে বলে মনে হয় না"।[৪]

সুপ্রাচীন অতীত আদর্শের কার্যকারিতা, বর্তমান গতিময় সময়ে অক্ষুণ্ন থাকতে নাও পারে? তাই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি খুব স্পষ্ট– "Let us revere the past, but we must, in justice to our new life, adopt new life, adopt new methods of interpretation and adopt the old eternal and underlying truths to the necessities of that new life"।[৫]

একথা বোধগম্য হয় যে, ভারতীয় সমাজের তাৎকালীক গতিকে উপলব্ধির অভিপ্রায়েই সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্র সাংখ্যের ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করেছিলেন। যথেষ্ট আধুনিক ও স্পষ্টদৃষ্টিতে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর 'লক্ষ্য পাঠক' (target reader) "... প্রায় অধিকাংশই 'শিক্ষিত' সম্প্রদায়ভুক্ত। যাঁহারা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁহাদিগেরই সচরাচর 'শিক্ষিত' বলা হইয়া থাকে... এখন আমাদিগের 'শিক্ষিত' সম্প্রদায় শৈশব হইতে পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালীর অনুবর্তী। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় চিন্তা–প্রণালী তাঁহাদিগের নিকট অপরিচিত; কেবল ভাষান্তরিত হইলে প্রাচীন ভাবসকল তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাঁহাদিগকে বুঝাইতে গেলে পাশ্চাত্ত্য প্রথা অবলম্বন করতে হয়, পাশ্চাত্য ভাবের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়"।[৬] সেই কারণে, আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে দুঃখপ্রাধান্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি অবতারণা করেছেন সেইসব দৃষ্টান্তের যেগুলি প্রাচীন পন্ডিতদের না, বরং আধুনিক সমালোচকের। প্রসঙ্গক্রমে সেখানে মাদক সেবন, রাসায়নিক যৌগ কার্বনিক অ্যাসিড, ম্যালথাসের পপুলেশন থিয়োরি এইরকম বিবিধ বিষয় উঠে এসেছে। শাস্ত্রীয় বিষয়ের ব্যাখ্যায় তথা সমালোচনায় এটি একটি অভিনব উদ্যোগ, যা বিষয়ের উপলব্ধিতে অনেক বেশি সহায়ক।

অন্যদিকে পরিপূর্ণরূপে একজন গৃহস্থীর বিপরীত প্রান্তে পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন পূর্ণতা ও পবিত্রতার উপাসক। আলোচনা দর্শনের হোক বা বিজ্ঞানের বা সাহিত্যের, তিনি গেয়ে গেছেন পূর্ণতা ও পবিত্রতারই জয়গান। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ব্যক্তিত্বের এই পূর্ণতা ও পবিত্রতা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর শৈলীতে।[৭] সেকারণেই মানব–অভ্যুদয়ের পথে *struggle for existence* অথবা *survival of the fittest* এই জাতীয় তত্ত্ব তিনি মেনে নিতে চাননি বরং পূর্ণতাকে 'পাখির চোখ' করে জীবের পূর্ণতার অনুসন্ধান করে গেছেন– "In my opinion, struggle and competition sometimes stand in the way of a being's attaining its perfection. If the evolution of an animal is effected by the destruction of a thousand others, then one must confess that this evolution is doing very little good to the world. Taking it for granted that it conduces to physical well-being, we cannot help admitting that it is a serious obstacle to spiritual development. According to the philosophers of our country, every being is a perfect Soul..."{আমার বিবেচনায় struggle (লড়াই) এবং competition (প্রতিদ্বন্দ্বিতা) জীবের পূর্ণতালাভের পক্ষে অনেকসময় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। হাজার জীবনকে ধ্বংস করে যদি একটা জীবের ক্রমোন্নতি হয়, – যা পাশ্চাত্যদর্শন সমর্থন করে, তা হলে বলতে হয় এই evolution (ক্রমবিকাশ) দ্বারা সংসারের বিশেষ কোনো উন্নতিই হচ্ছে না। সাংসারিক উন্নতির কথা স্বীকার করে নিলেও আধ্যাত্মিক বিকাশকল্পে ওটা যে বিষম প্রতিবন্ধক, একথা স্বীকার করতেই হয়। আমাদের দেশীয় দার্শনিকগণের অভিপ্রায় জীবমাত্রই পূর্ণ আত্মা }।[৮]

স্বামী বিবেকানন্দ এই পূর্ণতা ও পবিত্রতাকেই সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পবিত্র ভারতীয় দর্শনের পত্র–পল্লব–পুষ্পের সমূহ থেকে পূর্ণ 'বেদান্ত–পারিজাত'কে চয়ন করেছিলেন। কিন্তু একথা তিনি কখনই বিস্মৃত হননি যে, বেদান্তের ক্ষুদ্র চারাগাছ যে উর্বর মৃত্তিকায় প্রোথিত, সেই মৃত্তিকা সাংখ্যের হাতেই প্রস্তুত হয়েছিল। সেইকারণেই, বেদান্ত আলোচনার প্রতিটি পদক্ষেপে

তিনি সাংখ্যপ্রণেতা মহর্ষি কপিলকে স্মরণ করেছেন। আর এরূপ স্মরণকালে আবারও তাঁর ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা ও পবিত্রতা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর বক্তব্যে– “As says our great philosopher Kapila, if purity has not been the nature of the soul, it can never attain purity afterwards, for anything that was not perfect by nature, even if it attained to perfection, that perfection would go away again. Therefore, say all our philosophers, good is our nature, perfection is our nature, not imperfection, not impurity — and we should remember that”. {আমাদের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কপিল বলিয়াছেন, যদি পবিত্রতা আত্মার স্বরূপ না হয় তবে আত্মা কখনই পরে পবিত্রতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে না কারণ যাহা স্বভাবতঃই পূর্ণ নহে তাহা কোনোরূপ পূর্ণতা লাভ করিলেও ঐ পূর্ণতা আবার চলিয়া যাইবে। ...এজন্য আমাদের সকল দার্শনিক বলেন পবিত্রতাই আমাদের স্বভাব, অপবিত্রতা নয়। পূর্ণত্বই আমাদের স্বভাব, অপূর্ণতা নয়}।[৯]

গৃহী হোক বা গৃহীর বিপরীত, সামগ্রিক আলোচনার সন্ধান কিন্তু পূর্ণতার প্রতিই। এরূপই একজন পূর্ণতার সাধক প্রাবন্ধিক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। দর্শনের তর্ক–বিতর্কে, নাকি বিজ্ঞানের পরীক্ষা–নিরীক্ষায়, নাকি সাহিত্যের প্রসাদ–মাধুর্যতায় তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তা নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা হতে পারে। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না, বিজ্ঞানকে তিনি উপরের খোলস থেকে দেখেননি; দেখেছেন নিজ বিশ্বাস–অবিশ্বাস তথা আনন্দ–নিরানন্দের সাথে মিলিয়ে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যথার্থ বলেছেন, “দর্শনই হউক বা বিজ্ঞানই হউক, ইতিহাসই হউক বা প্রত্নতত্ত্বই হউক– রামেন্দ্রবাবু যাহা লিখিতেন, তাহা যে শুধু প্রাঞ্জল হইত এমন নয়, সত্য সত্যই তাহার মধুরতায় প্রাণকে জল করিয়া দিত, পড়িতে কবিতার মত বোধ হইত, কল্পনায় মাখামাখি থাকিত, রসে ও ভাবে ভোর করিয়া দিত”।[১০] চর্চায় অভিনবত্ব ও সূক্ষ্মতা থাকলে যেকোনও মাপের চর্চা যেকোনও ভাষায় সম্ভব– এর দৃষ্টান্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়। দর্শন তাঁর কাছে কেবল ‘কথার মারপ্যাঁচ’ নয়, তা বৈজ্ঞানিক সত্যবিচারের মঞ্চ (platform)। এবং এই দুই পথে তিনি হেঁটে গেছেন সাহিত্যসুধা বর্ষণের মধ্যে দিয়ে।

উক্ত ‘ত্রয়ী’র রচনায় একটি বিশেষ স্তর লক্ষ্য করার মত। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনায় শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার অনুপাত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার তুলনায় বেশি, অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দের আলোচনায় এই সমীকরণ অনেকটা সমান অনুপাতেই উপলব্ধ আর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর আলোচনায় শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার তুলনায় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার অনুপাত অনেক বেশি। এইরূপ বিশেষ স্তরের কোনও বিশেষ কারণ আছে কিনা, বলা মুশকিল; তবে সবার রচনাতেই সাহিত্যের বৃন্তে ভর করে দর্শন ও বিজ্ঞানের দুটি কুসুমকে প্রস্ফুটিত করার সার্থক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

বাঙালির দর্শন চিন্তার ও চর্চার প্রসঙ্গে অধ্যাপক রামদুলাল রায় তাঁর “বাঙালির দর্শন: প্রাচীন কাল থেকে সাম্প্রতিক কাল” গ্রন্থে জনৈক সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধার করেছেন, “বাঙালির ধর্মকর্মে ঐতিহ্য আছে, বর্ণাঢ্য কাব্যসাহিত্য ও শিল্পকলা আছে; কিন্তু উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কোন দর্শন নেই। বাঙালি সংকর জাতি। জলবায়ুগত কারণে বাঙালি মাত্রেই আবেগপ্রবণ, জীবনবিরাগী, কর্মবিমুখ ও পরলোকমুখী। তাছাড়া দর্শনচর্চার জন্য যে দৃঢ় মানসিকতা ও যুক্তিনিষ্ঠতা থাকা দরকার বাঙালির তা নেই। বাঙালির দর্শন চিন্তায় শুদ্ধ চর্চার ঐতিহ্য বিশেষ পরিপুষ্ট নয়”।[১১] এই অভিযোগ অবশ্য সর্বৈব সত্য নয়। প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় বাংলার দিকে দৃষ্টিপাত করলে যেমন ভারতীয় দর্শন বিশেষত আস্তিক দর্শনের উপর অনেক সুচিন্তিত ব্যাখ্যা ও আলোচনা দেখতে পাওয়া যায় তেমনই নবজাগরণের পর প্রাচ্য দর্শনের সাথে সাথে পাশ্চাত্য দর্শনেও আধুনিক বাঙালির দর্শন চিন্তা ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব বাঙালির চিন্তাজগতে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল, সেই ভাব ও চিন্তাধারাকে আত্মসাৎ করে বাঙালি তার সূক্ষ্ম ভাবকল্পনা ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতিরসে দার্শনিক চর্চার পৌরোহিত্য করেছিল। মোহিতলাল মজুমদার বাঙালির এই সূক্ষ্ম ভাবকল্পনা ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতিরসের উপলব্ধির প্রশংসা করেছেন, "বাঙ্গালী যেমন সূক্ষ্ম ভাবকল্পনা ও অতীন্দ্রীয় অনুভূতিরসের রসিক, তেমনই, সে সেই রসকে বস্তু বা বিষয়নিরপেক্ষরূপে ভোগ করিতে ইচ্ছুক নয়; সে এই দেহেরই সূক্ষ্মতর অধিষ্ঠানে, সহস্রদল নাড়ীপদ্মে তত্ত্বমধু ভুঞ্জনের পক্ষপাতী..."।[১২] আগামী দিনে এই দর্শন চিন্তার প্রবাহ কোন দিকে– তার উত্তর অবশ্য আগামীর জন্য তোলা থাক; তবে যুক্তিশীল বাঙালির দর্শন চিন্তা ও চর্চা অত্যন্ত ক্ষীণস্রোতা হয়েও যে প্রবহমান থাকবে, এরকম আশা করা চলে।

ভারতবর্ষে দার্শনিক ও মনোবৈজ্ঞানিক আলোচনার ইতিহাস যতদিন থাকবে, ততদিন মহর্ষি কপিলের প্রভাব শ্রদ্ধার সাথে স্বীকার করতে হবে কারণ মতপার্থক্য থাকলেও, যুক্তিনির্ভর দর্শন চিন্তার প্রতিটি পদক্ষেপেই দীপ্ত, উজ্জ্বল ও বিস্ময়কর কপিল–পরম্পরার চিন্তার ছাপ স্পষ্টতই লক্ষ্য করা যায় বলে স্বামী বিবেকানন্দ মনে করেন– "Every philosophy and every system in India- I mean throughout the world- owes much to Kapila, perhaps the greatest name in the history of India in psychological and philosophical lines. The influence of Kapila is everywhere seen throughout the world. Whereever there is a recognised system of thought, there you can trace his influence; even if it be thousands of years back, yet he stands there, the shining, glorious, wonderful Kapila. His psychology and a good deal of his philosophy have been accepted by all the sects of India with but very little differences"। {সমগ্র ভারতের, এমনকি সমগ্র জগতের সকল দর্শন ও সকল মতই কপিলের নিকট বিশেষ ঋণী। সম্ভবতঃ মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক দিক দিয়া ভারতের ইতিহাসে কপিলেরই নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। জগতে সর্বত্রই কপিলের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে কোন সুপরিচিত দার্শনিক মত বিদ্যমান, সেইখানেই তাঁহার প্রভাব দেখিতে পাইবে। উহা সহস্র বৎসরের প্রাচীন হইতে পারে, তথাপি সেখানে সেই তেজস্বী মহামহিমময় অপূর্বপ্রতিভাসম্পন্ন কপিলের প্রভাব দেখিতে পাইবে। তাঁহার মনোবিজ্ঞান ও দর্শনের অধিকাংশ অতি সামান্য সামান্য পরিবর্তন করিয়া ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছে।}।[১৩] তাই সাংখ্যকে ভারতীয় দর্শনের কেবল একটি শাখা মাত্র রূপে বিচার করলে সঠিক বিচার হয় না, বরং একথা বললে হয়তো অত্যুক্তি হয় না যে সাংখ্যই ভারতের দর্শন। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের ভাষায়– *Sāṁkhya is not one of the systems of Indian Philosophy. Sāṁkhya is the philosophy of India!*[১৪]

@@@@@

উল্লেখপঞ্জি

[১] অনন্তলাল ঠাকুর, "ভারতীয় দর্শনে বাঙালীর প্রাধান্য সংশয়াতীত", *নিবন্ধাবলী* , পৃ. ৩৬৩

[২] সুশীল কুমার গুপ্ত, *ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ,* পৃ. ২৩৮

[৩] অনন্তলাল ঠাকুর, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৬৩

[৪] ভবতোষ দত্ত, *চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র,* পৃ. ১৫

[৫] অরবিন্দ পোদ্দার, *বঙ্কিম-মানস,* পৃ. ৯০

[৬] বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ সংস্করণ), দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৬৮০

[৭] অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষের কথায়, "এমন লোকও মাঝে মাঝে দেখা যায়, যাঁদের রচনাগত ব্যক্তিত্ব এবং দৈনন্দিন জীবনের ব্যক্তিত্বে কোনো পার্থক্য নেই। অন্তরে ও বাহিরে যে বিদ্যুৎ ও বৈচিত্র্য তাঁরা জীবনে প্রকাশ করেন, তাঁদের রচনায়ও তার অবিকল ছায়াপাত। বাস্তব ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বে তখন কোনো পার্থক্য থাকে না। *The style is the Man* কথাটিকে ঘুরিয়ে বলা চলে *The Man is the style* (ব্যক্তিই শৈলী)। বাংলাসাহিত্যে বিবেকানন্দ সেই শ্রেণীর লেখক"। (প্রণবরঞ্জন ঘোষ, *বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য* , পৃ. ৫৩৭)

[৮] *The Complete Works of Swami Vivekananda* (150th Birth Anniversary Ed.), Vol. 7 (*Conversations and Dialogues*), p. 146

[৯] *Ibid.,* Vol. 3 (*The Common Bases of Hinduism*), p. 390-391

[১০] নলিনীরঞ্জন পন্ডিত, *আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর,* পৃ. ২৭

[১১] রামদুলাল রায়, *বাঙালির দর্শন: প্রাচীন কাল থেকে সাম্প্রতিক কাল,* পৃ. ৪১

[১২] সুশীল কুমার গুপ্ত, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৪০

[১৩] *The Complete Works of Swami Vivekananda* (150th Birth Anniversary Ed.), Vol. 3 (*The Vedānta in all its phases*), p. 342

[১৪] *Encyclopedia of Indian Philosophies*, Vol. IV, Ed. Larson & Bhattacharya, Preface, p. xi

ж ж ж ж ж

পরিশিষ্ট
(Appendices)

পরিশিষ্ট - ১

সাংখ্যকারিকা গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ — পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত

ভারতীয় দর্শন পরম্পরায় প্রায় সবকটি সম্প্রদায় 'সাংখ্যে'র উল্লেখ যথেষ্ট সম্মানের সাথে রেখেছেন। একথা ঠিক, অনেকেই সাংখ্যকে তাদের প্রধান প্রতিপক্ষরূপে বিবেচনা করেছেন, তবে একথা ভুললে চলবে না যুক্তি-প্রতিযুক্তির এই সুদীর্ঘ পথে প্রথম পথিক মহর্ষি কপিল এবং তাঁর পদযাত্রার দলিল সাংখ্যদর্শন। মহর্ষি কপিল প্রণীত প্রকৃত সাংখ্যদর্শন অদ্যাবধি উপলব্ধ হয়নি, তাই সাংখ্যদর্শনের উপলব্ধ প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে স্বীকার করা হয় শ্রীমদ্ ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত *সাংখ্যকারিকা* নামক প্রায় সত্তরটি কারিকাবিশিষ্ট এই মৌলিক গ্রন্থটিকে; যেখানে কপিল প্রণীত সাংখ্যের মূল বিষয়গুলিকে শিষ্ট ও শৃঙ্খলিত করা হয়েছে। আর্যা ছন্দে কারিকাকারে বিন্যস্ত হওয়ার দরুন পরবর্তীকালে বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন মেটাতে অনেক টীকাকার এই কারিকার উপর টীকা প্রণয়ন করেছেন। সেইরকম কয়েকটি টীকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য যথা, মাঠরবৃত্তি, গৌড়পাদভাষ্য, জয়মঙ্গলাটীকা ইত্যাদি। বাচস্পতি মিশ্র বিরচিত *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* এপ্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য কারণ সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যায় *সাংখ্যকারিকার* প্রতি চরণে যথার্থ অর্থেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তবে, *যুক্তিদীপিকা* নামের প্রাচীন টীকাটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু এই টীকাতে *সাংখ্যকারিকার* সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা সম্পন্ন হয়েছে।

এখন আলোচনার বিষয় গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ। শাস্ত্রের পত্তনে মঙ্গলাচরণ একটি অবশ্যকর্তব্য বলেই বিবেচিত হয়। অন্নংভট্ট তৎপ্রণীত *তর্কসংগ্রহ* গ্রন্থের স্বকৃত 'দীপিকা' টীকায় স্পষ্টতই স্বীকার করেছেন, ঈপ্সিত গ্রন্থের পরিসমাপ্তির জন্য তথা শিষ্য-প্রশিষ্যদের মধ্যে মঙ্গলাচরণের কর্তব্যতার শিক্ষা দিতে তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভেই ইষ্টদেবতার নমস্কার পূর্বক মঙ্গলাচরণ সম্পন্ন করেছেন।[১] মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিও *মহাভাষ্যের* 'পস্পশাহ্নিকে' শাস্ত্রের আদিতে মঙ্গলজনক শব্দের উল্লেখের তাৎপর্য স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে শাস্ত্রের আদিতে মঙ্গলাচরণ সেই শাস্ত্রের খ্যাতির কারণ এবং ঐ শাস্ত্রের পাঠকের নিকটও বিশেষ ফলপ্রদ।[২] এমনকি বেশিরভাগ কাব্য-নাটক-দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থের শুরুতেও কায়িক-বাচিক-মানসিক যেকোনও রূপে মঙ্গলাচরণের বাস্তবিক উল্লেখ পাওয়া যায়। অতএব, এইসব দিক থেকে প্রশ্ন হয় শ্রীমৎ ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত *সাংখ্যকারিকা* গ্রন্থের আদিতে দেবতানমস্কার পূর্বক অথবা মঙ্গলবাচক শব্দোল্লেখ পূর্বক কোনও প্রকার মঙ্গলাচরণ সম্পন্ন হয়েছে কিনা?

সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী দর্শন। ঈশ্বর স্বীকারে তার কোনও ব্যস্ততা নেই। অতএব দেবতানমস্কার পূর্বক মঙ্গলাচরণের জায়গা সাংখ্যে অন্তত আশা করা উচিত নয়। সেক্ষেত্রে দেবতা সংক্রান্ত মঙ্গলাচরণ নাই বা হলো; অন্তত কোনও মঙ্গলবাচী শব্দ দিয়ে গ্রন্থের শুরু হতে পারতো! সেই মঙ্গলবাচী শব্দটিকে অন্তত মঙ্গলাচরণ বলে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ থাকতো। অর্থাৎ বক্তব্য এই যে, ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত *সাংখ্যকারিকার* প্রথম কারিকাটি শুরু হয়েছে *দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা...* এইরূপে এবং স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে গ্রন্থটির শুরু 'দুঃখ' এইরূপ একটি অমঙ্গলবাচী শব্দ দিয়ে। তাই *যুক্তিদীপিকা* টীকায় পূর্বপক্ষরূপে আপত্তি উত্থাপন করে বলা হচ্ছে *দুঃখমিত্যয়ং চ অমঙ্গলার্থঃ শব্দঃ, তস্মান্নারব্ধব্যং শাস্ত্রাদৌ ইতি* অর্থাৎ 'দুঃখ' এই শব্দটি অমঙ্গলার্থক। এরকম একটি অমঙ্গলার্থক শব্দ দিয়ে শাস্ত্রের আরম্ভ করা অনুচিত।[৩]

অবশ্য *যুক্তিদীপিকা* টীকায় পূর্বপক্ষের এই আপত্তি যুক্তিসহ খণ্ডিত হয়েছে। যুক্তিদীপিকাকার মনে করেন *সাংখ্যকারিকার* পত্তনে যথাবিধি মঙ্গলাচরণ সম্পন্ন হয়েছে এবং সেটি ঐ 'দুঃখ' শব্দের দ্বারাই হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হয়, অমঙ্গলবাচী

একটি শব্দ কীভাবে মঙ্গল বিধান করতে পারে? যুক্তিদীপিকাকার এক অভিনব যুক্তির উপস্থাপন করেছেন এই প্রসঙ্গে– *পদস্যানর্থক্যাদ্ অমঙ্গলার্থত্বানুপপত্তিঃ। বাক্যমর্থপ্রত্যায়নার্থং প্রযুজ্যতে, বিশিষ্টার্থাভিধানাত্। ন পদম্।*[৪] তাঁর মতে 'দুঃখ' শব্দটি অমঙ্গলবাচী বলতে চাইলে বলা হোক; কিন্তু মনে রাখতে হবে ঐ শব্দটি বা পদটি একটি বাক্যের অন্তর্ভুক্ত এবং অমঙ্গলবাচী একটি মাত্র পদ সম্পূর্ণ বাক্যের অনর্থ ঘটাতে সক্ষম নয়। একজন বক্তা তার বক্তব্য উপস্থাপন করতে চাইলে তাকে বাক্যের আশ্রয় নিতে হয়। অতএব বিশেষ অর্থ জ্ঞাপনের সামর্থ্য বাক্যের থাকে; একটি পদ শুধুমাত্র সামান্য অর্থ প্রতিপাদনেই নিবৃত্ত হয়। যুক্তিদীপিকাকার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যেমন 'দেবদত্ত' শব্দটি কর্তা বলে ধরা যায় কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত 'খাওয়া', 'যাওয়া', 'আসা' ইত্যাদি ক্রিয়াপদের সাথে ঐ 'দেবদত্ত' শব্দটি অন্বিত হয়, ততক্ষণ অবধি বিশেষ অর্থ বোঝাতে পারে না। একইভাবে 'গাং' এই শব্দটিকে কর্ম বলে ধরা যায় কিন্তু যতক্ষণ না কোনও কর্তা বা ক্রিয়ার নির্দেশ করা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত বিশেষ অর্থ প্রকাশ করতে পারে না। আবার 'অভ্যাজ' এই ক্রিয়াটির বেলাতেও একই কথা প্রযোজ্য। তবে, ঐ তিনটি শব্দকে বা পদকে যখন একত্র স্থাপন করা হয় অর্থাৎ 'দেবদত্তঃ গাম্ অভ্যাজ' এরূপ একটি বাক্যের রূপ দেওয়া হয়; তখন 'দেবদত্ত গরুটিকে নিয়ে এসো' এই বিশিষ্টার্থের বোধ হয়। অতএব, পদের ধর্ম সাধারণ অর্থ থেকে বিচ্যুত না হওয়া অপরদিকে বাক্যের ধর্ম বিশিষ্টার্থ প্রকাশ করা।[৫] যুক্তিদীপিকাকার তাঁর এই সিদ্ধান্ত উপমার সাহায্যে দুটি শ্লোকে প্রতিস্থাপন করতে চেষ্টা করেছেন–

পৃথঙ্‌নিবিষ্টতত্ত্বানাং পৃথগর্থাভিপাতিনাম্ ।
ইন্দ্রিয়াণাং যথা কার্যমৃতে দেহান্ন লভ্যতে ।।
তথৈব সর্বশব্দানাং পৃথগর্থাভিধায়িনাম্ ।
বাক্যেভ্যঃ প্রবিভক্তানামর্থবত্তা ন লভ্যতে ।।[৬]

অর্থাৎ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি যেমন তাদের নিজ নিজ কার্য যথা রূপ-রসাদির গ্রহণে পৃথক পৃথক রূপে ব্যাপৃত হয়, কিন্তু দেহ বা শরীর ছাড়া ইন্দ্রিয়গুলি কখনই এই কাজ করতে সক্ষম হয় না। তেমনই, পৃথক পৃথক ভাবে অবস্থিত শব্দের পৃথক অর্থ থাকে ঠিকই; কিন্তু বাক্যে অবস্থান ভিন্ন স্বতন্ত্র রূপে তাদের বিশিষ্ট অর্থবত্তা নেই।

অতএব শুধুমাত্র 'দুঃখ' শব্দটির অর্থ দিয়ে বিচার করে অমঙ্গলার্থের দিকে মন্তব্য করলে চলবে না; দেখতে হবে কারিকার প্রেক্ষিতে অর্থাৎ সম্পূর্ণ বাক্যের প্রেক্ষিতে 'দুঃখ' শব্দটি কীসের নির্দেশ দেয়। *দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদপঘাতকে হেতৌ...* ইত্যাদি সম্পূর্ণ বাক্যে, তিন প্রকার দুঃখ হতে নিবারণের উপায়ের কথা প্রস্তাবিত হয়েছে। দুঃখ দূরীকরণ তো মঙ্গলজনকই। যেমন, যখন বলা হয় 'অলক্ষীর্মা ভূত্' অর্থাৎ অলক্ষী না থাক; তখন 'অলক্ষী' এই শব্দটি থাকলেও মঙ্গলজনক অর্থেই এই সম্পূর্ণ বাক্যটি। কিংবা যখন বলা হয় 'ব্যাধ্যপগমঃ স্যাত্' অর্থাৎ ব্যাধি দূর হোক; তখন 'ব্যাধি' এই শব্দটি থাকলেও মঙ্গলজনক আশয়েই এই সম্পূর্ণ বাক্যটি। যুক্তিদীপিকাকার তাঁর সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করে জানাচ্ছেন– *যত্ হি দুঃখপ্রহাণার্থং বাক্যমুপাদীয়তে তন্মঙ্গলার্থং দৃষ্টম্। তদ্ যথা ব্যাধ্যপগমঃ স্যাদ্, অলক্ষীর্মা ভূদিতি। দুঃখপ্রহাণার্থং চেদং বাক্যমুপাত্তং তস্মাত্ মঙ্গলার্থমিদম্।*[৭] সুতরাং, শাস্ত্রের শুরু অমঙ্গলবাচী শব্দ দিয়ে হয়েছে বা শাস্ত্রের পত্তনে কোনওরূপ মঙ্গলাচরণ দৃষ্ট হয় না; এইরকম পূর্বপক্ষের অভিযোগ যুক্তিদীপিকারের দিক থেকে খণ্ডিত হয়েছে।

সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র বাচস্পতি মিশ্র খুব অল্প হলেও এব্যাপারে দৃষ্টিপাত করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন 'দুঃখ' শব্দটি অমঙ্গলার্থেই উপলব্ধ। তবে শাস্ত্রারম্ভে এই 'দুঃখ' শব্দ কোনওভাবেই দুঃখের আবাহনের জন্য নয় বরং দুঃখের পরিহারের জন্যই। দুঃখের আবাহন নিশ্চিতভাবেই অমঙ্গলজনক কিন্তু দুঃখের পরিহার অমঙ্গলজনক হতে পারে না। স্বাভাবিকভাবেই

শাস্ত্রের শুরুতে সেই 'দুঃখ' শব্দটির উচ্চারণ মঙ্গলার্থই সূচিত করে–*যদ্যপি দুঃখমমঙ্গলম্ তথাপি তত্‌পরিহারার্থত্বেন তদপঘাতো মঙ্গলমেবেতি যুক্তং শাস্ত্রাদৌ তত্‌কীর্তনমিতি*[৮] সুতরাং ঈশ্বরকৃষ্ণপ্রণীত *সাংখ্যকারিকা* গ্রন্থের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ সম্পন্ন হয়েছে একথা স্থির করা চলে।

এখন দেখা যাক টীকাকারগণ 'দুঃখ' শব্দটিকে মঙ্গলবাচী প্রমাণ করে তার দ্বারা মঙ্গলাচরণ সিদ্ধিতে এতখানি তৎপর হয়েছেন কেন? তর্কসংগ্রহকার অন্নংভট্ট স্বকৃত দীপিকা টীকায় একটি পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তের অবতারণা করে এই বিষয়টি অনেকখানি স্পষ্ট করে দিয়েছেন বলে বোধ হয়। পূর্বপক্ষটি এই যে, গ্রন্থসমাপ্তিই যদি মূল উদ্দেশ্য হয় সেক্ষেত্রে *কাদম্বরী* গ্রন্থে মঙ্গলাচরণ হওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থসমাপ্তি হয়নি আবার *কিরণাবলী* গ্রন্থে মঙ্গলাচরণ না হওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থ সমাপ্তি হয়েছে। এই আপত্তির সিদ্ধান্তে তিনি যুক্তি দিয়েছেন, *কাদম্বরী* গ্রন্থে বিঘ্নের আধিক্য থাকায় তা ঐ অল্পপরিমাণ মঙ্গলাচরণে বিনষ্ট হয়নি অপরদিকে *কিরণাবলী* গ্রন্থে বাচিক মঙ্গলাচরণ না থাকলেও সেখানে কায়িক বা মানসিক মঙ্গলাচারণ নিশ্চয় হয়েছে।[৯] গ্রন্থের প্রারম্ভে উল্লিখিত হয়নি কারণ গ্রন্থকার শিষ্যশিক্ষার্থে প্রয়োজন মনে করেননি। অন্নংভট্টকৃত এই দ্বিতীয় যুক্তি অবলম্বন করে যদি বলা যায় যে, *সাংখ্যকারিকাকার* শ্রীমদ্ ঈশ্বরকৃষ্ণও কায়িক বা মানসিক মঙ্গলাচরণ সম্পন্ন করে গ্রন্থারম্ভে প্রবৃত্ত হয়েছেন এবং শিষ্যশিক্ষার্থের প্রয়োজন মনে না করে গ্রন্থারম্ভে উল্লেখের প্রয়োজন বোধ করেননি; তাহলে সেই প্রস্তাব গ্রহণ না করার বিশেষ কারণ থাকে না! অথচ টীকাকারগণ এই পথে না হেঁটে, যখন বাচিক মঙ্গলাচরণ প্রতিপন্ন করতে অমঙ্গলবাচী শব্দার্থ থেকে মঙ্গলার্থক বাক্যার্থের দিকে অগ্রসর হয়েছেন, তখন শিষ্টাচার বিষয়ে শিষ্যশিক্ষার্থের দিকটি যেমন আলোকিত হয়, তেমনই সম্প্রদায়ের উপলব্ধ একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থকে 'খুঁতহীন' করার অদম্য প্রয়াসও আভাষিত হয়।

উল্লেখপঞ্জি

---

[১] চিকীর্ষিতস্য গ্রন্থস্য নির্বিঘ্ন-পরিসমাপ্ত্যর্থং শিষ্টাচারানুমিত-শ্রুতিবোধিত-কর্তব্যতাকমিষ্টদেবতা-নমস্কারলক্ষণং মঙ্গলং শিষ্যশিক্ষার্থং নিবধ্নন্ চিকীর্ষিতং গ্রন্থাদৌ প্রতিজানীতে নিধাযেতি {নিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারি (সম্পা.), *তর্কসংগ্রহ*, মঙ্গলাচরণ, দীপিকা টীকা, পৃ.১}

[২] মঙ্গলাদীনি হি শাস্ত্রাণি প্রথন্তে বীর পুরুষাণি চ ভবন্ত্যাযুস্মত্ পুরুষাণি চ অধ্যেতারশ্চ সিদ্ধার্থা যথা স্যুরিতি {দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম (সম্পা.), *পতঞ্জলি-প্রণীত মহাভাষ্য* (পস্পশাহ্নিক), পৃ. ১৪৯}

[৩] যদুপতি ত্রিপাঠি (সম্পা.), *যুক্তিদীপিকা*, পৃ. ১৮

[৪] তত্রৈব

[৫] An independent word is not capable of conveying a particular meaning as it does not deviate from its general meaning. It is for this reason that it is not considered to be capable of conveying the desired meaning. (*Cf*. Shiv Kumar & D N Bhargava (ed.), *Yuktidīpikā*, p. 28)

[৬] যদুপতি ত্রিপাঠি (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

[৭] তত্রৈব

[৮] নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী (সম্পা.), *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*, পৃ. ১৮

[৯] "মঙ্গলে কৃতেঽপি কাদম্বর্যাদৌ নির্বিঘ্নপরিসমাপ্ত্যদর্শনাত্ মঙ্গলাভাবেঽপি কিরণবল্যাদৌ সমাপ্তিদর্শনাদন্বয়ব্যতিরেক-ব্যভিচারাদিতি চেন্ন। কাদম্বর্যাদৌ বিঘ্নবাহুল্যাৎ সমাপ্ত্যভাবঃ কিরণবল্যাদৌ তু গ্রন্থাদ্ বহিরেব মঙ্গলং কৃতম্..."। {নিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারি (সম্পা.), *তর্কসংগ্রহ*, মঙ্গলাচরণ, দীপিকা টীকা, পৃ.১}

ж ж ж ж ж

পরিশিষ্ট - ২

কপিল: দার্শনিক-ঋষি-ভগবান-সিদ্ধ-অবতার

কপিল কে ছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে ভারতীয় দর্শনের পাঠক বা শ্রোতা দ্বিতীয়বার ভাবার অবসর না নিয়ে বলবেন 'সাংখ্যদর্শনের প্রবক্তা'। কিন্তু সমস্যা হলো, 'কপিল' নামক এই মানুষটির (!) একটি বা দুটি নয়, অনেকগুলি পরিচয় আমাদের কাছে উপলব্ধ। পাঠকের মনে হতে পারে, থাকলই বা এতগুলি পরিচয়; তা নিয়ে আলোচনার কী এমন আছে? তার উত্তর এই যে, 'কাহিনী-কল্পকথা-কিংবদন্তি'র বাইরে বেরিয়ে এসে একেবারে কঠোর সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখলেও, জনসমক্ষে একজনের এইরূপ বহুবিধ পরিচয়ে পরিচিতি প্রমাণ করে তিনি কতখানি প্রসিদ্ধ ছিলেন তাঁর সময়ে। প্রসিদ্ধি এতটাই উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে সেই ব্যক্তি কখনও 'মানসপুত্র', কখনও 'অবতার', কখনও 'সিদ্ধ', আবার কখনও 'ভগবান' রূপে উল্লিখিত হয়েছেন। তাই এই যাত্রাপথে দেখা যাক কপিলের পরিচয় শুধুই সাংখ্যদর্শনের প্রবক্তারূপে নাকি তা থেকে অতিরিক্ত কিছু?

হিন্দী ভাষায় সাংখ্য সম্পর্কে যে কয়জন বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, তাদের মধ্যে পণ্ডিত উদয়বীর শাস্ত্রী হলেন অন্যতম। তিনি তাঁর *সাংখ্য দর্শন কা ইতিহাস* গ্রন্থে কপিল সম্পর্কে বর্ণনা শুরুর আগেই আক্ষেপ ও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে 'কপিল' একজন নাকি একাধিক এ নিয়ে বিদ্বানদের তর্ক-বিতর্কের অন্ত নেই অথচ এতাবৎ কাল অবধি কোনও সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায়নি।[১] বলা বাহুল্য কপিল প্রণীত কোনও গ্রন্থ অদ্যাবধি উপলব্ধ হয়নি। কালের গর্ভে সেইসব সম্ভবত বিলীন হয়ে গেছে। সুতরাং আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কপিল সম্পর্কে তথ্য-প্রমাণ হাতে নিয়ে জোর দিয়ে কোনও কিছু বলার অবকাশ নেই। তথাপি *মহাভারত*, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, *ভাগবত্পুরাণ* ও অন্যান্য বেশ কিছু প্রসিদ্ধ গ্রন্থে আমরা কপিলের উল্লেখ পাই এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্বকই উল্লেখ পাই। মোটামুটিভাবে যে চারজন কপিলের উল্লেখ বিবিধ গ্রন্থে উপলব্ধ, তাঁরা হলেন-

- প্রথম, গৌতম ঋষির বংশজ কপিল।
- দ্বিতীয়, ব্রহ্মার মানসপুত্র কপিল।
- তৃতীয়, বিষ্ণুর অবতার কপিল।
- চতুর্থ, অগ্নির অবতার কপিল।

এর মধ্যে প্রথম যে কপিলের কথা বলা হচ্ছে, তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত মত এই, কপিলাবস্তু নগরের নাম এই কপিলের নাম থেকেই হয়েছে। অনেক বৌদ্ধগ্রন্থে এই বিষয়টির উল্লেখও আছে- এমনটি উদয়বীর শাস্ত্রী একটি হিন্দি ভাষার পত্রিকা থেকে উদ্ধার করেছেন।[২] এখন খুব স্বাভাবিকভাবেই এই বিষয়টি বোঝা যায় যে, সাংখ্যদর্শনের প্রণেতারূপ যে কপিল তিনি আরও প্রাচীন। সুতরাং জনৈক কপিলের নাম থেকে কপিলাবস্তু নগরের নাম হলেও সেই কপিল কোনওভাবেই সাংখ্যদর্শনপ্রণেতা কপিল নন।

দ্বিতীয় যে কপিল অর্থাৎ ব্রহ্মসুত বা ব্রহ্মার মানসপুত্র বলে যাঁর পরিচয়, তাঁর বিবরণ পাওয়া যায় *সাংখ্যকারিকার* উপর আচার্য গৌড়পাদ রচিত ভাষ্য থেকে। আচার্য গৌড়পাদ ভাষ্যের প্রথমেই বলেছেন– *ইহ ভগবান্ ব্রহ্মসুতঃ কপিলো নাম। তদ্ যথা–*

সনকশ্চ সনন্দনশ্চ তৃতীযশ্চ সনাতনঃ

আসুরিঃ কপিলশ্চৈব বোঢুঃ পঞ্চশিখস্তথা

ইত্যেতে ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ সপ্ত প্রোক্তা মহর্ষযঃ।[৩]

অর্থাৎ সাতজন ব্রহ্মসুতের (সনক, সনন্দন, সনাতন, আসুরি, কপিল, বোঢু, পঞ্চশিখ) মধ্যে অন্যতম হলেন কপিল। কিন্তু আচার্য গৌড়পাদ এই কারিকার উৎসস্থান নির্দেশ করেননি। সম্ভবত কপিলের মাহাত্ম্য এতই বিস্তৃত ছিল যে, কপিল সম্পর্কে যেকোনও উক্তিই শ্রদ্ধার সাথে গৃহীত হত। যাইহোক, উদয়বীর শাস্ত্রী মহাশয় একটি যুক্তি রেখেছেন এই স্থলে। তাঁর মতে আচার্য গৌড়পাদ এই কারিকা কোনও পুরাণ থেকে সংগ্রহ করেছেন এবং 'ব্রহ্মসুত' এই কথাটির মধ্যে দিয়ে বুঝতে হবে কপিল ছিলেন ব্রহ্মার সমান গুণ ও জ্ঞান বিশিষ্ট।[৪] বস্তুত, এই তথ্য থেকে সাংখ্যদর্শন রচনার পক্ষে বা বিপক্ষে কিছুই প্রমাণিত হয় না। শুধুমাত্র 'ব্রহ্মসুত' এই শব্দটিতে কপিলের এক অলৌকিকত্বের বা অসাধারণত্বের চিত্র পরিস্ফুট হয়।

তৃতীয় যে কপিল অর্থাৎ বিষ্ণুর অবতাররূপে যার পরিচিতি; *শ্রীমদ্ভাগবত্-মহাপুরাণে* তাঁর সম্পর্কে সবথেকে বেশি পরিচয় উপলব্ধ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে উক্ত কাহিনীটি উপলব্ধ হয়। প্রজাপতি ব্রহ্মার ইচ্ছায় ঋষি কর্দম সরস্বতী নদী তীরে ভগবান বিষ্ণুর তপস্যায় নিযুক্ত হন। দীর্ঘ তপস্যায় পরিতুষ্ট হয়ে ভগবান বিষ্ণু ঋষি কর্দমকে আশ্বস্ত করেন যে মনুপুত্রী দেবহুতির সাথে ঋষি কর্দমের পরিণয়ে তাদের পুত্ররূপে তিনি অবতীর্ণ হবেন এবং তত্ত্বসংহিতার প্রণয়ন করবেন– *সহাহং স্বাংশকলযা ত্বদ্বীর্যেণ মহামুনে/তব ক্ষেত্রে দেবহুত্যাং প্রণেষ্যে তত্ত্বসংহিতাম্।*[৫] এরপর দৈবনির্দেশ মতোই ঋষি কর্দমের সাথে দেবহুতির পরিণয় সম্পন্ন হয় এবং তাদের পুত্ররূপে ভগবান বিষ্ণু কপিল দেহ ধারণ করেন। অন্যান্য ঋষিদের সাথে স্বয়ং ব্রহ্মা সেখানে উপস্থিত হয়ে কর্দম ও দেবহুতিকে জাত পুত্রের অনেক গুণগান ব্যাখ্যা করেন। ঋষি কর্দম ও দেবহুতির এই পুত্র সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অবতার। অবিদ্যাদি সংশয় ছিন্ন করে ইনি সিদ্ধসমুদয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করবেন ও সাংখ্যাচার্যদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হবেন। জগৎ-সংসারে এর প্রসিদ্ধি হবে 'কপিল' নামে–

এষ মানবি তে গর্ভে প্রবিষ্টঃ কৈটভার্দনঃ
অবিদ্যাসংশযগ্রন্থিং ছিত্ত্বা গাং বিচরিষ্যতি
অযং সিদ্ধগণাধীশঃ সাংখ্যাচার্যৈঃ সুসম্মতঃ
লোকে কপিল ইত্যাখ্যাং গন্তা তে কীর্তিবর্ধনঃ"।[৬]

অতএব, *শ্রীমদ্ভাগবত্-মহাপুরাণকে* অনুসরণ করলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা চলে যে, ঋষি কর্দম ও দেবহুতির পুত্র কপিল, যাকে বিষ্ণুর অবতাররূপে স্পষ্ট করা হয়েছে, তিনিই সাংখ্যশাস্ত্রের প্রবর্তক।

উদয়বীর শাস্ত্রী মহাশয় এইস্থলে 'ব্রহ্মসুত' বা ব্রহ্মার মানসপুত্রের ধারণাটিকে নিজ যুক্তি দিয়ে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। কপিলের জন্মকালে যেহেতু ব্রহ্মার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় এবং তিনি যেহেতু ব্রহ্মার সমান গুণ ও জ্ঞান বিশিষ্ট; তাই কপিলের নামের সাথে 'ব্রহ্মার মানসপুত্র' এই বিশেষণটি যোগ হতে বিশেষ সময় লাগেনি।[৭] অর্থাৎ এই যুক্তিতে কিঞ্চিৎ

পক্ষপাত করলে বোঝা যাবে ব্রহ্মসুত্ররূপে দ্বিতীয় যে কপিলের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তিনি আসলে পৃথক কেও নন; একই ব্যক্তি।

চতুর্থ যে কপিলের পরিচয় উপলব্ধ হয়, তিনি অগ্নির অবতার রূপে প্রসিদ্ধ। *তত্ত্বসমাসসূত্রের* উপর রচিত 'সর্বোপকারিণী' টীকাতে টীকাকার ঘোষণা করেছেন, বৈশ্বানর অর্থাৎ অগ্নির অবতার কপিল *সূত্রষড়াধ্যায়ীর* রচয়িতা। এবং সেই *সূত্রষড়াধ্যায়ীর* মূলীভূত *তত্ত্বসমাসসূত্রের* প্রণেতা হলেন নারায়ণ অর্থাৎ বিষ্ণুর অবতার কপিল। 'সর্বোপকারিণী' টীকায় উক্ত হয়েছে- *সূত্রষড়াধ্যায়ী তু বৈশ্বানরাবতার-মহর্ষি-ভগবত্-কপিলপ্রণীতা, ইয়ং তু দ্বাবিংশতিসূত্রী তস্যা অপি বীজভূতা নারায়ণাবতার-মহর্ষি-ভগবত্-কপিলপ্রণীতেতি বৃদ্ধাঃ।*[৮] লক্ষ্য করার বিষয় যে, দুজন কপিলের কথা বলেছেন টীকাকার। একজন অগ্নির অবতার, অপরজন বিষ্ণুর অবতার। একজন *সূত্রষড়াধ্যায়ী* প্রণেতা অপরজন *তত্ত্বসমাসসূত্রের* প্রণেতা।

উদয়বীর শাস্ত্রী মহাশয় এখানেও একটি অনবদ্য যুক্তির অবতারণা করেছেন এবং চেষ্টা করেছেন প্রমাণ করার যে অগ্নির অবতার রূপে যে কপিলের কথা বলা হয়েছে তিনি আসলে পৃথক নন, একই ব্যক্তি। *বাল্মীকি-রামায়ণে* 'আদিকাণ্ডে' সগর রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের উপাখ্যানটি তিনি নির্দেশ করেছেন। উপাখ্যানটি এইরকম- সগর রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব ইন্দ্র অপহরণ করেন ও পাতালে লুকিয়ে রাখেন। তখন রাজার আদেশে তার ষাট হাজার পুত্র পৃথিবীর সর্বত্র খনন করতে থাকেন যজ্ঞাশ্বের খোঁজে। এইভাবে পৃথিবী খনন করতে থাকলে বহু প্রাণীর প্রাণনাশ হচ্ছে দেখে দেবতারা প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট গেলেন এই সমস্যার প্রতীকারের জন্য। ব্রহ্মা দেবতাদের জানালেন, স্বয়ং বাসুদেব এই ধরার স্বামী এবং তিনি কপিল রূপ গ্রহণ করেছেন। সময় উপস্থিত হলে সেই কপিলের ক্রোধাগ্নিতে সগর রাজার পুত্ররা ভস্মীভূত হবেন। সগর রাজার পুত্রেরা যখন পাতাল প্রবেশ করলেন তখন সমাধিস্থ কপিলের পাশে যজ্ঞাশ্বটিকে দেখতে পেয়ে কপিলকে বধ করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু অমিতপ্রভাব মহাত্মা কপিলের ক্রোধে সকলেই ভস্মরাশিতে পরিণত হলেন-

রোষেণ মহতাবিষ্টো হুংকারমকরোত্তদা
ততস্তেনাপ্রমেয়েণ কপিলেন মহাত্মনা
ভস্মরাশীকৃতাঃ সর্বে কাকুত্স্থ সগরাত্মজাঃ।[৯]

ক্রোধপরবশ হয়ে মহাত্মা কপিল কর্তৃক সগরপুত্রদের এই ভস্মরাশিতে পরিণত করার ঘটনাটিই পরবর্তীকালে এই ধারণার জন্ম দিয়েছে যে মহর্ষি কপিল অগ্নির অবতার।[১০] বস্তুত, ক্রোধ অগ্নিতুল্য। 'রাগে অগ্নিশর্মা', 'তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠা' ইত্যাদি প্রবাদে ক্রোধের অগ্নিস্বরূপতা লোকসমাজে প্রসিদ্ধ। তাই, শাস্ত্রীমহাশয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মহর্ষি কপিল প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণুরই অবতার যিনি দেবহুতি ও কর্দম থেকে জন্মলাভ করেছিলেন তবে সগরপুত্রদের ক্রোধে ভস্মীভূত করেন বলে তাঁকে অগ্নির অবতার বলে মনে করা হয়।[১১]

অবশ্য এই যুক্তিতে একটি সমস্যা আছে। মহর্ষি কপিলের ক্রোধের কারণে যদি তাকে অগ্নির অবতার বলে মানা হয়, তাহলে অন্যান্য অনেক মুনি-ঋষি আছেন (যেমন-ঋষি দুর্বাসা), যাঁরা তাদের ক্রোধের জন্য খ্যাত। সেই দিক থেকে তাঁদেরও অগ্নির অবতার হিসেবে স্বীকার করতে হয়! ফলত, শাস্ত্রীমহাশয়ের সঙ্গতিকরণের প্রয়াস সাধুবাদার্হ হলেও সম্পূর্ণ বলা যায় না।

সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র বাচস্পতি মিশ্র মহোদয় *সাংখ্যকারিকার* ব্যাখ্যাকালে মহর্ষি কপিলকে আদিবিদ্বান ও ভগবান বলে সম্বোধন করেছেন ও দেখিয়েছেন তিনি একজন 'সাংসিদ্ধিক' অর্থাৎ সিদ্ধ। বাচস্পতি মিশ্রের ভাষায়– *প্রাকৃতিকাঃ স্বাভাবিকা–ভাবাঃ সাংসিদ্ধিকাঃ। তথা হি সর্গাদৌ আদিবিদ্বান্ ভগবান্ কপিলো মহামুনির্ধর্ম–জ্ঞান–বৈরাগ্যৈশ্বর্য্যসম্পন্নঃ প্রাদুর্বভুবেতি স্মরন্তি* অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে আদিবিদ্বান, ভগবান মহামুনি কপিল ধর্ম–জ্ঞান–বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যমন্ডিত হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ধর্মাদি লাভের জন্য তাঁকে কোনও উপায় অবলম্বন করতে হয়নি, আবির্ভাব থেকেই তিনি ধর্ম–জ্ঞান–বৈরাগ্য–ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি ভাবের অধিকারী।[১২] অর্থাৎ তিনি একজন সিদ্ধ।

সুতরাং মহর্ষি কপিল একজন অবতার নাকি ঋষি নাকি সিদ্ধ - এক নিঃশ্বাসে বলা মুশকিল। অমিত প্রভাবে তিনি এতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ 'মনের মাধুরী' মিশিয়ে তাঁকে এক এক রূপে দেখেছিলেন বা বলা ভালো দেখতে চেয়েছিলেন। বিশ্বাস–অবিশ্বাসের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি, ব্রহ্মার মানসপুত্র– হতেও পারেন নাও পারেন! বিষ্ণুর অবতার - মানা যেতে পারে নাও পারে! সাংসিদ্ধিক– সম্ভব আবার অসম্ভবও! তবে যুক্তিগতভাবে যে কথাটি স্থির নিশ্চয়ে বলা চলে তা হলো, তিনি ভারতীয় দর্শনকে দার্শনিক যাত্রার অভিমুখ নির্দেশ করেছিলেন তাঁর চিন্তাভাবনা ও রচনার (অদ্যাবধি অনুপলব্ধ) মধ্যে দিয়ে। অতএব, তাঁর অন্য পরিচয় নিয়ে হাজারো বিতর্ক থাকতে পারে, তর্কের জাল বোনা যেতে পারে কিন্তু তাঁর 'দার্শনিক' পরিচয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই।

উল্লেখপঞ্জি

[১] উদয়বীর শাস্ত্রী, *সাংখ্য দর্শন কা ইতিহাস*, পৃ. ৩

[২] শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রী তৈলংগ, *সাংখ্য শাস্ত্র কে কর্তা*, সরস্বতী (হিন্দী মাসিক পত্রিকা)

[৩] *সাংখ্যকারিকা*, ১ম কারিকা, গৌড়পাদভাষ্য { Har Dutt Sharma (ed.), *The Sāṁkhya-kārikā*, p.1}

[৪] উদয়বীর শাস্ত্রী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭

[৫] শ্রী*মদ্ভাগবত্*, ৩/২১/৩২

[৬] *তদেব*, ৩/২৪/১৮–১৯

[৭] উদয়বীর শাস্ত্রী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯

[৮] *তত্ত্বসমাসসূত্র*, সর্বোপকারিণী টীকা (https://sanskritdocuments.org/doc_z_misc_major_works/sarvopakAriNI.html?lang=pa)

[৯] *বাল্মীকি রামায়ণ*, বালকান্ড, ৪০/৩০

[১০] উদয়বীর শাস্ত্রী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২

[১১] *তদেব*, পৃ. ১৩

[১২] সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, *সাংখ্যকারিকা*–৪৩

ж ж ж ж ж

পরিশিষ্ট - ৩

সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি ও তন্ত্রের শিব-শক্তি

ভারতভূমি বহু ধর্ম–দর্শন–শাস্ত্র তথা বিশ্বাসের জন্মভূমি। এই মৃত্তিকায় শিকড় বিস্তার করে এক একটি 'ধারণা' বা 'বিশ্বাস' ক্রমে মহীরুহে পরিণত হয়েছে ও সেই মহীরুহটি সর্বস্তরের মানুষকে কোনও না কোনও ভাবে প্রভাবিত করেছে। তন্ত্র তেমনই এক বিশ্বাস, বা বলা ভাল এক প্রয়োগবিধি, যা বাঙালির সমাজ ও জীবনকে বহু যাবৎকাল ধরে প্রভাবিত করে আসছে। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'সাংখ্যদর্শন' প্রবন্ধে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ সহকারে সেই কথা বলার চেষ্টা করেছেন– "সেই তন্ত্রের কৃপায় বিক্রমপুরে বসিয়া নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ঠাকুর অপরিমিত মদিরা উদরস্থ করিয়া, ধর্মাচরণ করিলাম বলিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতেছেন। সেই তন্ত্রের প্রভাবে প্রায় শত যোজন দূরে ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশে কাণফোঁড়া যোগী উলঙ্গ হইয়া কদর্য্য উৎসব করিতেছে। সেই তন্ত্রের প্রসাদে আমরা দুর্গোৎসব করিয়া এই বাঙ্গালা দেশের ছয় কোটি লোক জীবন সার্থক করিতেছি"।[১]

এখন এই প্রভাব কতখানি ভালো বা খারাপ সে বিচারের জায়গা অবশ্যই আছে ও থাকবে, কিন্তু প্রভাবের মাত্রা যে অনেকখানি সেবিষয়ে সন্দেহ থাকার কথা নয়। বরং আরও খানিক তলিয়ে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে, ভারতবর্ষে তন্ত্র, যা একাধারে বিশ্লেষণমুখী ও প্রয়োগনির্ভর, এমনই একটি 'বিশ্বাস' বা 'ধারণা', যেটি সমাজের প্রতিটি পরতের কথা আমাদের সামনে তুলে ধরে। দেখার ও খোঁজার সদিচ্ছা তন্ত্রের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সমাজের অনেক কথা উজাগর করে। পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায় সচেতনভাবে সেদিকে দিশা নির্দেশ দিয়েছেন, "একটু বুঝিয়া হিসাব করিয়া তন্ত্রের পুঁথি পাঠ করিলেই বোঝা যায়, উহার স্তরে স্তরে বাঙ্গালার এবং বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস লুকানো রহিয়াছে; কারণ তন্ত্রধর্ম জাতির হিসাবে বাঙ্গালারই ধর্ম, বাঙ্গালীরই ধর্ম। বাঙ্গালীর প্রতিভা যেন দ্বাদশ সূর্যের মতন তন্ত্রের পত্রে পত্রে জ্বলিতেছে; যে দেখিতে জানে, সেই দেখিতে পায়– তাহারই জীবন ধন্য হয়"।[২]

তন্ত্র কথাটির উৎপত্তি 'তন্' ধাতু থেকে, যার অর্থ বিস্তার। অতএব, 'তনোতি বিস্তারং করোতি' এইরূপ অর্থে কিংবা 'তন্যতে বিস্তার্যতে জ্ঞানং অনেন ইতি তন্ত্রম্' এইরূপ অর্থে জ্ঞানের বিস্তার অর্থেই তন্ত্র কথাটির অর্থ উপলব্ধি হয়।[৩] তন্ত্র যে 'প্রয়োগনির্ভর' সেকথা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। অতএব সেইদিক থেকে তন্ত্র একরকমের বিধান বা পদ্ধতি, যে পদ্ধতিতে মনকে নিয়ন্ত্রণ করে অন্তরের যে অগ্নিশক্তি সেইটিকে কার্যকরী করা যায়। বিমলেন্দু চক্রবর্তী *তন্ত্র পরিচয়* গ্রন্থের ভূমিকায় এই প্রয়োগনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গিতেই তন্ত্র শব্দটির অর্থ নিরূপণের প্রয়াস করেছেন, "তন্ অর্থাৎ যা জীবনীশক্তি হেতু বিস্তারিত হয় তাকে নিয়ন্ত্রণ (ত) করে অন্তর্নিহিত প্রাণাগ্নি শক্তিকে (র) কার্যকরী করে তোলা..."।[৪]

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে তন্ত্রের একটি ধারণা বেশ স্পষ্ট, 'যা আছে দেহভাণ্ডে তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে'। অর্থাৎ মানবদেহের উৎপত্তির সাথে বিশ্বচরাচরের উৎপত্তির কোনওরকম বৈষম্য নেই। জীবসৃষ্টিতে ক্রিয়াটি অনেক সূক্ষ্ম তবে বিশ্বসৃষ্টিতে ক্রিয়াটি বিশাল বা ব্যাপক। অতএব সৃষ্টিতত্ত্বের মূলকথাটি হল ক্রমপরিবর্তনশীল এই প্রবাহের মধ্যে একটা অপরিবর্তনীয় বিষয়ের অনুভূতি।[৫] একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে বিষয়টি কিঞ্চিৎ পরিস্ফুট করতে। একটি নদীর জল প্রতিনিয়ত স্রোতের টানে বয়ে চলেছে। স্বাভাবিকভাবেই যে জল একটুখানি আগে বয়ে যাচ্ছিল, সেই জল এখন আর সেই স্থানে নেই। সম্ভবত

স্রোতে প্রবাহিত হয়ে অন্যত্র মিশে গেছে। ঐ জায়গায় এখন নতুন জলরাশি এসে প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু সাধারণভাবে আমরা যখন দেখি, তখন আমরা দেখি নদী বয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ প্রায় প্রতিক্ষণেই একটা পরিবর্তন ঘটছে কিন্তু নদীরূপ অপরিবর্তনের ভাবটি সেখানে অব্যাহত থাকছে।

নর-নারীর সংযোগক্রমে যেমন নতুন জীবসৃষ্টি, তেমনই পুরুষ-প্রকৃতি সংযোগে বিশ্বসংসারের উদ্ভব। তন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে পুরুষ-প্রকৃতি সংযোগ থেকে বিশ্বসংসার সৃষ্টির বিষয়টি অনেকটা এইরকম, "বিশ্বসংসারে পুরুষ-প্রকৃতির প্রেরণায় সৃষ্টির বিকাশ হয়। সৃষ্টির পূর্বে পুরুষ ও মূলা প্রকৃতির মধ্যে একটা স্পন্দনের- কম্পনের ভাব অনুভূত হয়। এই স্পন্দনের জন্যই পুরুষ-প্রকৃতির মধ্যে বিয়োগ ও মিলন ঘটে। এই মিলনের ফলে বিন্দুর সৃষ্টি বা পতন; আর সেই বিন্দুর মধ্যে সৃষ্টি-প্রকৃতির লীলা হইতে থাকে, সেই লীলার ফলেই বিশ্বসৃষ্টির বিকাশ"।[৬] তাহলে, তন্ত্র যে সৃষ্টিতত্ত্বের কথা বলে সেখানে পুরুষ ও প্রকৃতি নিয়েই সৃষ্টি। এবং সেই সৃষ্টিলীলাতে সর্বব্যাপীরূপে নিত্য, অচল, স্থাণু, সনাতন পুরুষ বিরাজমান। সেই পুরুষ শুধুমাত্র বিরাজমান, তাঁর চতুর্দিকে বেষ্টন করে প্রকৃতি সৃষ্টির লীলাখেলা করছেন। চণ্ডীতে বলা হয়েছে- *বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে/ তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোহস্য জগন্ময়ে।*[৭] তন্ত্রে প্রকৃতির দু'টি ভাগ স্বীকার করা হয়েছে- মূলা প্রকৃতি ও সৃষ্টি প্রকৃতি। মূলা প্রকৃতি অব্যক্তা এবং তার থেকেই সৃষ্টি প্রকৃতি প্রকাশিত। সুতরাং, তন্ত্রের এই সৃষ্টিতত্ত্ব অনেকখানি সাংখ্যানুসারী।[৮]

এবারে আসা যাক তন্ত্রের শিবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব সম্পর্কে। 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র' বলে শিবের পরিচিতি সেখানে। 'অঙ্গুষ্ঠ' বলার কারণটি একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ হাতের অন্যান্য আঙুলের সাথে এক সারিতে অবস্থান করে না। একই হাতের তালুতে অবস্থান করলেও এক সারিতে তার অবস্থান নয়। আত্মা বা পুরুষের অবস্থানটিও এইরকম। দেহ রূপ আধারে সেটির অবস্থান হলেও দেহ থেকে কিন্তু তা ভিন্ন। তন্ত্র তাই শিবতত্ত্ব বর্ণনায় 'শূন্যরূপং শিবং', 'শব্দব্রহ্মময়ঃ শিবঃ' এই কথাগুলি বারংবার উল্লেখ করেছে।

অন্যদিকে শক্তির বিবরণে তন্ত্রে বলা হয়েছে- 'ভুজঙ্গরূপিণীং দেবীং নিত্যাং কুণ্ডলিনীং পরাম্'।[৯] সর্বব্যাপী, নিত্য, পরিব্যাপ্ত এইগুলিই শক্তির পরিচায়ক। যা মনে করিয়ে দেয় সাংখ্যের 'প্রকৃতি'র অবয়বটিকে। এই স্থলটি স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন, "প্রকৃতি অর্থে কলাতত্ত্বেরই বিষয়রূপে পরিণতি, 'বেদ্যমাত্রং স্ফুটং ভিন্নং প্রধানং সূয়তে কলা'। এখানে প্রকৃতি সাংখ্যের মতো গুণসাম্যে বিদ্যমান থাকে, গুণক্ষোভ এখানে হয় না। অথচ এই প্রকৃতিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির কারণ। এখানে প্রকৃতি শিবেরই সাত্তাশক্তি এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ তিনটি শিবেরই ব্যক্ত জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়া শক্তিরূপে থাকে। সুতরাং সৃষ্টিক্ষেত্রে শিব ভোক্তা ও প্রকৃতি ভোগ্যরূপে বর্তমান থাকেন, অর্থাৎ প্রকৃতি এখানে (সৃষ্টিতে) পুরুষরূপ শিবের ভোগ্য-বিষয়রূপে পরিণত হয়"।[১০]

দেহবাদ তন্ত্রে ভীষণভাবে প্রোথিত, সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।[১১] তবে তন্ত্রের শিব-শক্তি ভীষণভাবে সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষের দ্বারা প্রভাবিত। তন্ত্রের সাধকগণ মনে করেন শক্তি ছাড়া শিব হলেন শব, আর শক্তি শূন্য শিব হতেই পারে না। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, "যখন গ্রামে গ্রামে, নগরে মাঠে জঙ্গলে শিবালয়, কালীর মন্দির দেখি, আমাদের সাংখ্য মনে পড়ে; যখন দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী পূজার বাদ্য শুনি, আমাদের সাংখ্যদর্শন মনে পড়ে"।[১২]

উল্লেখপঞ্জি

[১] বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ সংস্করণ), দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ২২২

[২] পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, *তন্ত্র পরিচয়*, পৃ. ৪

[৩] স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *তন্ত্রে তত্ত্ব ও সাধনা*, পৃ. ২

[৪] পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, ভূমিকা, পৃ. ৬

[৫] *তদেব*, পৃ. ১২

[৬] *তদেব*, পৃ. ১৩

[৭] *শ্রীশ্রী চণ্ডী*, ১/৭৬

[৮] পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২

[৯] *তদেব*, পৃ. ৫৫

[১০] স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮

[১১] পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪ [“তন্ত্র বলেন, এই সংসারে যদি কিছু জ্ঞেয় থাকে, তবে সে তোমার দেহ। ঐ দেহের সাহায্যে তোমার জ্ঞানোদয় হয়, ঐ দেহের সাহায্যে তুমি জগৎ মিথ্যা ও ব্রহ্ম সত্য বলিয়া থাক, ঐ দেহের সাহায্যে তোমার আত্ম-অনুভূতি হইয়া থাকে এবং সেই অনুভূতি হইতে তুমি বিশ্বাত্মার ধারণ করতে সমর্থ হও; অতএব এই দেহটাকে বাতিল করলে চলবে না”।]

[১২] বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ সংস্করণ), দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ২২২

ж ж ж ж ж

পরিশিষ্ট - ৪

পাঞ্চভৌতিক জগৎ: দার্শনিকের গুণগত ও বৈজ্ঞানিকের মাত্রাগত বিশ্লেষণ

চিন্তা একটি স্রোতের ন্যায়। তার প্রবাহ বিরামহীন। মানব মনের এই নিরন্তর চিন্তাস্রোতই ক্রমে জন্ম দেয় দর্শনের। যা একইসাথে অভিযানের ও অনুসন্ধানের পথ অবারিত করে অনুসন্ধিৎসুর সামনে। দার্শনিক এর মধ্যে কোনও এক পথের পথিক নন কারণ অনুসন্ধানের জন্যই তার অভিযান। অবশ্য এই পথ ধরে বৈজ্ঞানিকেরও পথ চলা। তিনিও অনুসন্ধানের জন্যই অগ্রসর হন। আর অনুসন্ধানের সূত্র ধরেই সূক্ষ্ম থেকে ক্রমশ বৃহৎ এর দিকে অভিগমন করেন। পরম্পরাগতভাবে চিন্তার প্রাথমিক পর্ব থেকেই দার্শনিকদের বিচারের বিষয় এই 'জগৎ'।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন 'একি আকুলতা ভুবনে! একি চঞ্চলতা পবনে/ একি মধুরমদির রসরাশি আজি শূন্যতলে চলে ভাসি'।[১] ভুবনে বিরাজমান আকুলতায় কবির অপার বিস্ময়। বিস্মিত করার মতোই ব্যাপার এই ভুবন বা জগৎ। বৈজ্ঞানিকের মাত্রাগত বিশ্লেষণে (quantitative analysis) ও দার্শনিকের গুণগত বিশ্লেষণে (qualitative analysis) এই জগৎ-তত্ত্ব বড়ই বৈচিত্র্যময়। জড়জগতের মূল উপাদান বলতে দার্শনিক যেখানে পঞ্চভূতের গোড়ার কথাতে আলোকপাত করেন; বৈজ্ঞানিক ঐ মোটা বিশ্লেষণে সন্তুষ্ট হতে পারেন না। এই প্রেক্ষিতে উনবিংশ শতকের দুই বিশ্লেষক স্বামী বিবেকানন্দ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর দৃষ্টিকোণ বিশেষ উল্লেখ্য। দার্শনিক বিমর্শ ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির মধ্যে কতদূর বিরোধ ও কতদূর অবিরোধ এবং সমন্বয়ের অন্বেষণ করণীয় কিংবা অকরণীয়, সেই প্রসঙ্গেই বিশ্লেষকদ্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গিও আলোচ্য।

জগৎ নিয়ে আলোচনায় সর্বাগ্রে উঠে আসে যে বিষয়টি তা হলো এই জগতের 'সৃষ্টি'। সৃষ্টিক্রম প্রসঙ্গে সাংখ্যের অভিমত এই যে, প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগের ফলে প্রকৃতি উপাদানকারণরূপে মহদাদির জননী হয়। প্রকৃতি যেহেতু অচেতন তাই সে নিজে জগতের অভিব্যক্তি করতে পারে না আবার পুরুষ যেহেতু নিষ্ক্রিয় তাই কেবলমাত্র পুরুষও জগতের অভিব্যক্তি ঘটাতে অক্ষম। এমতাবস্থায় সৃষ্টিকার্যের নিমিত্ত এই দুটি ভিন্ন পদার্থ একে অপরকে অপেক্ষা করে। অর্থাৎ সৎকার্যবাদী সাংখ্যের ধারণানুসারে সৃষ্টির পূর্বে জগৎ প্রকৃতিতেই অব্যক্তভাবে অবস্থান করে এবং পুরুষের সন্নিধানে তা ব্যক্ত হয়। যদিও পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুটি ভিন্ন সত্তা তথাপি নিজ নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য এই দুই ভিন্ন পদার্থ একে অপরের সহকারিত্ব প্রাপ্ত হয় বা বলা ভালো একে অপরকে অপেক্ষা করে। প্রধানের প্রয়োজন 'দর্শনার্থম্' এবং পুরুষের প্রয়োজন 'কৈবল্যার্থম্'।[২]

লৌকিক দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যাখ্যা করলে বিষয়টি অনেকখানি স্পষ্ট হয়- পঙ্গু অর্থাৎ চলনশক্তিহীন এবং অন্ধ অর্থাৎ দর্শনশক্তিহীন। ব্যষ্টিগতভাবে নিজ নিজ ইষ্টসিদ্ধিতে তারা অক্ষম কিন্তু অন্ধ যদি পঙ্গুকে তার কাঁধে স্থান দেয় এবং পঙ্গু যদি অন্ধকে সঠিক দিগ্‌নির্দেশ করে তাহলে উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টায় সঠিক গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো সম্ভব। লক্ষণীয় এই যে অন্ধ সক্রিয় কিন্তু জ্ঞানহীন আর পঙ্গু নিষ্ক্রিয় তথাপি চেতন। একইরকমভাবে প্রকৃতি সতত ক্রিয়াশীল হলেও অচেতন আর পুরুষ চেতন হলেও নিষ্ক্রিয়। ভোক্তা বা ভোগ্য একে অপরের সংযোগেই ব্যক্ত হয় নচেৎ হয় না। যেমন অগ্নির দহনক্ষমতা কাষ্ঠাদির সংযোগেই ব্যক্ত হয় কিংবা খাদ্য-পানীয় দ্রব্যের ক্ষুৎ-পিপাসা নিবৃত্তি ক্ষুধার্ত-পিপাসার্তের সন্নিধানেই প্রকট হয়।

যাইহোক, অতিসূক্ষ্ম প্রকৃতি হতে সহসা একই সময়ে সকল পদার্থের সৃষ্টি হয় না, ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ প্রকৃতি হতে প্রথম পদার্থ সৃষ্টি হওয়ার পর পুনরায় প্রকৃতি হতে দ্বিতীয় পদার্থ সৃষ্টি হয় না, প্রকৃতপক্ষে সৃষ্ট প্রথম পদার্থ হতে দ্বিতীয় পদার্থ এবং দ্বিতীয় পদার্থ হতে তৃতীয় পদার্থ উৎপন্ন হয়। যেমন বীজ হতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হতে পত্র, পত্র হতে শাখা এবং ক্রমে ধান উৎপন্ন হয় তেমনই প্রকৃতি হতে প্রথম উৎপন্ন হয় মহৎ, মহৎ হতে অহংকার, অহংকার হতে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় এবং সর্বশেষে পঞ্চতন্মাত্র হতে স্থূল পঞ্চমহাভূত।

প্রকৃতের্মহাংস্ততোঽহংকারস্তস্মাদ্ গণশ্চ ষোড়শকঃ।
তস্মাদপি ষোড়শকাত্ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি ।। (*সাংখ্যকারিকা*, কারিকা ২২)

একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টি দেখানো যেতে পারে–

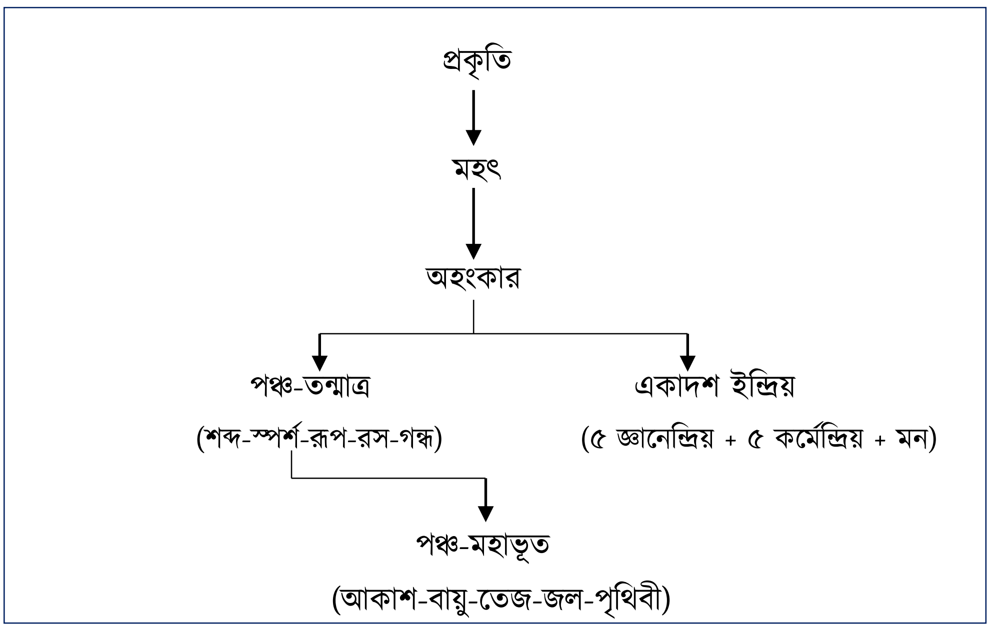

এখন গোলযোগের বিষয় এই পঞ্চ–মহাভূত। মোটের উপর ক্ষিতি–অপ্–তেজ–মরুত্–ব্যোম্ এই পাঁচটি মহাভূত মধ্যে গণ্য। স্থূল জড়জগৎ এই পাঁচটি মহাভূতে নির্মিত একথা শাস্ত্রকাররা স্বীকার করে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বক্তব্যে কিঞ্চিৎ সরলীকৃত করে পঞ্চ–মহাভূতের বিষয়টি প্রতিপন্ন করেছেন। তাঁর মতে, অব্যক্ত প্রকৃতি সর্বব্যাপী বুদ্ধিতত্ত্বে বা মহতে, সেই মহৎ আবার সর্বব্যাপী অহংতত্ত্বে এবং সেই অহংতত্ত্ব সর্বব্যাপী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভূতে পরিণত হয়। এই ভূতসমষ্টি সূক্ষ্ম পরমাণুসমূহে পরিণত হয় এবং ক্রমে ক্রমে এই পরমাণুগুলির মিলনেই স্থূল জগৎপ্রপঞ্চের উৎপত্তি।[৩] স্বামী বিবেকানন্দ সর্বাগ্রে একজন দার্শনিক, তাই সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের মধ্যে যে মতানৈক্য তা তিনি স্পষ্ট করেছেন–
“ I want to impress this on your mind. It is very hard to grasp it, because in Western countries the ideas are so queer about mind and matter. It is hard to get those impressions out of our brains. I myself had a tremendous difficulty, being educated in Western philosophy in my boyhood” ।[৪]

স্বামী বিবেকানন্দ দার্শনিক হলেও বিচার-বিমর্শে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির কদর করেছেন। স্থূলভূতের উৎপত্তিতে তিনি বিচার করেছেন প্রাণ ও আকাশের ভূমিকা। তার মতে আকাশের উপর প্রাণের বারংবার আঘাতে আকাশ ঘনীভূত হয়ে থাকে এবং ক্রমে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তিদ্বয়ের বলে পরমাণু গঠিত হয়। এই পরমাণুগুলি ধীরে ধীরে দ্ব্যণুকাদিতে রূপান্তরিত হয় ও সবশেষে জাগতিক পদার্থের মূল উপাদান স্বরূপ স্থূলভূতে পরিণত হয়। তাঁর নিজের ভাষা এখানে অবশ্যই উদ্ধার করতে হয়, "The Ākāsha, acted upon by the repeated blows of Prāna produces Vāyu or vibrations. This Vāyu vibrates, and the vibrations growing more and more rapid result in friction giving rise to heat, Tejas. Then this heat ends in liquefication, Apah. Then that liquid becomes solid. We had ether, and motion, then came heat, then it became liquified and then it condensed into gross matter"।[৫] লক্ষণীয় স্বামী বিবেকানন্দের বয়ানের শেষ পংক্তিটি, 'সর্বশেষে প্রাকৃতিক পদার্থ যে যে উপাদানে নির্মিত হয়, সেইসকল বিভিন্ন স্থূলভূতে পরিণত হয়'।

প্রাকৃতিক পদার্থ অর্থাৎ জাগতিক পদার্থ, আর এই জাগতিক পদার্থ যে উপাদান থেকে নির্মিত হচ্ছে সেইসকল হলো গিয়ে স্থূলভূত। সংখ্যায় যা পাঁচটি- ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুত্-ব্যোম্। সমস্যার সূত্রপাত এই রেখা বরাবর। মূল উপাদান বা মৌলিক উপাদান কথাটি মৌলিক পদার্থকে নির্দেশ করে। মৌলিক পদার্থ বলতে রসায়নের পরিভাষায় সেইসব উপাদান, যাদের বিশ্লেষণে আর কোনও পদার্থ পাওয়া যায় না। বিষয়টি আরও একটু স্পষ্ট করে বললে, আধুনিক বিজ্ঞান জাগতিক পদার্থের পাঁচটি অবস্থার কথা স্বীকার করে। এর মধ্যে তিনটি সুপরিচিত। কঠিন (Solid), তরল (Liquid) ও গ্যাস (Gas)। অন্য দুটি অবস্থা Plasma ও Condensate। এখন প্রশ্ন হবে, তাহলে কি ঐ পাঁচটি স্থূলভূত আধুনিক বিজ্ঞানের পদার্থান্তরের সাথে একশ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে?

বৈজ্ঞানিক উত্তর দেবেন 'পারে না'। ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুত্-ব্যোম্ ইত্যাদি যে পাঁচটি তা প্রত্যক্ষ জগতের পরিচিত কোনও জাগতিক দ্রব্যকেই বোঝায় না। মনে হতে পারে, 'মরুত্' বলতে বায়ু বা বাতাস বুঝতে আপত্তি কোথায়? দার্শনিকের গুণগত বিশ্লেষণে নেই তবে বৈজ্ঞানিকের মাত্রাগত বিশ্লেষণে আছে। শব্দ ও স্পর্শবান্ বায়ু একথা দার্শনিক স্বীকার করবেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বলবেন বায়ুতে গন্ধও উপলব্ধ। আর প্রতিযুক্তি দিয়ে দার্শনিক যদি বলেন বায়ুতে থাকা গন্ধ আসলে বায়ু যে ক্ষিতিজ বা জলজ কণিকা বহন করে তার গন্ধ, তাহলে তার প্রত্যুত্তরে বৈজ্ঞানিক বলবেন 'ক্লোরিন' নামক একটি গ্যাস আছে যেটি বায়বীয় পদার্থ এবং বিকট গন্ধযুক্ত ও ঈষৎ হলুদাভ বর্ণবিশিষ্ট। এবং এইরকম ভাবে পঞ্চভূতের কোনওটিই প্রত্যক্ষ জগতের কোনও পরিচিত দ্রব্যকে বোঝায় না। তাই বৈজ্ঞানিকের কাছে ঐগুলি কেবল ধারণা (Concept) মাত্র, একেবারেই প্রত্যয়লব্ধ (Percept) নয় । বৈজ্ঞানিক কল্পনার ধারেপাশেও হাঁটেন না একথা ভাবলে অবশ্য খুব বড় ভুল হবে কারণ "বিধাতা সৃষ্টির দিনে মানুষকে সর্ববিধ জাগতিক তথ্যের উপদেশ দেন নাই। মানুষ আপন চেষ্টায় কাল সহকারে ঐসকল তথ্য নির্ণয় করিতেছে। কাজেই আমরা বহু বৎসর পরে জন্মিয়া সেকালের লোকের অপেক্ষা অধিক জানিয়া ও শিখিয়া ফেলিয়াছি, ইহাতে বিস্ময়ের বা স্পর্ধার হেতু নাই'।[৬]

ফলকথা এই যে দার্শনিক তার গুণগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে ধারণা বা কল্পনার আশ্রয়ে যে তথ্যগুলি পরিবেশন করেন, বৈজ্ঞানিক তাতে কখনই বিবাদে প্রবৃত্ত হন না। নিজের বিচারের উৎকর্ষে পৌঁছাতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক মাত্রাগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রত্যয়ে পৌঁছান। তবে কখনও কখনও চর্মচক্ষু মুদ্রিত করে মানসচক্ষু উন্মোচিত করতে হয় বইকি। তাই রামেন্দ্রসুন্দর

ত্রিবেদী তাঁর বিশ্লেষণে দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে বিরোধ এর প্রয়োজনই মনে করেননি– "দর্শন ও বিজ্ঞানের বিরোধ নাই, কিন্তু দর্শন যে চোখে দেখেন, যে পথে চলেন, বিজ্ঞান সে চোখে দেখেন না, সে পথে চলেন না'।[৭] একইভাবে বিজ্ঞানের সাথে দর্শনের সমন্বয় সাধনের মরিয়া চেষ্টা কোনওভাবেই চাননি। এরূপ সমন্বয় সাধনের চেষ্টা তাঁর কাছে ছিল অনভিপ্রেত– "যাঁহারা আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত প্রাচীন বিজ্ঞানের এইরূপে সমন্বয় করিতে যান, তাঁহারা একটা ভুল করেন। বিজ্ঞান বিদ্যাটাই পরিবর্তনশীল, উন্নতিশীল বলিতে চাও ক্ষতি নাই। উহার সিদ্ধান্তগুলি ক্রমশঃ পরিবর্তিত ও পরিণত হইতেছে। বিজ্ঞান কোন দিন একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না; আজ যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছে, কাল সে সিদ্ধান্ত বদলাইয়া লইবে"।[৮]

এতদূর আলোচনার পরে যদি মনে হয় দার্শনিক কল্পনার জগতে থাকেন আর সেই কল্পনা আসলে ব্যর্থ পরিশ্রম; তাই দার্শনিক কল্পনায় কী লাভ? রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী এই প্রশ্নে প্রকৃতপক্ষে 'অস্ত্যর্থে' বা 'নাস্ত্যর্থে' কোনও বাচিক উত্তর করেননি তবে, স্বভাবসিদ্ধ রসিক বিশ্লেষণে আগামীর নিকট বিতর্কের মঞ্চ প্রস্তুত করে গেছেন। "মানুষ রসায়ন বিজ্ঞানের বলে জগতের উপর কত ক্ষমতা, কত প্রভুত্ব উপার্জন করিয়াছে; পেটুকের জন্য চিনি ও মাতালের জন্য মদ তৈয়ার করিতেছে; আলকাতরার ভিতর হইতে কত রঙ-বেরঙ বাহির করিতেছে; সে দূরে যাক, সূর্য্যমণ্ডলের তারকামণ্ডলে লোহা আছে না দস্তা আছে তাহাও অবলীলাক্রমে বলিয়া দিতেছে। আর দার্শনিকের গন্ধ, স্পর্শ, রূপ, রস আবিষ্কারে কাহার কি লাভ? মরুভূমিতে লাঙল চষিয়া তিনি কি ফসল উৎপাদন করিবেন? হাওয়ার উপর বাড়ী গাঁথিয়া তিনি কাহাকে সেখানে বাস করিতে বলিবেন? তাঁহার ব্যোমের উপর তিনি যে বুদবুদের পুরী নির্মাণ করিয়াছেন, তাহার দশা বিশ্বামিত্রের পুরীর মত হইবে নাকি? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার এখন সময় নাই"।[৯]

উল্লেখপঞ্জি

[১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান* {পর্যায়-প্রকৃতি (৩)} [http://www.geetabitan.com/]

[২] পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য/ পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তত্কৃতঃ সর্গঃ (ঈশ্বরকৃষ্ণ, *সাংখ্যকারিকা*, কারিকা ২১)

[৩] This first change is called Mahat. The substance Mahat changes into the gross matter called egoism. The third change is manifested as universal sense-organs, and universal fine particles and these last again combine and become this gross universe which with eyes, nose and ears, we see, smell and hear. This is the cosmic plan according to Sāṁkhya…(*The Complete Works of Swami Vivekananda* (150th Birth Anniversary Ed.), Vol.2 (*A Study of the Sānkhya Philosophy*), p.435

[৪] *Ibid.*, Vol.2 (*A Study of the Sānkhya Philosophy*), p.434

[৫] *Ibid.*, Vol.2 (*Cosmology*), p.426

[৬] রামেন্দ্র রচনাবলী, পৃ. ৩২৭

[৭] রামেন্দ্র রচনাবলী, পৃ. ৩৩০

[৮] রামেন্দ্র রচনাবলী, পৃ. ৩২৯

[৯] রামেন্দ্র রচনাবলী, পৃ. ৩৪২

ж ж ж ж ж

গ্রন্থপঞ্জি
(Bibliography)

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা গ্রন্থসমূহ

অনির্বাণ। *বেদ-মীমাংসা* (১ম খণ্ড)। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৬। মুদ্রিত।

অন্নংভট্ট। *তর্কসংগ্রহঃ*। সম্পা. নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী ('অধ্যাপনা' টীকা সমন্বিতা)। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ (পুনঃ সং)। মুদ্রিত।

অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি। *সাংখ্য রহস্য*। কাশী: যতীন্দ্রকুমার কাব্য ব্যাকরণতীর্থ, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ। পিডিএফ।

অমরসিংহ। *অমরকোষ*। সম্পা. গুরুনাথ বিদ্যানিধি। *অমরকোষ বা অমরার্থ চন্দ্রিকা*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ। মুদ্রিত।

আচার্য্য, দেবেশ কুমার। *প্রবন্ধ বিচিত্রা*। কলকাতা: প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০১৭ (১০ম সং)। মুদ্রিত।

ঈশ্বরকৃষ্ণ। *সাংখ্যকারিকা*। সম্পা. পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৭ (২য় মুদ্রণ) (১ম সংস্করণ, ১৯০১)। মুদ্রিত।

-----। ------। সম্পা. বিপদভঞ্জন পাল। কলকাতা: সদেশ, ১৪১৭। মুদ্রিত।

উপনিষদ (প্রথম ভাগ)। সম্পা. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., ২০১৫ (অষ্টম মুদ্রণ)। মুদ্রিত।

উপনিষদ। সম্পা. অতুল চন্দ্র সেন প্রমুখ। কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ২০১৫ (পুনর্মুদ্রণ) (অখণ্ড সং ১৯৮০)। মুদ্রিত।

ঋগ্বেদ সংহিতা। অনু. রমেশচন্দ্র দত্ত। সম্পা. নিমাইচন্দ্র পাল। কলকাতা: সদেশ, ২০০৭। মুদ্রিত।

কপিল। *সাংখ্যদর্শন*। সম্পা. পঞ্চানন ঘটক। কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১১ (পুনর্মুদ্রণ) (১ম সং ২০০০)। মুদ্রিত।

----। ------। কালীবর বেদান্তবাগীশ (অনূদিত)। দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ (সম্পা.)। কলিকাতা (এখন কলকাতা): সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ (ষষ্ঠ সংস্করণ)। পিডিএফ।

কালিদাস। *রঘুবংশম্*। সম্পা. অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (মল্লিনাথকৃতা টীকা সমন্বিতা)। কলকাতা: সদেশ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ। মুদ্রিত।

গিরি, সত্যবতী এবং সমরেশ মজুমদার (সম্পা.)। *প্রবন্ধ সঞ্চয়ন*। কলকাতা: রত্নাবলী, ১৪১২ বঙ্গাব্দ (২য় সং) (১ম সং ১৪০৩ বঙ্গাব্দ)। মুদিত।

গুপ্ত, ক্ষেত্র। *আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*। কলিকাতা (এখন কলকাতা): প্রেমময় মজুমদার, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ। পিডিএফ।

গুপ্ত, সুশীল কুমার। *ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ*। কলিকাতা (এখন কলকাতা): এ. মুখার্জী এন্ড কোং (প্রাইভেট) লিমিটেড, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ। মুদ্রিত।

ঘোষ, অপূর্ব্বকৃষ্ণ। *আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর*। কলিকাতা (এখন কলকাতা): ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্, ১৯২৩। মুদ্রিত।

ঘোষ, প্রণবরঞ্জন। *বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ। পিডিএফ।

চট্টোপাধ্যায়, অসীমকুমার। *বাঙ্গালার রেনেসাঁস*। কলকাতা: দীপায়ন, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ। পিডিএফ।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। *বিবিধ প্রবন্ধ*। কলিকাতা (এখন কলকাতা): হেয়ার প্রেস, ১৮৯৬ (২য় সং)। পিডিএফ।

চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্রমোহন। *উপনিষদের কথা*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২০১০ (দ্বিতীয় মুদ্রণ)। মুদ্রিত।

ঠাকুর, অনন্তলাল। *নিবন্ধাবলী*। কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪২২ বঙ্গাব্দ। মুদ্রিত।

দত্ত, ভবতোষ। *চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮। মুদ্রিত।

দত্ত, হীরেন্দ্রনাথ। *সাংখ্য পরিচয়*। কলিকাতা (এখন কলকাতা): কনকেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ। পিডিএফ।

দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ। *ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা*। কলিকাতা (এখন কলকাতা): মিত্র ও ঘোষ, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ। পিডিএফ।

দে, অধীর। *আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারা*। কলকাতা: সৃষ্টি প্রকাশনী, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ। পিডিএফ।

দেবী, অন্নপূর্ণা। *স্বামী বিবেকানন্দ*। কলকাতা: সজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ (পুনর্মুদ্রণ)। পিডিএফ।

নারায়ণ শর্মা। *হিতোপদেশঃ*। সম্পা. সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১২ (৪র্থ সং) (১ম সং ১৯৯৩)। মুদ্রিত।

পণ্ডিত, নলিনীরঞ্জন। *আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর* (প্রবন্ধ সংকলন)। কলিকাতা (এখন কলকাতা): বেঙ্গল বুক কোম্পানী, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ। মুদ্রিত।

পতঞ্জলি। *যোগদর্শন*। সম্পা. স্বামী ভর্গানন্দ। *পাতঞ্জল যোগদর্শন*। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৮ (৫ম পুনর্মুদ্রণ) (১ম সং ২০০৪)। মুদ্রিত।

-----। ------। সম্পা. হরিহরানন্দ আরণ্য ও ধর্মমেঘ আরণ্য। *কাপিলাশ্রমীয় পাতঞ্জল যোগদর্শন*। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৮। পিডিএফ।

পাল, মহেশচন্দ্র (সম্পা.)। *সাংখ্যদর্শনম্*। কলিকাতা (এখন কলকাতা): মহেশচন্দ্র পাল, ১৮০৭ শকাব্দ। পিডিএফ।

পোদ্দার, অরবিন্দ। *বঙ্কিম-মানস*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৩ (নবম মুদ্রণ) (১ম সং, ১৯৫১)। মুদ্রিত।

বঙ্কিম রচনাবলী। দ্বিতীয় খণ্ড। সম্পা. যোগেশ চন্দ্র বাগল। কলিকাতা (এখন কলকাতা): সাহিত্য সংসদ, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ। মুদ্রিত।

বটব্যাল, উমেশচন্দ্র। *সাংখ্য-দর্শন*। কলিকাতা (এখন কলকাতা): নরেন্দ্রনাথ বটব্যাল, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ। পিডিএফ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি। *তন্ত্র পরিচয়*। সম্পা. বিমলেন্দু চক্রবর্তী। কলকাতা: সাহিত্য বিহার, ২০০৮। মুদ্রিত।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী। *আলিবাবার গুপ্তভাণ্ডার* (প্রবন্ধ সংকলন)। কলকাতা: গাঙচিল, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ। মুদ্রিত।

বসু, স্বপন এবং ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী। *উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৩। মুদ্রিত।

বাচস্পতি মিশ্র। *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*। সম্পা. নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৬ (পুনর্মুদ্রণ) (৫ম প্রকাশ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ)। মুদ্রিত।

বাজপেয়ী, আশুতোষ। *রামেন্দ্রসুন্দর*। কলিকাতা (এখন কলকাতা): গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ। মুদ্রিত।

বিশ্বনাথ। *ভাষাপরিচ্ছেদ*। সম্পা. আশুতোষ ভট্টাচার্য। কলকাতা: বিজয়ানন, ১৪২২ বঙ্গাব্দ (১ম সং ২০০০)। মুদ্রিত।

বৈয়াসিক-মহাভারতম্। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ (অনূদিত)। *মহাভারতম্* (নীলকণ্ঠকৃতা টীকা সমন্বিতা)। খন্ড ১-৪৩। কলকাতা: বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৪২২ বঙ্গাব্দ (৩য় মুদ্রণ) (১ম প্রকাশ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ)। মুদ্রিত।

ভট্টাচার্য, অমিত। *ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা*। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৩ (পুনর্মুদ্রণ) (১ম সং ২০০৩)। মুদ্রিত।

ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন। *বঙ্কিমচন্দ্রজীবনী*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৫ (পঞ্চম মুদ্রণ)। মুদ্রিত।

ভট্টাচার্য, বিধুভূষণ। *সাংখ্যদর্শনের বিবরণ*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৮ (২য় মুদ্রণ) (১ম প্রকাশ, ১৯৮৪)। মুদ্রিত।

ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব। *পথিকৃৎ রামেন্দ্রসুন্দর*। কলিকাতা (এখন কলকাতা): বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রা. লি., ১৯৬৬। মুদ্রিত।

ভট্টাচার্য, ভূপেন্দ্র নাথ। *সাংখ্যদর্শন*। কলিকাতা (এখন কলকাতা): সংস্কৃত কলেজ, ১৯৮৫ (পুনর্মুদ্রণ) (১ম সংস্করণ, ১৯৬৬)। মুদ্রিত। [কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা-৪৬]

ভারতীয় দর্শন কোষ। দ্বিতীয় খণ্ড। সম্পা. শ্রীমোহন ভট্টাচার্য ও দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য। কলিকাতা (এখন কলকাতা): সংস্কৃত কলেজ, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ। মুদ্রিত। [কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা-১১৮]

মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ। *বিবেকানন্দ চরিত*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪১১ বঙ্গাব্দ (ষোড়শ মুদ্রণ)। মুদ্রিত।

মনুসংহিতা। সম্পা. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (কুল্লুকভট্টকৃতা টীকা সমন্বিতা)। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১৯ (৩য় সং) (১ম সং ১৪১০)। মুদ্রিত।

মাধবাচার্য। *সর্বদর্শনসংগ্রহ*। সম্পা. সঞ্জিত কুমার সাধুখাঁ। *মাধবাচার্যকৃত সর্বদর্শনসংগ্রহে বৌদ্ধদর্শন ও জৈনদর্শন*। কলকাতা: সদেশ, ২০১১ (২য় সং) (১ম সং ২০০৫)। মুদ্রিত।

মিশ্র, অশোককুমার। *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস* (আধুনিক পর্ব)। কলকাতা: সাহিত্য সঙ্গী, ২০০৮। মুদ্রিত।

মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ (সম্পা.)। *সাঙ্খ্যদর্শন*। কলিকাতা (এখন কলকাতা): বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ?। পিডিএফ।

মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দগোপাল। *যোগের কথা পতঞ্জলির দৃষ্টিতে*। কলকাতা: শ্রীসারদা মঠ, ২০১৮ (২য় মুদ্রণ)। মুদ্রিত।

মুখোপাধ্যায়, জগমোহন। *গবেষণা-পত্র অনুসন্ধান ও রচনা*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৬ (দ্বিতীয় মুদ্রণ)। মুদ্রিত।

মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার। *সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু*। কলিকাতা (এখন কলকাতা): জিজ্ঞাসা, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ। পিডিএফ।

যাস্ক। *নিরুক্ত*। সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭ (পুনর্মুদ্রণ) (১ম মুদ্রণ ১৯৫৫)। মুদ্রিত। [আশুতোষ সংস্কৃত গ্রন্থমালা ০৫]

যুক্তিদীপিকা। সম্পা. যদুপতি ত্রিপাঠি। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১১ বঙ্গাব্দ। মুদ্রিত।

রায়, সুরেন্দ্রনাথ। *সাংখ্য-দর্শন*। কলিকাতা (এখন কলকাতা): উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ। পিডিএফ।

শর্মা, অন্নদাচরণ। *সাংখ্য রহস্য*। কাশী: যতীন্দ্রকুমার কাব্য ব্যাকরণতীর্থ, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ। পিডিএফ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। সম্পা. অতুলচন্দ্র সেন। কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ২০১৭ (পুনর্মুদ্রণ) (১ম সং ১৯৩৬)। মুদ্রিত।

-------। সম্পা. জগদীশচন্দ্র ঘোষ। কলিকাতা (এখন কলকাতা): প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৯৫৮। পিডিএফ।

-------। সম্পা. প্রমথনাথ তর্কভূষণ (আনন্দগিরিকৃতা টীকা সমন্বিতা)। কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৩ (পুনর্মুদ্রণ) (৭ম সং)। মুদ্রিত।

------। সম্পা. স্বামী ভাবঘনানন্দ ('সুবোধিনী' টীকা সমন্বিতা)। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৬ (পুনর্মুদ্রণ) (১ম সং ২০০০)। মুদ্রিত।

শ্রীমদ্ভাগবতম্। সম্পা. রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন (বিবিধ টীকা সমন্বিতা)। মুর্শিদাবাদ: রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন, ১২৯১ বঙ্গাব্দ। মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীচণ্ডী। সম্পা. স্বামী জগদীশ্বরানন্দ। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ (৩য় পুনর্মুদ্রণ)। মুদ্রিত।

সদানন্দ যোগীন্দ্র। *বেদান্তসারঃ*। সম্পা. বিপদভঞ্জন পাল। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ। মুদ্রিত।

সায়ণ মাধবীয় সর্বদর্শনসংগ্রহ (প্রথম খণ্ড)। "চার্বাকদর্শন"। সম্পা. অমিত ভট্টাচার্য। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ (২য় সং) (১ম সং ১৪১২ বঙ্গাব্দ)। মুদ্রিত।

সায়ণ। *ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমঃ*। সম্পা. গুরুশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৯ (পুনর্মুদ্রণ) (১ম সং ২০০৫)। মুদ্রিত।

সেন, সুকুমার। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*। তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ (ষষ্ঠ মুদ্রণ)। মুদ্রিত।

স্বামী গম্ভীরানন্দ। *উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী*। প্রথম ভাগ। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪২১ বঙ্গাব্দ (৩৮তম পুনর্মুদ্রণ)। মুদ্রিত।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। *তন্ত্রতত্ত্বপ্রবেশিকা*। কলকাতা: শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৪০১ বঙ্গাব্দ (পুনর্মুদ্রণ)। মুদ্রিত।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (প্রথম-দশম খণ্ড)। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ (২৯তম পুনর্মুদ্রণ)। মুদ্রিত।

English/Sanskrit/Hindi Books

Amarasiṁha. *Nāmaliṁgānuśāsanam* (*Amarakośa*). Ed. N. G. Sardesai and D. G. Padhye. Poona: Oriental Book Agency, 1940. PDF. [Poona Oriental Series No. 69]

Anderson, Jonathon and Millicent Poole. *Assignment and Thesis Writing* (4th Edition). New Delhi: Wiley, 2014 (rpt.). Print.

Banerji, Suresh Chandra. *Sankhya Philosophy*. Calcutta (now Kolkata): Hare Press, ?. PDF.

Basu, Ratna. *Methodology and Sanskritic Researches*. Kolkata: Rabindra Bharati University, 2012 (Revised Edition) (1st ed. 1998). Print. [School of Vedic Studies pamphlet Series 04]

Chacraverti, Santanu. "Ramendrasundar Trivedi: A Pathbreaking populariser of Science in Bengal". *Uncharted Terrains*. Narender K. Sehgal. New Delhi: Vigyan Prasar, 2000. PDF.

Chakravarti, Chintaharan. "Bengal's Contribution To Sanskrit Literature (A Chronological Frame-Work)." *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute*, vol. 11, no. 3, 1930, pp. 235–258. *JSTOR*, www.jstor.org/stable/41688185. Accessed 7 Dec. 2020.

Chakravarti, Pulinbihari. *Origin and Development of the Sāṁkhya System of Thought*. Calcutta (now Kolkata): Metropolitan Printing and Publishing House Ltd., 1951. Print.

Chatterjee Satischandra and Dhirendramohan Datta. *An Introduction to Indian Philosophy*. Delhi: Motilal Banarasidass, 2016. Print.

Dasgupta, S. N. *A History of Indian Philosophy*. Vol-I. New Delhi: Motilal Banarasidas, 2015 (8th rpt.) (1st Cambridge edition 1922). Print.

Ghosh, Jajneswar. *Sāṁkhya and Modern Thought*. Calcutta (now Kolkata): The Book Company Ltd., 1930. Print.

Ghosh, Kakali. *The Reflection of Yoga in the Principal Upaniṣads*. Pune: Kaivalyadhama, 2020. Print.

Gopinath Kaviraj, *Selected Writings of Mahamahopadhyaya Gopinath Kaviraj*. Varanasi: Indica Books, 2006 (1st ed. 1990). Print.

Haribhadra Suri. *Shaḍdarshanasamuchchaya*. Ed. Damodar Lal Goswami. Benaras: Chowkhamba Sanskrit Book Depot, 1905. PDF. [Chowkhamba Sanskrit Series 95]

Īśvarakṛṣṇa, *Sāṁkhyakārikā*. Har Dutt Sharma (Ed.). *The Sāṁkhya-Kārikā*. Poona: The Oriental Book Agency, 1933. Print.

Kālidāsa. *Kumārasaṁbhava*. Ed. M. R. Kale. *The Kumārasambhava of Kalidāsa*. Delhi: Motilal Banarasidass, 2011 (rpt.) (7th ed. 1981). Print.

---------. *Raghuvaṁśa*. Ed. M. R. Kale. *The Raghuvamsa of Kalidasa*. Bombay (now Mumbai): Gopal Narayen & Co., 1922 (Revised Edition). PDF.

Kapila. *Sāṁkhya-darśana*. Ed. Jibananda Vidyasagar. *Sankhyadarshana* (*or Aphorisms of atheistic philosophy*) with the commentary of Anirudha. Calcutta (now Kolkata): Jibananda Vidyasagar, 1892 (2nd ed.). PDF.

--------. --------. Ed. Ramshankar Bhattacharya. Varanasi: Bharatiya Vidya Prakashan, ?. PDF.

Keith, A. B. *The Samkhya System*. World Public Library.org, Classical Literature Collection.

Krishnamachariar, M. *History of Classical Sanskrit Literature*. Delhi: Motilal Banarasidass, 2009 (rpt.) (3rd ed. 1974). Print.

Larson, Gerald J and R S Bhattacharya. Comp. and Ed. *Encyclopedia of Indian Philosophies*. Vol. IV (Sāṁkhya A Dualist Tradition in Indian Philosophy). New Delhi: Motilal Banarasidas, 2006 (rpt.) (1st ed. 1987). Print.

Majumdar, Abhay Kumar. *The Sāṅkhya Conception of Personality*. Calcutta (now Kolkata): Calcutta University Press, 1930. Print.

Majumdar, R. C. *Swami Vivekananda: A historical review*. Kolkata: Advaita Ashrama, 2013(3rd rpt.) (1st ed. 1965). Print

Manusaṁhitā. Ed. Ashokanath Shastri (with Kullūka Bhaṭṭa's Commentary). Calcutta (now Kolkata): Modern Book Agency, 1945. PDF.

Matsya-Purāṇam. Ed. Jivananda Vidyasagar. Calcutta (now Kolkata): Jivananda Vidyasagar, 1876(?). PDF.

Maxmuller, Fredrich. *The Six Systems of Indian Philosophy*. New York: Longmans Green and Co., 1899. PDF.

MLA Handbook for Writers of Research Papers (7th Edition). New Delhi: Affiliated East-West Press Pvt Ltd, 2009. Print.

Mukerji, J. N. *Sāṁkhya: or The Theory of Reality*. Calcutta (now Kolkata): S. N. Mukerji, 1930. Print.

Mukherjee, Rajeshwar and Kakali Ghosh. *The Quintessence of Yoga*. Pune: Kaivalyadhama, 2018. Print.

Pāṇini. *Dhātupāṭha*. Ed. Naresh Jha. Varanasi: Chaukhamba Surabharati Prakashan, 2017. Print. [Chaukhamba Surabharati Granthamala-311]

Parāśara-Smṛiti. Ed. Vāmana Śāstrī (with the commentary of Sāyaṇa Mādhavāchāryā). *The Parāśara Dharma Saṁhitā* (Vol. I). Bombay (now Mumbai): Govt. Central Book Depot, 1893. PDF. [Bombay Sanskrit Series No. XLVII]

Patañjali. *Yogasūtra*. Trans. (in eng) Rajendralal Mitra. *Yoga Aphorisms of Patanjali*. Calcutta (now Kolkata): Asiatic Society of Bengal, 1883. Print. [Bibliotheca Indica Series No. 462]

Potter, Karl H. Comp. and Ed. *Encyclopedia of Indian Philosophies* (Bibliography). New Delhi: Motilal Banarasidas, 1995 (Revised 3rd ed.) (1st ed. 1970). Print.

Radhakrishnan, S. *Indian Philosophy*. Vol-II. New Delhi: Oxford University Press, 2017 (16th impression) (1st Indian edition 1940). Print.

Sadānanda Yogīndra. *Vedāntasāra*. Ed. K. S. Aiyar. Srirangam: Sri Vani Vilas Press, 1911. Print.

Saṁskrita-Sāhitya-Pariṣat-Patrikāyā Viṣayādi Sūcipatram. Ed. Karunasindhu Das. Kolkata: Sanskrit Sahitya Parishat, 2002. Print. [Sanskrit Sahitya Parishat Series 61]

Śāstrī Udayvīr. *Prācīn Sāṁkhya*. New Delhi: Govindram Hasanand, 1669

------------. *Sāṁkhya Darśan Kā Itihās*. New Delhi: Govindram Hasanand, 2012

Seal, Brajendranath. *The Positive Sciences of the Ancient Hindus*. London: Longmans, Green and Co., 1915. Print.

Sengupta, Anima. *Classical Sāṁkhya: A Critical Study*. New Delhi: Munshiram Manoharlal, 1982 (2nd ed.) (1st ed. 1981). Print.

Sinha, Nandalal (ed.). *The Sāṁkhya Pravachana Sūtram*. Allahabad: The Panini Office, 1912. Print.

Śrīmadbhagavadgītā (Vol. I). Ed. Madanmohan Agrawal (with the commentary 'Gūḍārthadīpikā' of Madhusudana Sarasvatī's). Delhi: Chaukhamba Sanskrit Pratisthan, 2005 (rpt.). Print. [The Vrajajivan Prachya Granthamala 85]

-------------. Ed. Wāsudev Laxman Shāstri (with multiple commentaries). Bombay (now Mumbai): Nirnay Sagar Press, 1986. PDF.

Swami Gambhirananda (Trans.). *Eight Upanisads* (with the commentary of Śaṁkarācārya). Vol. I. Kolkata: Advaita Ashrama, 2012 (11th rpt.). Print.

Swami Prajnananda, *Schools of Indian Philosophical Thought*. Calcutta (now Kolkata): Firma K. L. Mukhopadhyay, 1973. Print.

The Complete Works of Swami Vivekananda. (150th Birth Anniversary Edition). Vol. 1-8. Kolkata: Advaita Ashrama, 2018. Print.

The New Encyclopaedia Britannica. Vol. 24 (Macropaedia). Chicago: Encyclopaedia Britannica Inc., 2003 (15th ed.) (1st ed. 1768). Print.

Udayana. *Nyāyakusumāñjalī*. Ed. Dhundiraj Shastri. Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1957. Print. [Kashi Sanskrit Series-30]

Vijñānabhikṣu. *Sāṁkhyapravacanabhāṣya*. Ed. Richard Garbe. *The Sāṁkhya-pravacana-bhāṣya* (*or Commentary on the exposition of the Sānkhya Philosophy*). Cambridge: Harvard University, 1895. PDF. [Harvard Oriental Series-Vol.II]

Winternitz, Maurice. *A History of Indian Literature* (Vol. I). Trans. V. Srinivasa Sarma. Delhi: Motilal Banarasidass, 2009 (rpt.) (1st ed. 1981). Print.

Yuktidīpikā. Ed. Shiv Kumar and D. N. Bhargava. Delhi: Eastern Book Linkers, 1990. Print.

শব্দসূচি
(Index)

➢ পারিভাষিক ও অন্যান্য শব্দ

অজ্ঞেয় পৃ. ১০৫, ১৩২
অজ্ঞেয়বাদ পৃ. ৭৯
অতিদূরত্ব পৃ. ২২
অতিসামীপ্য পৃ. ২২
অতীন্দ্রিয় পৃ. ২২, ১২২
অদৃষ্টবাদিত্ব পৃ. ৫২, ৫৩
অধিষ্ঠান পৃ. ২৯, ৩৮
অধ্যবসায় পৃ. ১৯, ২৬, ৩৩, ৩৪
অনির্দেশ্য পৃ. ১৩২
অনুবন্ধ পৃ. ১৩, ১৪
অনুভয় পৃ. ১৭
অনুমান (প্রমাণ) পৃ. ১৯, ২০, ২১, ২২, ৩০, ৬৩
অনুসন্ধান পৃ. ৯, ১৭, ৫২, ৯৯, ১০৭
অন্তঃকরণ পৃ. ১৮, ১৯, ৩০, ৩৪, ৩৭, ১০৫
অন্তঃকরণবৃত্তি পৃ. ১৯, ২১
অন্বয়সহচার পৃ. ২০
অন্যতাপ্রত্যয় পৃ. ১৬
অন্যমনস্কতা পৃ. ২২
অপবর্গ পৃ. ৩২, ৩৫, ৩৬, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ১০০
অপর্যাপ্ততা পৃ. ৮৩
অবিবেক পৃ. ৩১, ৩৭, ৪০, ৪২
অবিবেকী পৃ. ২৫
অবিশেষ পৃ. ৩৪, ১৩৪
অবীত পৃ. ২০
অব্যক্ত পৃ. ১৬, ১৭, ২১, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৯, ৩১, ৯২, ৯৪, ৯৮, ১০২, ১২১, ১২২
অভিব্যক্তিবাদ পৃ. ৭৯
অভিভব পৃ. ১৫, ২২, ২৮
অভিমান পৃ. ২৬, ৩৩, ৩৪
অসক্ত পৃ. ৩৪
অহংকার পৃ. ১১, ১৭, ১৮, ২৬, ২৭, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৯২, ১০৩, ১০৬, ১২২
অহংবাদ পৃ. ৭৯
আত্মারাম পৃ. ১০২
আত্যন্তিক নিবৃত্তি পৃ. ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ৩১, ৪২, ৫২, ৫৫, ৫৬
আধিদৈবিক পৃ. ১৪, ১৫, ১৬
আধিভৌতিক পৃ. ১৪, ১৫, ১৬

আধুনিক	পৃ. ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৫১, ৫৯, ৭০, ৯০, ৯৪, ৯৯, ১২০, ১২১, ১৩২, ১৩৩, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৮, ১৫৯	কাপিলদর্শন	পৃ. ১১, ৯১
		কার্বনিক অ্যাসিড	পৃ. ৫৫, ৭০
		কার্য্যপরতন্ত্রতা	পৃ. ৫২, ৫৩
		কালব্যাপ্তি	পৃ. ১২৯
আধ্যাত্মিক	পৃ. ৯, ১৪, ১৫, ১৬, ৭৯	কেবল জ্ঞান	পৃ. ৩৯, ৪০
আন্তরবিষয়	পৃ. ১৯	কৈবল্য	পৃ. ৩০, ৩১, ৪২, ৬৮, ১০১, ১০২
আন্তরোপায়সাধ্য	পৃ. ১৫		
আপ্তবচন	পৃ. ১৯, ৬৬	খ্রিয়মাণ	পৃ. ৪০
আলোচন	পৃ. ১২, ৩৩	গণনা	পৃ. ১০, ১১, ১২
আশ্রয়	পৃ. ১৫, ২৪, ২৫, ২৬, ২৮	গুণগত বিশ্লেষণ	পৃ. ১২১
আস্তিক	পৃ. ৩, ৪, ৯, ১০, ১৯, ৫৯	চার্বাক	পৃ. ৩, ৯, ১৯, ৫৪, ৫৫, ৫৯
ইচ্ছা	পৃ. ৩৬, ১০০, ১০২, ১২৫	চিকিৎসাশাস্ত্র	পৃ. ৪২
ইথার	পৃ. ৯৮, ৯৯, ১২৭	চিত্তবৃত্তি	পৃ. ১৮, ১৯
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য	পৃ. ২২	জনন	পৃ. ২৪, ২৭, ২৮, ৩০
ইন্দ্রিয়ঘাত	পৃ. ২২	জনসংখ্যা	পৃ. ৫৬
ঈক্ষা	পৃ. ১২৬	জবাকুসুম	পৃ. ৯৫
ঈদৃশ-ঈশ্বর	পৃ. ১০১	জীবন্মুক্ত	পৃ. ৪০, ১০৩
উত্তরমীমাংসা	পৃ. ৩, ৯	জৈন	পৃ. ৩, ৯
উপকার্য-উপকারক	পৃ. ৩১, ৩২	জ্ঞ (পুরুষ)	পৃ. ১৬, ১৭, ২১, ২৯, ১৩২
উনবিংশ শতাব্দী	পৃ. ২, ৩, ৫১, ৫৪, ১৪৩	তত্ত্বজ্ঞান	পৃ. ৯, ১২, ১৭, ৪০
ঐহিক	পৃ. ৫৮, ৫৯	তন্ত্রসাধনা	পৃ. ৫৩
কর্ম্মপীড়া	পৃ. ৫৯	তন্মাত্রসর্গ	পৃ. ৩৬, ৩৭
কর্ম্মপ্রবচনীয়	পৃ. ১৩	তমঃ	পৃ. ১৭, ২৫, ২৭, ২৮, ৩০

তামসিক বুদ্ধিধর্ম পৃ. ৩৩
তির্যগ্‌যোনিসর্গ পৃ. ৩৭
দর্শন (শাস্ত্র) পৃ. ২, ৩, ৪, ৫, ৯, ১১, ২৯
দর্শনের গঙ্গা পৃ. ১১৭
দার্শনিক পৃ. ৫, ৯, ১১, ১২, ৪১, ৫৬, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬৬, ৮৩, ৯৫, ৯৯, ১০৭, ১১৪, ১২১, ১২৯, ১৩৫, ১৩৬
দুঃখত্রয় পৃ. ১৫, ৩১, ৫৪
দৃষ্ট (প্রমাণ) পৃ. ১৯, ২০, ২২
দেবসর্গ পৃ. ৩৭
দেশব্যাপ্তি পৃ. ১২৯
দেহভাণ্ড পৃ. ৯৩, ১০০
ধৃত-শরীর পৃ. ৪০, ১০৩
নবজাগরণ পৃ. ২, ৪৯, ৮০, ১৫৮, ১৬০
নব্যন্যায় পৃ. ২
নাস্তিক পৃ. ৩, ৯, ১৯, ৫৩, ৫৯, ৬৯
নাস্তিকবাদ পৃ. ৭৯
নিয়মন পৃ. ২৮
নির্বাণ পৃ. ৫৪
নির্ভরযোগ্যতা পৃ. ৮৩
ন্যায় (দর্শন) পৃ. ২, ৩, ৯, ১০, ১৮, ২০, ২৩, ২৫, ৩৮, ৪১
পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পৃ. ১৭, ১৮, ৩৪
পঞ্চতন্মাত্র পৃ. ১৭, ১৮, ৩২, ৩৪, ৬৪
পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব পৃ. ১১, ১৪, ৪২, ৬০, ৬৮
পটাসিয়াম সায়ানাইড পৃ. ৯৬
পদশাস্ত্র পৃ. ১৮
পরমাণু পৃ. ২২, ২৩, ৪১, ৬০, ৯২, ৯৪, ৯৮, ৯৯, ১১৭, ১১৯, ১২৬, ১২৭
পরিশেষানুমান পৃ. ২০
পাখোয়াজ পৃ. ৮৯
পাঞ্চভৌতিক পৃ. ৯, ১৩৫
পারত্রিক পৃ. ৫৮, ৫৯
পাশ্চাত্ত্য পৃ. ২, ৩, ৪, ৯, ৫২, ৭০, ৭৯, ৯০, ৯২, ৯৩, ১৪৭, ১৪৮, ১৫২, ১৫৪, ১৫৯, ১৬০, ১৬১
পূর্ববত্‌ পৃ. ২০, ২২
পূর্বমীমাংসা পৃ. ৩, ৯
প্রকরণ গ্রন্থ পৃ. ১৩
প্রকাশ পৃ. ২৩, ২৭, ২৮
প্রকৃতি-বিকৃতি পৃ. ১১, ১৭, ১৮
প্রকৃতির লাঠি পৃ. ১৩১
প্রকৃতিলীন পৃ. ১০১, ১০৩

প্রতিবিষয় পৃ. ১৯
প্রত্যক্ষ (প্রমাণ) পৃ. ১৯, ২১, ২২, ৬৩
প্রত্যক্ষ জগত পৃ. ১২২, ১৩২
প্রত্যক্ষাতিরিক্ত পৃ. ১২২, ১২৩
প্রত্যয়সর্গ পৃ. ৩৬, ৩৭
প্রত্যাহার পৃ. ১৪
প্রবন্ধ পৃ. ৫, ৬, ৫০, ৫১, ৫২, ৮৩, ৮৬, ৮৯, ৯০, ১১৭, ১২০
প্রবৃত্তি পৃ. ১৬, ১৭, ২৮, ৩০, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৫৫, ৫৬, ৬১, ৬৯
প্রমাণশাস্ত্র পৃ. ১৮
প্রমেয় পৃ. ১০, ২১, ৪১
প্রমেয়শাস্ত্র পৃ. ১৮
প্রযত্ন পৃ. ২৮, ৩০, ৩৮
প্রয়োগ (application) পৃ. ৭০
প্রস্তাব পৃ. ৫১
প্রাকৃতিক নির্বাচন পৃ. ১২৪, ১২৫
প্রাণ পৃ. ৩৪, ৬৫, ৯৮, ৯৯, ১০০
প্রারব্ধ পৃ. ৪০, ৪১
বুদ্ধি পৃ. ৯, ১১, ১২, ১৮, ১৯, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৯২, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৮, ১২২
বৌদ্ধ পৃ. ৫৩, ৫৪, ৬৬
ব্রহ্মাণ্ড পৃ. ৯, ৯৩, ১০০, ১০১, ১০৫, ১০৬, ১২৭
বাহ্য প্রকৃতি পৃ. ১২৯
বাহ্যবিষয় পৃ. ১৯
ভারতীয় দর্শন পৃ. ২, ৯, ১০, ৪১, ৫৪, ৫৬, ৫৯, ৯৮, ৯৯, ১৩২, ১৪২, ১৪৭, ১৫২, ১৫৪
ভূতসর্গ পৃ. ৩৬, ৩৭
মনস্তত্ত্ব পৃ. ৫৭, ৫৮, ৯৩
মনীষা পৃ. ২, ৩, ৬, ৭০, ৮৪
মনুষ্যসর্গ পৃ. ৩৭
মনোবিজ্ঞান পৃ. ৯৭, ১০৩
মহৎ (তত্ত্ব) পৃ. ১৭, ১৮, ২২, ২৫, ২৬, ২৭, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৮, ৯২, ৯৩, ৯৬, ৯৮
মাত্রাগত বিশ্লেষণ পৃ. ১২১, ১৩৫
মাদক পৃ. ৫৫, ৭০, ১৫৯
মানসিক পৃ. ৯, ৫৭, ১০৬, ১২৪
মাহেশ্বর সূত্র পৃ. ১৩
মিথুন পৃ. ২৭, ২৮, ১৩৮
মুক্তি পৃ. ১৪, ১৭, ৩১, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৫২, ৫৪, ৫৫, ৫৮, ১০২, ১১৭

মুমুক্ষু পৃ. ১৪, ৩৫
মূলা প্রকৃতি পৃ. ৫৩
মোক্ষ পৃ. ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৫৪, ৫৬, ৫৮, ৫৯, ৬১, ৬৮
মৌলিক উপাদান পৃ. ১৩২
যোগ (দর্শন) পৃ. ৩, ৯, ১৮, ১৯, ৬২, ১০১, ১০২, ১০৩, ১৪২
রজঃ পৃ. ১৭, ২৫, ২৭, ২৮, ৩০, ৯১, ৯৮, ১২২
রয়ি পৃ. ১২৬
রামকৃষ্ণ মিশন পৃ. ৮১
রেনেসাঁস পৃ. ২
লিঙ্গ পৃ. ১৯, ২৫, ৩৪, ৩৫
লিঙ্গশরীর পৃ. ৩৫, ৩৭
লিঙ্গী পৃ. ১৯
লৌকিক উপায় পৃ. ১৬
বাক্যশাস্ত্র পৃ. ১৮
বিকৃতি পৃ. ১৭, ১৮
বিজ্ঞানের সরস্বতী পৃ. ১১৭
বিদেহলয় পৃ. ১০২
বিবেক পৃ. ১৭, ২৫, ৩৩, ৩৬, ৩৭, ৩৯
বিবেকখ্যাতি পৃ. ৩৬, ৪০, ৪২
বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধ পৃ. ৫১
বিসদৃশ পরিণাম পৃ. ২৭
বীত পৃ. ২০
বৃত্তি পৃ. ২৮, ৩৩, ৩৪
বেদ পৃ. ৯, ২০, ৫৩, ৫৯, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯
বেদপারায়ণ পৃ. ৬৮
বেদান্ত পৃ. ৯, ১০, ১৮, ১৯, ২৩, ৩৮, ৯০, ৯১, ১০৪, ১০৫, ১০৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০
বেলুড় মঠ পৃ. ৮১
বৈজ্ঞানিক পৃ. ৫৭, ৯৯, ১১৪, ১১৭, ১২০, ১২১, ১২৭, ১২৯, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬
বৈদিক উপায় পৃ. ১৬
বৈরাগ্যপ্রাবল্য পৃ. ৫২
বৈশেষিক পৃ. ৩, ৯, ১০, ১৮, ১৯, ২০, ২৩, ২৫, ৪১, ৬০, ৬৫, ৯৯
ব্যক্ত পৃ. ১৬, ১৭, ২১, ২৫, ২৯
ব্যক্ত প্রকৃতি পৃ. ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪
ব্যক্তিই শৈলী পৃ. ১০৬
ব্যক্তিগত প্রবন্ধ পৃ. ৫১
ব্যতিরেকসহচার পৃ. ২০

ব্যবধান পৃ. ২২
শক্তি পৃ. ২৪, ২৬
শঙ্খ পৃ. ১২
শব্দ (প্রমাণ) পৃ. ১৯, ২০, ২১, ২২, ৬৩
শব্দ (তন্মাত্র) পৃ. ৩৪, ৩৬, ৩৯, ৬৪, ৯৪
শব্দ (তরঙ্গ) পৃ. ১২৪
শারীরবিজ্ঞান পৃ. ৯২, ৯৪
শেষবত্ পৃ. ২০, ২২
শৈলীই ব্যক্তি পৃ. ১০৬
ষড়্দর্শন পৃ. ৩, ৯
সংকল্প পৃ. ৩৪
সংকেত পৃ. ১৩১
সংখ্যা পৃ. ১১, ১২
সংঘাত পৃ. ২৯, ৪১
সংসরণ পৃ. ৩৫, ৩৯
সংস্কার পৃ. ৪০, ৪১, ১০৩
সঙ্খ পৃ. ১২
সঞ্চিত পৃ. ৪০
সত্কার্যবাদ পৃ. ২৩
সত্ত্ব (গুণ) পৃ. ১৭, ২৫, ২৭, ২৮, ৩৯, ৯১, ৯৮, ১২২
সত্ত্বপুরুষান্যতাপ্রত্যয পৃ. ১৬, ১৭
সত্যান্বেষী পৃ. ৯
সদৃশ পরিণাম পৃ. ২৭, ২৮
সন্নিকর্ষ পৃ. ১৯, ২১
সমানাভিহার পৃ. ২২
সম্প্রদায় পৃ. ২, ৩, ৯, ১২, ২৫
সম্ভূয়কারিতা পৃ. ২৫
সাংখ্য পৃ. ২, ৩, ৪, ৬, ২৯, ৩৩, ৩৫, ৪১, ৪২, ৫২, ৬১, ৬২, ৯০, ৯১, ১২১, ১২৮, ১৫৮, ১৬০
সাক্ষী পৃ. ৯৬, ৯৭
সাত্ত্বিক অহংকার পৃ. ৩৩
সামান্যতোদৃষ্ট পৃ. ২০, ২২
সূক্ষ্মতা পৃ. ২২
সৃষ্টি প্রকৃতি পৃ. ৫৩
স্নায়বিক সমন্বয় পৃ. ৫৭
স্নায়ুকোশ পৃ. ৫৭
স্নায়ুতন্ত্র পৃ. ৫৭
স্পন্দন পৃ. ২৪, ৯৪, ৯৫, ৯৮
স্বচ্ছ স্ফটিক পৃ. ৯৫

➢ ব্যক্তি নাম

অক্ষয়কুমার দত্ত	পৃ. ৫১, ১২০
অণিমা সেনগুপ্ত	পৃ. ৬, ১৫৩
অধীরকুমার দে	পৃ. ১২০
অনন্তলাল ঠাকুর	পৃ. ১৫৪, ১৫৮
অনির্বাণ	পৃ. ৪১, ৬৬, ৬৭
অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি	পৃ. ৬, ১৪৮
অভয় কুমার মজুমদার	পৃ. ৬, ১৫১
আচার্য উদয়ন	পৃ. ৬২
আপোদেব	পৃ. ১৩
আর. সি. মজুমদার	পৃ. ৮৪, ৮৫
আলাসিঙ্গা	পৃ. ৮৮
আশুতোষ ন্যায়াচার্য	পৃ. ৬, ১৪৬
আশুতোষ বাজপেয়ী	পৃ. ১১৫
আসুরি	পৃ. ৩, ১০,
ইন্দুপ্রভা দেবী	পৃ. ১১৫
ঈশ্বরকৃষ্ণ	পৃ. ৩, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৭, ১৯, ৬১, ১০০, ১৪২, ১৫০
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	পৃ. ৫১, ১১৮,
উদয়বীর শাস্ত্রী	পৃ. ১১
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	পৃ. ৬, ১৪৯
উমেশচন্দ্র বটব্যাল	পৃ. ৬, ১১৮, ১৪৭
ঋষি পিপ্পলাদ	পৃ. ১২৫, ১২৬
কণাদ	পৃ. ৩, ৯, ১১, ৬৬
কপিল	পৃ. ৩, ৪, ৯, ১০, ১২, ৪১, ৬১, ৬২, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৯১, ৯৭, ১০১, ১০৩, ১০৭, ১৩৫, ১৪৫, ১৪৬, ১৬০, ১৬১
কালিপ্রসন্ন সিংহ	পৃ. ৫১
কালীপদ তর্কাচার্য	পৃ. ৬, ১৪৫
কালীবর বেদান্তবাগীশ	পৃ. ৬, ১৪৮
কুঞ্জবিহারী তর্কসিদ্ধান্ত	পৃ. ৬, ১৪৫
কুমারিল ভট্ট	পৃ. ১৩
কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন	পৃ. ৬, ১৪৪
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ. ৬, ১৪৭
খ্রিস্টিন	পৃ. ৮৮
গুণরত্নসূরি	পৃ. ১২
গোপাল কৃষ্ণ গোখলে	পৃ. ২
গোপীনাথ কবিরাজ	পৃ. ৬, ৪২, ১৫২, ১৬১
গোবিন্দ চন্দ্র দাস	পৃ. ৪২
গোবিন্দসুন্দর	পৃ. ১১৪, ১১৫
গৌতম	পৃ. ৩, ৯, ১১, ৬৬
চন্দ্রকামিনী দেবী	পৃ. ১১৪, ১১৫
চার্লস ডারউইন	পৃ. ৭৯, ১২৪
জে. এন. মুখার্জি	পৃ. ৬, ১৫১

জৈমিনি পৃ. ৩, ৯
ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র পৃ. ৬২
তারানাথ তর্কবাচস্পতি পৃ. ৬, ১৪৪
দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় পৃ. ৮৮, ৮৯
দীননাথ ত্রিপাঠী পৃ. ৬, ১৪৬
দুর্গাসুন্দরী দেবী পৃ. ৪৯
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ পৃ. ৬, ১৪৭
নন্দরাণী পৃ. ৪৯
নন্দলাল সিনহা পৃ. ৬, ১৫১
নরেন্দ্রনাথ তত্ত্বনিধি পৃ. ৬, ১৪৪
নরেন্দ্রনাথ পৃ. ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০
নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী পৃ. ৬, ১৫০
নিখিলেশ চক্রবর্তী পৃ. ৬, ১৪৬
নিবেদিতা পৃ. ৮৬, ৮৮
পঞ্চশিখ পৃ. ৩, ১০, ১৬,
পঞ্চানন তর্করত্ন পৃ. ৬, ১৪৫
পতঞ্জলি পৃ. ৩, ৯, ৬২, ১৪২
পিথাগোরাস পৃ. ৯০
পুলিনবিহারী চক্রবর্তী পৃ. ৬, ১৫০
পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু পৃ. ৬, ১৪৯
পেডলার সাহেব পৃ. ১১৫
প্যারীচাঁদ মিত্র পৃ. ৫১
প্রণবরঞ্জন ঘোষ পৃ. ৮৪, ১০৬, ১৫৭
প্রমথনাথ তর্কভূষণ পৃ. ৬, ১৪৪
প্রমদা মিত্র পৃ. ৮৮
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পৃ. ২, ৪, ৪৯, ৫১, ৫২
বাচস্পতি মিশ্র পৃ. ৪, ১১, ১২, ১৩,
১৪, ২০, ২৫, ২৯,
৪০, ১৪২, ১৫০
বাদরায়ণ ব্যাস পৃ. ৩, ৯, ৪২
বিজ্ঞানভিক্ষু পৃ. ৪২, ৬২, ১৪৫,
১৪৬ ১৪৮, ১৫১
বিধুভূষণ ন্যায়তর্কতীর্থ পৃ. ৬, ১৪৬
বিধুভূষণ ভট্টাচার্য পৃ. ৬, ১৪৯
বিপিনবিহারী গুপ্ত পৃ. ১১৭, ১১৮
বিশ্বনাথ দত্ত পৃ. ৭৭, ৭৯
বুদ্ধ পৃ. ৬৬
বেণুধর তর্কতীর্থ পৃ. ৬, ১৪৬
ব্রজসুন্দর পৃ. ১১৪, ১১৫
ব্রজেন্দ্র নাথ শীল পৃ. ৬, ১৫২
ব্রহ্মানন্দ পৃ. ৮৮
ভুবনেশ্বরী দেবী পৃ. ৭৭
ভূপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য পৃ. ৬, ১৪৯
মক্ষমুলর (Maxmüller) পৃ. ৬২, ১১৮
মণিভদ্রসূরি পৃ. ১২
মধুসূদন সরস্বতী পৃ. ১২, ১০৩,
মনোহররাম ত্রিবেদী পৃ. ১১৪
মহেশ চন্দ্র পাল পৃ. ৬, ১৪৮

মাদাম কাল্‌ভ পৃ. ৮৮
মিস ম্যাকলাউড পৃ. ৮৮
মিসেস ওলি বুল পৃ. ৮৮
মেরী হেল পৃ. ৮৮
মোহিতলাল মজুমদার পৃ. ১৫৪, ১৬১
যজ্ঞেশ্বর ঘোষ পৃ. ৬, ১৫১
যদুভট্ট পৃ. ৮৯
যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পৃ. ৪৯
রঘুনাথ তর্কবাগীশ পৃ. ৬, ১৪৩
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ. ৫১
রমেশ চন্দ্র তর্কতীর্থ পৃ. ৬, ১৪৫
রামমোহন রায় পৃ. ৫১
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী পৃ. ৫, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১২০, ১২১, ১৩৬, ১৬০
শংকরাচার্য পৃ. ৪২, ৮৩, ১০২
শরচ্চন্দ্র খাঁ পৃ. ৬, ১৪৬
শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী পৃ. ৮৫, ৮৮
শাক্যসিংহ পৃ. ৫৪
শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ. ৮৩
শুদ্ধানন্দ পৃ. ৮৮
শ্যামাচরণ পৃ. ৪৯
শ্রীধরস্বামী পৃ. ১১
শ্রীরাম শিরোমণি পৃ. ৪৯
শ্রীরামকৃষ্ণ পৃ. ৭৯, ৮৯
সঞ্জীবচন্দ্র পৃ. ৪৯, ৫১
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার পৃ. ৮০
সদানন্দ যোগীন্দ্র পৃ. ১৪
সাবিত্রী–সত্যবান পৃ. ৩৫
সুকেশা পৃ. ১২৬
সুভাষ ভট্টাচার্য পৃ. ৬
সুরমা মিত্র পৃ. ৬, ১৪৬
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ. ৭৯
সুরেন্দ্রনাথ মিত্র পৃ. ৭৯
সুরেন্দ্রনাথ রায় পৃ. ৬, ১৪৮
সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জী পৃ. ৬, ১৫২
সুশীল কুমার গুপ্ত পৃ. ২, ১৫৩, ১৫৮
স্টার্ডি পৃ. ৮৮
স্বামী বিবেকানন্দ পৃ. ৭৭, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৭, ৯০, ৯৪, ৯৫, ৯৭
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ পৃ. ৮৭
হরিভদ্রসূরি পৃ. ১২
স্বামী সারদানন্দ পৃ. ৮৩
হরিহরানন্দ অরণ্য পৃ. ৬, ১৪৫
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত পৃ. ৬, ১৪৭
A. B. Keith পৃ. ১১
C. M. Joad পৃ. ৯
Erich Frauwallner পৃ. ৪১

➢ গ্রন্থ নাম

অথর্ববেদ পৃ. ৬৫, ১২৫

অমরকোষ পৃ. ১১

ঈশোপনিষদ্ পৃ. ১০২

ঋক্সংহিতা পৃ. ৬৫, ৭৪

ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকা পৃ. ৬৬, ৭৪

কঠোপনিষদ্ পৃ. ৩৫, ৬৮, ৭৫

গূঢ়ার্থদীপিকা পৃ. ১২, ১০৩

তত্ত্বসমাস সূত্র পৃ. ১৪২, ১৪৩, ১৪৮

তর্করহস্যদীপিকা পৃ. ১২

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ পৃ. ১২৬, ১৩৮

তৈত্তিরীয়-সংহিতা পৃ. ৬৪, ৬৬

নিরুক্ত পৃ. ৬৬, ৭৪

নির্বাণ-ষটকম্ পৃ. ১০৬, ১১২

ন্যায়কুসুমাঞ্জলি পৃ. ৬২, ৭৩

পরাশর সংহিতা পৃ. ৬৬, ৭৪

পাণিনীয় ধাতুপাঠ পৃ. ৯

প্রশ্নোপনিষদ্ পৃ. ১২৫, ১৩৮

ব্রহ্মসূত্র পৃ. ৪২, ১৪০

বালবোধিনী পৃ. ১৩

ভাগবত পুরাণ পৃ. ৬৫, ৬৮

ভামতী পৃ. ১২

মত্‌স্য-পুরাণ পৃ. ১১

মনুসংহিতা পৃ. ৬৪, ৬৫, ৭৩, ৭৪

মাঠরবৃত্তি পৃ. ১০, ৪১

মার্কণ্ডেয় পুরাণ পৃ. ৬৫

মুণ্ডকোপনিষদ্ পৃ. ৬৮, ৭৫, ১২৬

যুক্তিদীপিকা পৃ. ১০, ১১, ১৩, ১৫০

লঘুবৃত্তি পৃ. ১২

বিষ্ণুপুরাণ পৃ. ৬৪, ৬৫

বেদান্তসার পৃ. ১৪, ৪৩

বৈয়াসিক-মহাভারত পৃ. ১০, ১১, ৩৫, ৪১, ৬৪, ৬৫, ১২২, ১৩৭

শতপথ-ব্রাহ্মণ পৃ. ৬৪, ৬৫

শব্দশক্তিপ্রকাশিকা পৃ. ১৪৬

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ পৃ. ১০, ৪৩

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পৃ. ১০, ১১, ১২, ৪১, ৫০, ৫১, ৬৮, ১১২

শ্রীশ্রীচণ্ডী পৃ. ৫৩

ষড়্দর্শনসমুচ্চয় পৃ. ১২

ষষ্টিতন্ত্র পৃ. ১১, ১৩

সাংখ্যকারিকা পৃ. ১০, ১১, ১২, ১৪, ২০, ২২, ২৩, ২৫, ২৯, ৩১, ৩৫, ৩৯, ৪০, ৬১

সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী পৃ. ১১, ১৩, ১৪, ২০,

সাংখ্যপ্রবচন সূত্র পৃ. ৬৭, ১০১, ১০৩, ১৪২

সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য পৃ. ৬২

সাংখ্যসূত্র পৃ. ৫৬, ৬৩

A Poet’s Life পৃ. ৮৫

Origin of Species পৃ. ১২৪

➢ শ্লোকসূচি

অত্র চত্বারি ভূতানি... পৃ. ৭২

ইদং শরণমজ্ঞান... পৃ. ৭৪

উত্পদ্যন্তে চ্যবন্তে চ... পৃ. ৭৩

এতত্ পবিত্রমগ্র্যং মুনি... পৃ. ১০

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা... পৃ. ৭৫

চাতুর্বর্ণ্যং ত্রযো লোকা... পৃ. ৭৩

তস্মাদেতত্ পরং মন্যে... পৃ. ৭৩

তস্মাদ্ যজ্ঞাত্ সর্বহুতঃ... পৃ. ৭৪

ত্রৈগুণ্যবিষযাঃ বেদাঃ... পৃ. ৭৫

দদৃশাতেঽরবিন্দস্থং... পৃ. ৭৪

দুঃখত্রযাভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা... পৃ. ১৪

দ্রবঃ সংঘাতকঠিনঃ স্থূলঃ... পৃ. ৪১

ন কশ্চিদ্ বেদকর্তাস্তি... পৃ. ৭৪

পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞো যত্র... পৃ. ১৭

পযোধরৈঃ পুণ্যজনা... পৃ. ৪১

পিতৃদেবমনুষ্যাণাং... পৃ. ৭৩

পুরুষস্য দর্শনার্থং... পৃ. ৩১

প্রকৃতের্মহাংস্ততো... পৃ. ৩২

প্রাপ্তে শরীরভেদে... পৃ. ৪০

প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ... পৃ. ২৭

ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং... পৃ. ৭৫

মনোবুদ্ধ্যহংকারচিত্তানি... পৃ. ১০৬

মূলপ্রকৃতিরবিকৃতি... পৃ. ১৭

যথা জাতবলো বহ্নি... পৃ. ৭৪

যথা মহাহ্রদং প্রাপ্য... পৃ. ৭৪

যদা যস্যানুগৃহ্নাতি... পৃ. ৭৫

যমিমাং পুষ্পিতাং বাচং... পৃ. ৭৫

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা... পৃ. ৭৪

যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতযো... পৃ. ৭৩

যাবজ্জীবেত্ সুখং জীবেদ্... পৃ. ৫৪

যুগান্তে অন্তর্হিতান্ বেদান্... পৃ. ৭৪

রঙ্গস্য দর্শযিত্বা নিবর্ততে... পৃ. ৩৯

বত্সবিবৃদ্ধিনিমিত্তং... পৃ. ৩৯

বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা... পৃ. ৫৩

বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো... পৃ. ৭৩

বেদা মে পরমং চক্ষু... পৃ. ৭৪

বেদানৃতে হি কিং কুর্যাং... পৃ. ৭৪

শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপং চ... পৃ. ৭৩

শিষ্যপরম্পরযাগত... পৃ. ১০

সপ্তত্যাং কিল যেঽর্থা... পৃ. ১৩

সম্যগ্জ্ঞানাধিগমাত্... পৃ. ৪০

সাংখ্যাঃ প্রকুর্বতে চৈব... পৃ. ১১

সৈনাপত্যং চ রাজ্যং চ... পৃ. ৭৩

স্বদারপরদারেষু যথেচ্ছং... পৃ. ৫৪

হত্বা লোকানপীমাং... পৃ. ৭৪

হস দিব লল খাদ মোদ... পৃ. ৪১